প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :

চিত্তরঞ্জন সাহা

মুক্তধারা

[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]

৭৪, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :

আবদুল বারক আলভী

ছেপেছেন :

বাংলা একাডেমীর প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগের মুদ্রণ বিভাগ

ঢাকা—২

SAHITYA CHINTA

By Shahabuddin Ahmed

MUKTADHARA

[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]

74, Farashgonj, Dacca—1

Bangladesh.

মরহুম আমীর হোসেন চৌধুরীর স্মরণে

My dear boy, dignity, grandeur and powers of persuasion are to a very large degree derived from images—for that is what some people call the representation of mental pictures.

—Longinus : On the Sublime.

সূচীপত্র

আমি কবিদের জন্যে কবিতা লিখি ...

আধুনিক কবিতা বুঝি না বললে আধুনিকতার প্রবক্তাগণ, অথবা সঠিক শব্দ ব্যবহার করলে প্রগতিবাদী কাব্যের সমর্থকগণ, পাঠককে বলবেন, সে ত বটেই, গান ভালবাসলেই সবাই ক্লাসিকাল গান যে বুঝবে এমন কোন কথা নয়! তাই বলে ক্লাসিকাল গান গান না, কে বলবে? তা যদি বলে ত বুঝতে হবে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ নন, সঙ্গীত বিষয়ে অজ্ঞ।

আধুনিক কবিতার স্বপক্ষে তাঁরা এই রকম যুক্তি দিয়ে বলেন যে, সংগীত বুঝতে যেমন গান শিখবার প্রয়োজন হয় তেমনি সমকালীন কাব্য বুঝতে অমনি কবিতায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন।

বিষয়টির ঐ রকম গুরুত্ব আছে বলেই আধুনিক কবিতা প্রচারণার অন্যতম গুরু পাউন্ড বলেছিলেন : ভাববেন না কাব্যকলা সংগীত-কলার চেয়ে সহজ।

এ কথা যিনি বলেছেন তিনি ফাঁকা-মাথার লোক নন এবং ঐ উচ্চারণও জিহ্বা পিছ্‌লানো বাক্য নয়, অভিজ্ঞতা-দগ্ধ কুঞ্চিত- ভূরু জ্ঞানীর কথা। সুতরাং কথাটিকে না ভেবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

কবিতা কি এর সংজ্ঞা নিরূপণ যে কোনো শব্জী-জীবী কিংবা আমিষ-জীবী প্রাণী সম্বন্ধে রচনা লিখন নয়। অশ্বের আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে যত সহজে তাদের জাতির চেহারা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ সম্ভব কবিতার সূত্র নির্দেশ বস্তুত ততই কঠিন। ব্যাপারটা অত সরল না বলে কুটিল পন্থা অবলম্বন না করে আমাদের একজন স্বনামধন্য আধুনিক কবি সরাসরি বলেছিলেন : কবিতা অনেক রকমের। (সর্বকালের কবিতার ইতিহাস জানা থাকলে এবং বিচিত্র-চরিত্র ও বিচিত্র-বর্ণ কবিতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলে সর্বশেষ উক্তি ঐ রকমই হবে।) ঠিক ঐ কথাটা যদি স্বীকার করি দেখব কবিতা যেমন কোন গোষ্ঠীগত ধারণার অথবা ব্যক্তিগত চিন্তার বাইরে এসে আপনার একটা বিশ্বজনীন চেহারাকে উপস্থাপন করে তেমনি বহুব্যাপ্ত

সংজ্ঞার মধ্যে প্রবেশ করে তার সত্যিকার রূপটাকে করে তোলে রহস্যময়। ঠিক এইজন্য বোধ হয় কোন কবি সম্বন্ধে কোন একক ব্যক্তির রায়কে চূড়ান্ত বলে মনে করা হয় না। তবু বলব কবিতার জন্যেও সংগীতের মত শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু প্রয়োজন আছে বলে আমি এ বলব না যে সংগীত শিখে যেমন গান গাওয়া যায় তেমনি কবিতায় শিক্ষিত হয়ে কবিতা লেখা যায়। যদিও আমি এ-কথাটাও বলিনা যে সংগীত শিখেই বড় গায়ক হওয়া যেতে পারে। ঐ দুটো বিষয়ের ক্ষেত্রে মৌলিকতার পরিচয় দিতে হলে প্রতিভার প্রয়োজন। আমাদের আজকের কবি-পাঠকের এই সন্দেশটুকু পরিবেশন করতে চাই।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশের বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক-বংশোদ্ভূত কবিদের কাব্যালোচনায় আমি এই রকম একটা অভিমান লক্ষ্য করেছি যে তাঁরাই একমাত্র কাব্যবোদ্ধা এবং তাঁদের কবিতা পঠিত না হওয়ার কারণ সারল্য-বিলাসী পাঠকের শ্রমবিমুখতা এবং গভীরতা-ভীতি। তাঁদের আক্ষেপ মিথ্যা বলি না। কিন্তু জনচিত্তরঞ্জনে একেবারে ব্যর্থ হলে পাঠকের অভিযোগের দিকেও তাঁদের কান পাতার আবশ্যক আছে বলে মনে করি।

এ-প্রসংগে বলা অনুচিত হবে না যে দান্তের মত মহাকবিও জন-সাধারণকে লক্ষ্য করেই কবিতা লিখেছিলেন। তাঁরও ইচ্ছা ছিল যেন তাঁর কাব্য সুপ্রচুরভাবে পঠিত হয়, শুধু যেন তা শুষ্ক-কাষ্ঠ বিদ্বানের দম্ভবিহারী না হয়।

উপরে আমি বলেছি যে গান শিখে গান গাইলেই যে সেটা গান হবে এমন কথা নয়। তেমনি কবিতা লিখলেই যে তা কবিতা হবে তাও নয়।

কোন্ কোন্ পার্টস জুড়লে একটা মোটর গাড়ী বানানো যায় সে বিদ্যা জানলে সেই সব পার্টস জুড়ে একটা মোটর গাড়ী বানাতে কষ্ট হয় না। ঐ কাজটার জন্য ঐ মোটর বানানোর কারিগরী বিদ্যা-শিক্ষাই যথেষ্ট। কিন্তু কাব্যের অলঙ্কার-শাস্ত্র মুখস্থ করে কবিতা বানানো অসম্ভব। বুদ্ধিমান লোক হলে অভ্যাসের দ্বারা কৌশল আয়ত্ত করে কবিতার একটা কাঠামো হয়ত তিনি দাঁড় করাতে পারবেন কিন্তু সেটা হবে চলৎশক্তিহীন একটা জড়যন্ত্র—একমাত্র পেট্রোলের স্পর্শেই সে হবে জীবন্ত। বলা বাহুল্য পেট্রোল না খেলে যেমন মটর চলে না তেমনি কবিতাকে খাওয়াতে হয়

প্রাণের তেল, অভিজ্ঞতার তেল, অনুভূতি এবং আবেগের তেল। ঐ তেল পড়া মাত্রই কবিতা সচল হয়ে ওঠে, সে সত্যিকারভাবে পাঠকের শিরা-উপশিরায়, মর্মে-মগজে সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। আমার মনে হয় আমাদের আধুনিক কবিদের অনেকের কবিতা ঐ রকম সুদৃশ্য যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

এ-প্রসঙ্গে আমরা আর এক ধরনের কবিতার উদাহরণ নিতে পারি। রোমান্টিকতার স্বাধীনচারী আঙ্গিকে আভিজাত্যের শান্ত গাম্ভীর্য ফোটে না বলে তন্ময় চিত্ত কোন কোন কবি নিছক আবেগের দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে সনেট লেখেন। আমার কিন্তু, তাদের ঐ সব সনেট দেখে, অধিকাংশ সময় মনে হয়, তাঁদের হাতে কবিতার বদলে একটা সুন্দর মটরকার তৈরী হয়েছে যার শুষ্ক যন্ত্রে পেট্রোলের গন্ধটুকু পর্যন্ত নেই। অথচ তাঁরা আত্মতৃপ্তির প্রসাদ আকণ্ঠ পান করে ভাবছেন তাঁরা শুধু কবিতাই লেখেন নি লিখেছেন ক্লাসিক কবিতা। আত্মতৃপ্তির জন্য অমন মনে করা অসঙ্গত নয় আর নিজের সন্তানের প্রতি কার না থাকে অন্ধ মমতা। কিন্তু পেত্রার্ক, টাসো, শেক্‌স্‌পীয়র, দান্তে, মিল্টন, কীটস বা বোদলেয়ারের সনেট-গুলো পাঠককে কেন দংশন করে সেটা কিন্তু তাঁরা ভাববেন না। তাঁরা বোধ হয় ভুলে যান যে ওঁরা সনেট লিখলেও আসলে কবিতাই লিখেছেন, বোধ হয় তাঁরা ভাবেন না, রবারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়ে মানুষ তৈরী করলেই সেটা মানুষ হয়ে যায় না।

আমি মনে করি কোন ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোন গোষ্ঠী বিশেষ কবিতা-নির্মাণের একটা নির্দিষ্ট ফ্রেম যখন তৈরী করেন তখন কাব্যের মুক্তি-পথের দরোজায় হঠাৎ তাঁরা তালা লাগিয়ে দেন। । ঐ নির্মাণের অপূর্বতার মোহে পড়ে অনুকরণকারীরা হারিয়ে ফেলেন চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য। লব্ধ উপায়ের রেলপথে চলতে চলতে তাঁরা আর গাড়ী ঘোরাবার পথ পান না। বস্তুত পেত্রার্ক কিংবা রসেটি যে সনেট লিখেছিলেন তাদের আকৃতি নির্মিত হয়েছিল তাঁদের মানসিক গঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী। ঐ রকম মানসিকতা যাঁর তিনি হয়তো সনেট লিখতে পারেন কিন্তু সাফল্য অর্জন করতে গেলে প্রকৃত অর্থে তাঁদের মত কবিও হতে হবে। ঐ রকম কবি সবাই নন কিন্তু ঐ রকম যান্ত্রিক কাঠামো বানানোর মিস্ত্রী অনেকে। ঐ মিস্ত্রীরা হয়তো

পুতুল বানাতে পারেন, কিন্তু প্রাণবান মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন না। যান্ত্রিক কাঠামোর ঐ রোগ সর্বনাশ ডেকে আনে বলে সত্যিকার কবি সাধারণত অন্যের আবিষ্কৃত আঙ্গিক পরিহারের পক্ষপাতী।

আমরা জানি বাঙলা কবিতায় মধুসূদন দু'রকম কবিতার আঙ্গিক নির্মাণ করেছিলেন। একটা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অপরটি তাঁর সনেটের অথবা ঠিক হয় বললে তাঁর চতুর্দশপদীর। মনে হতে পারে যে সেটা ত বিদেশী কবিদের আঙ্গিকের অনুকরণ। কিন্তু সে অনুকৃতির ফলে তাঁর কবিতা নিছক যান্ত্রিক হয়নি। তার কারণ মধুসূদন কবি ছিলেন, প্রতিমায় তিনি প্রাণের লাবণ্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু মধুসূদনের ঐ আঙ্গিকের রেলপথে গিয়ে কতকগুলো যান্ত্রিক পুতুল বানিয়েছেন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কায়কোবাদ, শিরাজী প্রমুখ কবিরা।

আমি অবশ্য-এ-কথা বলে আমাদের শ্রদ্ধেয় অগ্রজদের সাহিত্য-সাধনাকে উপহাস করছি না, কিংবা বলছি না : সাম্প্রতিক কালের কবিরা যা লিখেছেন তার সবটাই রবীন্দ্রনাথের সেই তোতা পাখী—বদ্ধ খাঁচার আবরণে যার আয়ু নিঃশেষিত হওয়াতে যার উদর টিপে কেবল শুকনো পাতার খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল। আমি বলছি কেবল কাঠামোকে মূল্য দিয়ে কবিতা লেখা অসম্ভব। এবং কোন একজনের সৃষ্ট আঙ্গিকে অথবা ছন্দে ফেলে শব্দে কথা জুড়লেই কবিতা হয় না।

সৃষ্টি যা হবে তা সম্পূর্ণ নিজের হওয়া চাই। এই নিজস্ব সৃষ্টি নিখুঁত না হলেও তাতে কিছু এসে যাবে না। কেননা নিজেরটার মধ্যেই থাকে নিজের অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার রক্ত। আমার বিশ্বাস পাঠক সব সময় সেটাই পেতে চান। মৌলিক ঐ কবিতা লেখা সত্যিই কঠিন।

সকলেই এক রকম পোশাক পরুক শিল্পের ক্ষেত্রে এটা আদৌ অভিনন্দন যোগ্য ব্যাপার নয় এবং এ কথা ঠিক পোশাক নকল করা যত সহজ, চরিত্র নকল করা ততই দুরূহ। বাংলা দেশের কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনেটের পোশাক নকল করেছেন, ওর চরিত্র গ্রহণ করতে পারেননি।

আধুনিক কবিদের অবস্থাও হয়েছে তদনুরূপ। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পোশাক যতটা নকল করেছেন সে অনুযায়ী ভাবসৃষ্টিতে ততটা সক্ষম হননি। কোন কোন কবি পশ্চিমী মেজাজও আনতে সচেষ্ট। কিন্তু

বললে অযৌক্তিক হবে না প্রাকৃতিক কারণে প্রত্যেক দেশের মানুষের মানসিক গঠনে কিছু পার্থক্য থাকাতে ওখানে যেটা স্বাভাবিক এখানে সেইটাকেই খানিকটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এবং এই কারণেই আমি এই সব কবিতাকে খানিকটা যান্ত্রিক উপায়ের সৃষ্টি বলেছি।

যন্ত্র? কতকটা তাই। কবিতা যেদিন থেকে ism এর কারাগারে বন্দী হয়েছে সেদিন থেকেই সে তার প্রাণের স্ফূর্তি হারিয়ে ফেলেছে। হয়ত তন্ময় কবিতার সাধনা করতে গিয়ে হৃদয়ের মধু গেছে তার উবে।

এই সব ইজমের বোধ হয় নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবং সেই বিরাট ইতিহাসের শরীর এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের আধারে বন্দী করাও অসম্ভব। তবু প্রসঙ্গের খাতিরে এখানে তার কিছু অনুল্লেখ এ প্রবন্ধকে বিকলাঙ্গ করবে মনে করে একজন লেখকেরই শরণ নিলাম।

বিংশ শতাব্দীর জার্মান কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে প্যাট্রিক ব্রিজ-ওয়াটার ১৯১১ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত জার্মানীতে ও ইংল্যাণ্ডে কবিতা আন্দোলনের ঐ মতবাদের একটা তালিকা তুলে দিয়েছেন। সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পও যে দ্রুত খোলস বদলে এগিয়ে যেতে থাকে তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই তালিকা। অর্থাৎ কাব্যের ঘন ঘন খোলস বদলাবার এমন একটা সংক্ষিপ্ত প্রমাণ বিরল। এখানে পাঠকের জ্ঞাতার্থে তালিকাটি পুনর্মুদ্রিত হ'ল :

	GERMANY	ENGLAND
1911-14	Early Expressionism (and futurism)	Imagism (1913) Vorticism (1914)
1914-18	Expressionism	(Georgian) War poetry
1920'S	Expressionism Dada Surrealism Functional Poetry	Pylon Poets (Left-wing movement) Surrealism
1933-45	(Experimental writing banned as 'decadent art')	

	GERMANY	ENGLAND
1939-41		New Apocalypse (post)
1939-45		No new movement as such
1945-58	Post-War Zeitlyrik	
1945-50		New Romanticism
1950'S	Modernism, of all sorts	'The movement' (anti-romantic) Mavericks poets (romantic)
1960	New Functionalism Pure Fiction	(Increasingly romantic)

১৯১১ থেকে ১৯৬০ সালের আধুনিক কবিতার উপরোদ্ধৃত পৌনঃপুনিক চেহারা বদলের ইতিহাস সব নয়। তারও আগে কিউবিষ্ট মুভমেণ্টের ইতিহাস আছে, আছে সিম্বলিষ্ট পোষ্ট সিম্বলিষ্ট এবং ন্যাচারালিষ্ট মুভমেণ্টের ইতিহাস। ফরাসী, জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ডে অর্থাৎ সমস্ত ইউরোপব্যাপী শিল্প, সাহিত্য ও কাব্যের এই দীর্ঘসূত্রী ইতিহাস আমাদের কাছে নতুন। অন্তত নজরুল ইসলাম পর্যন্ত, তার চেয়ে ভাল হয় ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত, ঐ ইতিহাস আমাদের কাছে এক রকম অজ্ঞাত ছিল বললে ভুল হবে না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারকে ইয়েটস-বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ করতে দেখেছি। কিন্তু তাঁদের লেখায় আধুনিকতার প্রভাব ছিল না বললেই চলে। অবক্ষয়িত রোমাণ্টিক যুগের কবি তাঁরা এবং রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত।

বোদলেয়ারের "ফ্ল্যর দ্যু মাল"-এর প্রকাশকালকে (১৮৫৭) আধুনিক কবিতার জন্মকাল ধরলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কাল পর্যন্ত (সন্ধ্যা সংগীত : ১৮৮১) আধুনিক কবিতার বয়স পঁচিশ বছর। ঐ সময়ের মধ্যে বোদলেয়ারের উত্তর সূরী চারজন বড় কবি (মালার্মে, ভালেরী, ভেরলেন ও র‍্যাঁবো) ফরাসী দেশে জন্মেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে সেই কবি মহারথীদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়নি। দুটি কারণ ছিল। খোদ ইংল্যাণ্ডেই আধুনিক কবিতা এসেছিল অনেক পরে। এবং যেহেতু ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজী ভাষার যোগাযোগ সরাসরি ছিল তাই ইংরেজী

কবিতায় আধুনিকতার আঁচ লাগার আগে বাঙলা কবিতার তন্ত্রীতে তার করস্পর্শ ছিল সুদূরপরাহত।

উপরের ঐ তালিকা দেখলে বোঝা যাবে ১৯১৩ সাল থেকে ইংরেজীকাব্য আধুনিকতার চুম্বনে জেগে উঠেছে। কিন্তু ১৯১৩ সালের বাঙলা কাব্য সাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতি রোমান্টিকরসে মগ্ন রবীন্দ্রনাথও সে আধুনিকতাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর সমকালীন ইয়েটস, এলিয়ট, পাউন্ড পর্যন্ত তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দু'একটি মন্তব্য দেখলেই বোঝা যাবে তার প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন ছিল ঃ

১. সেকেলে কাব্যের বাবুগিরি ছিল সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাস।
২. আঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত।
৩. বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বল সেন্টিমেন্টালিজম, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে।
৪. তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই।
৫. সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায় 'মারো-ঠেলা হেঁইয়ো'।
৬. এখনকার দিনে ছাঁটা-কাপড় চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা।

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর ঐ বিরুদ্ধ মন্তব্যগুলোর প্রমাণ স্বরূপ তিনি পাউন্ড, এলিয়ট ও এমি লোয়েলের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং পাশাপাশি হাজার বছর আগের চীনা কবি লি-পো'র কবিতার অনুবাদ করে দেখিয়েছেন যে সে কবিতাও আসলে আধুনিক শুধু নেই তাতে 'বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত'। এবং প্রসঙ্গত তাঁর মন্তব্য দাঁড়িয়েছে

এমনি বাক্যবিন্যাসে : "স্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিসটা আধুনিক হত।"

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার চরিত্র ধরতে পারেননি তা নয়। শুধু সে চরিত্রকে তিনি সুন্দর বলে স্বীকার করতে সমর্থ হননি—তাঁর রুচি বাদ সেধেছিল এ-ব্যাপারে। হয়তো তাই তিনি বলেছিলেন :

> কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয় তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়।

কেউ কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিশ্বাসে অবিচলিত ছিলেন না এবং তাঁর শেষের দিক্‌কার কবিতার কোথাও কোথাও আধুনিকতার স্পর্শ অনেকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে দাবী করেন।

আমি কিন্তু তা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার আঙ্গিকের রদ-বদল ঘটালেও,—যেটা তিনি তাঁর প্রায় প্রতি কাব্য-গ্রন্থেই করেছেন, আধুনিকতাকে অন্তর থেকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। কেননা চিন্তার 'নিরঞ্জন বিশৃঙ্খলা' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব ছিল। অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে 'হানাদার মস্তিষ্ক'কে স্বীকার করে নেওয়া এবং ঐ রবীন্দ্র-মনোভাব রবীন্দ্র-প্রভাবিত পাঠক-মনে এমন গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে এ-কালে এসেও অনেক পাঠক মন খুলে আধুনিককে আলিঙ্গন করতে অপারগ। এমনকি আধুনিক কবিদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁরা সত্যিকার আধুনিকতার সংগে পরিচিত ত ননই উপরন্তু তাঁরা মনেপ্রাণে প্রাচীন।

মুস্কিল হয়েছে এইখানে। আধুনিকদের মনোনয়নে যাঁরা আগ্রহ দেখাবার জন্যে আধুনিক হতে চান অথচ সম্পূর্ণ আধুনিক হতে পারেন না তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে জাত কবিতার চেহারায় কবির চারিত্র্য ত ফোটেই না বরং তা হয়ে দাঁড়ায় অনুকৃতির এক বিকলাঙ্গ আকৃতি।

পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। পাঠকের বিভ্রান্তির আর এক মস্ত কারণ, এ-দেশের সামাজিক পরিবেশ এবং সমাজ চরিত্র। পূর্বেই বলেছি আমাদের সংযোগ ছিল ইংরেজী সাহিত্যের সংগে। দু'চারজন গভীর পাঠক ছাড়া (রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তার মধ্যে একজন) ইউরোপীয় সাহিত্যের

সংগে আমাদের পরিচয় হয়নি। এবং আমাদের দেশে সত্যিকারভাবে নাগরিক সভ্যতার আজও জন্ম হয়েছে কিনা সে-কথাও চিন্তা করে দেখার ব্যাপার।

ঐ ইংরেজী সাহিত্যও ছিল উচ্চশিক্ষিত সীমিত কিছু পাঠকের মধ্যে। যে-ভাবেই হোক ইংরেজী শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক পাঠক ছাড়াও বাঙলা শিক্ষিত পাঠক রবীন্দ্র-মারফৎ অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের কাব্য-সুধার কিছু আস্বাদ নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু যে-পাঠক রবীন্দ্রনাথকে বুঝেছিলেন (আমি বলতে পারিব না রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন কিনা)—তাঁদের পক্ষে আধুনিকদের বুঝতে পারা অনেক কঠিন এই কারণে যে শিল্প-মানসের পরিবর্তনের সংগে সংগে এ-দেশের পাঠক-মানস যথেষ্ট রকম পরিবর্তিত হয়নি।

ইউরোপে যে দুটো ভয়াবহ যুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর কাঁপন আমরা অনুভব করলেও তার সামগ্রিক যাতনাটা আমরা উপলব্ধি করিনি। মানসিক দিক থেকে আমরা এখনও গ্রামীণ, ধর্মভীরু, সংস্কারাচ্ছন্ন।

আমাদের এ-বঙ্গের একমাত্র বিখ্যাত ঢাকা শহরে কিছু কিছু মটরকার চললেও শহরের দুর্দান্ত গতির এখানে জন্ম হয়নি। এখানে প্রচুর পরিমাণে থিয়েটার হল, নাচের হল এবং বার নেই। রাত্রিবেলা শহরের চোখ ঝলসানো আলো জিন্নাহ এ্যাভিনিউতে পর্যন্ত থাকে না। দু'একটা বড় বড় রাস্তা বাদ দিলে, গ্রামের মত পড়ে আছে শান্তিনগর, কমলাপুর, বাসাবো, পুরনো পল্টন প্রভৃতি এলাকা। লেখাপড়া শিক্ষার ইতিহাস আমাদের মাত্র পঞ্চাশ বছরের। এখনও অন্নচিন্তার মত প্রাথমিক সমস্যা থেকে আমরা উদ্ধার পাইনি। আর আমাদের দেশের শিল্পের ইতিহাস মাত্র কয়েক বছরের। আমাদের চিত্র-শিল্পের জন্ম-ইতিহাস শিল্পী জয়নুল আবেদীন থেকে, আমাদের নৃত্যশিল্পের ইতিহাস বুলবুল চৌধুরী থেকে ; আর কাব্য-শিল্পের ইতিহাস নজরুল ইসলাম থেকে। (আমি কেবল এঁদের নাম করেছি বলে পাঠক ভাববেন না আমি সংকীর্ণতার পরিচয় দিচ্ছি। বাঙালী মুসলিম-মানসের পরিচয় দিতে গেলে তা এমনিভাবেই হবে।) আরও একটু বিস্তৃত করলে ভারতীয় হিন্দুদের চিত্র-শিল্প, নৃত্য-শিল্পের ইতিহাসকেও টেনে আনা যেতে পারে। মুঘল চিত্রশিল্পের কথা তুলতে

পারা যায়। সাহিত্যের ইতিহাস ধরা যায় মাইকেল মধুসূদন থেকে। কিন্তু জোড়াতালি দিয়ে দেখা যাবে এখনও একমাত্র সংগীত শিল্পের ইতিহাস ছাড়া, ইউরোপীয়দের থেকে আমরা পাঁচশো বছরের পিছনে।

বর্তমানে আমরা এই পাঁচশো বছরকে একলাফে ডিঙিয়ে আসার চেষ্টায় ব্রতী। কিন্তু শিল্পের কাজ কখনও এত দ্রুত পরিণতিতে পৌঁছয় না। অথচ কবি-সাহিত্যিকেরা আসতে চান। যাঁরা ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যকে তাঁদের ঐতিহ্য ধরে নিয়েছেন তাঁরা সংস্কারকে ডিঙিয়ে, ধর্মকে পাশে সরিয়ে দিয়ে, পরিবেশকে অস্বীকার করে রাতারাতি-তাঁদের সমগোত্রীয় হতে চান। কিন্তু তাঁরা চাইলেও তাঁদের প্রতিবেশীদের পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটা বিস্ময়কর। মদকে পানির মত ব্যবহার করা যে সমাজের পক্ষে সম্ভব না ; নারীকে বন্ধুর মত সর্ব সময়ের, সর্ব-আসরের সঙ্গী করতে যে-সমাজের আপত্তি, নাচ আর গান আর অভিনয় যেখানে 'হাঁটি-হাঁটি-পা-পা' সেখানে ইউরোপীয় চিন্তায় জাগ্রত মানসের সঙ্গে পাঠককে যে বিকট দ্বন্দ্বের সামনা সামনি দাঁড়াতে হবে সেটা ত অতি স্বাভাবিক।

ওদিকে আবার খোদ ইউরোপীয়দের মত সুশিক্ষিত পাঠককে লক্ষ্য করেই ওখানকার কবিরা বলেন : "আমি শুধু কবিদের জন্যে কবিতা লিখি, সাধারণ পাঠকের জন্যে লিখি গদ্য"।* এই একই দৃষ্টিভঙ্গি এখানকার সাম্প্রতিক কবিদেরও। তবে ওঁরা যে-কথা বলেছেন পাঁচশো বছরের ইতিহাস পিছনে রেখে। আমরা তাই বলছি পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস পিছনে রেখে। তাও আবার সে পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আমাদের কাছে নতুন হলেও ইউরোপীয়দের কাছে পুরাতন। অর্থ সব সময় এই দাঁড়াচ্ছে আমরা সব সময় ওদের বাদ দেওয়া পোশাকটা তুলে গায়ে দিচ্ছি। সেটা আমাদের শরীরের সঙ্গে মানাচ্ছে কিনা দেখছি না। কেবল দামী পোশাক বলে সেটা গায়ে চাপাচ্ছি এবং হয়ত বা 'অভিভূত চাষার' মত মনে খুশীও হচ্ছি।

উপরের উদাহরণ দর্শনে আধুনিকরা হয়তো আমাকে সেকেলে বলে অবজ্ঞা করবেন কিংবা অভিশাপ দেবেন আমার উলঙ্গ কথার রূঢ়তা দেখে।

* I write poems for poets and satire or grotesques for wits...For people in general I write prose.—Robert Graves.

কিন্তু যে-ভাবেই তাঁরা আমাকে বুঝুন আমি বলব এখন তাঁদের সময় এসেছে পাঠকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার, আপনার করার। লেখার ভিতর থেকে পাঠককে আপনার করে নিতে না পারলে. পাঠকের মনোভাবনাকে পাঠকের কাছে ফিরিয়ে না দিতে পারলে, পরিণাম তাঁদের যে শুভ হবে না এ-কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই।

যে ইজ্‌মই তাঁরা করুন সেটাকে আপন চিন্তাধারার সঙ্গে জারিয়ে নিতে হবে। রস জ্বাল দিলে গুড় হয় ; আর গুড়কে যান্ত্রিক ক্রিয়ায় চিনিতে উৎপাদন করা যায় ; আর চিনিকে করা যায় মিছরী। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে পদার্থের এই রূপান্তর ঘটে মস্তিষ্কেরই অপূর্ব ব্যবহারে। সত্যিকার কবি কোন একটি অবলম্বন পেলে তিনি অনুকৃতির ধার না ধেরে নিজের মতন করে নতুন কিছু সৃষ্টি করবেন। সে নতুনের সৌন্দর্যে কেউ সাড়া দেবেন না এটা আমি ভাবতেই পারি না। নতুন মাইকেলকে কেউ অস্বীকার করেনি, নতুন রবীন্দ্রনাথকেও না, নতুন নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশকেও না। তবে আমাদের অতি সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে কেউ নতুন হয়ে জন্ম নিলে তাকেই বা 'স্বাগতম' বলবে না কেন ?

কেউ কেউ আছেন নতুন দেখলেই চম্‌কে ওঠেন, ভয় পান। মনে রাখতে হবে এই রকমভাবে ভয় পাওয়া লোক আসলে অরসিক, অশিল্পী, অচোখ—শিল্পের জগতে ক্লাসের সবচেয়ে পিছনের বেঞ্চের ছেলে—ক্লাসে কি পড়া হচ্ছে তা তারা দেখে না ; হয়ত বা তারই মত বন্ধুর সঙ্গে কোন উড়ন-চণ্ডী জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে ; এবং হঠাৎ মাষ্টার পড়া ধরলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। এঁরাও থাকেন চলিষ্ণু জগতের দিকে অবিরাম মুখ ফিরিয়ে, ব্যক্তিগত খেয়ালের রাস্তায় পায়চারী করে এবং হঠাৎ যখন ধাক্কা খেয়ে সজাগ হন তখন দেখেন তাঁর চোখের সামনের জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। গাড়ী যখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি আত্মমগ্ন থাকাতে টের পাননি। হুইসিল দিয়ে গাড়ী যখন ছেড়ে গেল তখন দৌড়িয়ে তার পিছু ধরার মত সময়ও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

এ অবস্থায় পাঠকের দোষ আছে। কিন্তু সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে এ-রকম পাঠকের সংখ্যা সামান্য—ঐ সামান্য আনমনা গাড়ী ফেল করা যাত্রীর মত।

কিন্তু তাও আবার কথা আছে। যে চাষার সময় জ্ঞানই নেই তার পক্ষে গাড়ী ফেল করা কিছুটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে চালকের উচিত যাত্রীকে সজাগ করে গাড়ীতে উঠিয়ে নেওয়া। আর আমাদের মত ৯৯·৯৯% অশিক্ষিত জনসাধারণের দেশে এই বিষয়টাকে যে একেবারে উপেক্ষা করা যায় আমার তা বোধ হয় না। লেখককে এখানে সুবিবেচক হতে হবে ; প্রয়োজন হলে অক্ষম পাঠককে টেনে তুলে নিতে হবে বাসের কণ্ডাক্টরের মত। উপেক্ষা না করে সহযোগিতা করতে হবে। মাতালের মত তার মনে রাখতে হবে যে মদের সঙ্গী না জুটলে মদ খেয়ে আরাম নেই। আর শিল্পকে ভীষণভাবে ব্যক্তিগত করে তুললে বন্ধ ঘরের নিঃসঙ্গ ছবির মত সে হবে মাকড়শার বাসভূমি, আরশুলার ল্যাটরিন।

আমি জানি :

> Art is never transfixed, never stagnant. It is a fountain rising and falling under the varying pressure of social conditions, blown into an infinite sequence of forms by the winds of destinys.*

আর সেই সঙ্গে জানি রোমান্টিকতার পচা ফলের দানা চিরে কি ক'রে বেরিয়ে এসেছিল আধুনিক কাব্যের বস্তুনিষ্ঠ তন্ময় শিল্প-চেতনা তথা কাব্য চেতনা। আর এ-কথাও যথার্থ যে নতুন সৃষ্টির অর্থই হল পুরনোকে ধ্বংস করা। যে-কোন সৃষ্টির পিছনে এই নিষ্ঠুর সত্যটি লুকনো আছে। রবীন্দ্রনাথও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ বলেছিলেন "ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর/ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী, এয়েছে রবির কর !" এই কথা প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসের জন্য নয় নতুন সৃষ্টির জন্য। সে গড়তে পারবে বলেই সে ভাঙে। 'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর !'

আধুনিকরাও সেটা চান। ভেঙে গড়তে চান। যারা পুরাতনের পূজারী তাদের কাছে এটা ভাল নাও ঠেকতে পারে। এর কারণও আছে। যার গা ওঠাবারা সামর্থ নেই চৌকি বদলাবার কথা শুনলে সে বিরক্ত হয়। কিন্তু

---

* Art in Europe at the End of the Second World War : The Philosophy of Modern Art : Herbert Read...P.57.

একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে। ভাঙা বাসার মধ্যে থেকেও যারা বাসা বদলায় না একদিন বৈশাখের ঝড় এসে যখন তাদের ঘরের খুঁটি শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে যায় তখনই আসে নতুন ঘর বাঁধার উৎসাহ। সময় হাতে রেখে যে কাজ করলে ভাল হত প্রাণের দায়ে সেই কাজ করতে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে। আর তার পরিণাম হচ্ছে এই যে মনোনীত শিল্প আমাদের কাছে দুর্লভ সামগ্রী হয়ে পড়েছে। ব্যস্ততার জন্য স্বাভাবিক চলার ছন্দও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমের হাতে পড়েছে সুন্দরের অর্চনা। বলা বাহুল্য রূপ গরীবের ঘরে জন্মাতে পারে কিন্তু তার অর্চনা হয় ধনীর প্রাসাদে।

এ-ক্ষেত্রে বর্তমান কাব্য-চর্চায় স্বেচ্ছাচারিতার কথাও তোলা যেতে পারে। অথচ শিল্প স্বেচ্ছাচারিতা নয়। শিল্প হচ্ছে একটা শৃঙ্খলিত বিন্যাস। ধরা যাক যদি কোন একটি লোক একটি বাগানের শোভা বৃদ্ধি করতে চায়, তার চারিপাশে সুপুরী অথবা নারকেল গাছ লাগিয়ে, তা'হলে গাছগুলোকে সে এমনভাবে লাগাবে যাতে প্রত্যেক গাছের দূরত্ব অন্যটি থেকে সমান মাপের হয়। এই সামঞ্জস্য রক্ষা না করে সে যদি গাছগুলোর কোনটাকে দু' হাত, কোনটাকে তিন হাত, আবার কোনটাকে এক বিঘৎ অন্তর রোপন করে ; অথবা সারি ভেঙে সরল রেখায় তাকে রোপন না করে ছড়ানো দানার মত তাদের সাজায়, তা'হলে তাতে শিল্পের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। ইচ্ছা করে সে যদি সরল রেখার পরিবর্তে গাছগুলোকে ত্রিকোণাকারে সাজায় তা'হলেও ব্যবধানের সমতা ভাঙলে চলবে না।

এই শৃঙ্খলা প্রকৃতির মধ্যেও আছে। ধীরুজ তরঙ্গ একটা নদীর কথা ধরা যাক। তীরে দাঁড়িয়ে দেখলে আমরা দেখব যে ঐ নদীর প্রতিটি ঢেউ সমান ব্যবধানে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। যে বাতাসে ঐ ঢেউয়ের জন্ম সে বাতাস যদি আরও বেশী হয় তা'হলে ঢেউয়ের আকার বাড়বে—কিন্তু সব সময় সমতা বজায় রেখে। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় ঠিক থাকতে হবে। সেটা হল বাতাসের গতি। যদি বাতাস গতি বদলায় ঢেউও গতি বদলাবে। অনেক সময় বাতাস ঘন ঘন গতি বদলায় আবহাওয়ার অবনতির জন্য—বিশেষ করে ঝড়ো আবহাওয়ার সময় এলোপাথাড়ি বাতাস বয়। আর নদীর ঢেউয়ের মধ্যে তখন একটা মাতাল উন্দামতা জেগে ওঠে। তরঙ্গ রেখায়

ছন্দ তৈরী করে হেলে দুলে চলা সাপ হঠাৎ আঘাত খেলে যেমন যন্ত্রণায় অক্রমচক্রে মোচড় খায়, ঐ ঝড়ের আঘাতে নদীর সামনে এগিয়ে যাওয়া ঢেউয়ের ছন্দ যায় তেমনি হারিয়ে। হয়তো বা আধুনিক কবিতা অমনি একটি ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে অনির্দেশ্য ঘূর্ণিঝড়ে পাক খাচ্ছে। ঠিক সুস্থ সঞ্চরণ আর তার নেই। সে জন্যেই সম্ভবত আমরা আধুনিক কবিতার ছন্দে যেমন একটা মাতাল স্বভাবের চরিত্র লক্ষ্য করি তেমনি লক্ষ্য করি তার ভাবনার রাজত্বে ঝড়ো হাওয়ার স্বেচ্ছাচারিতা।

এ-ক্ষেত্রে ঐ প্রাকৃতিক উপমা এনেই বলে দেওয়া যায় যে যে-কোন ঝড় ক্ষণজীবী আর ক্ষণজীবী ঐ ছন্দহীন নদীর ঢেউ। ঝড় ফুরিয়ে গেলেই নদী আবার তার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাবে—আমাদের সমাজ-জীবনে যে অস্থিরতা এরও অনুপস্থিতি ঘটবে একদিন। তখন কবিতাতেও ফিরে আসবে স্বাভাবিক ছন্দ। কিন্তু এখন যে সে সেই ছন্দকে হারিয়ে ফেলেছে এ-কথা মিথ্যা নয়।

বস্তুত কবিতার বিষয় সম্পর্কে দুটো কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সম্প্রতি কোন কোন কবির কবিতায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে তাঁরা মানব-মানবীর যৌনাচারের চিত্রও কবিতায় তুলে ধরতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। এটা কোন হাল আমলের ব্যাপার নয়। অতীত কালের অনেক কবিই কাব্যে কামালেখ্য অঙ্কনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ইমরুল কায়েসের সঙ্গে পরিচিত পাঠক ত বটেই এমনকি সংস্কৃত কাব্যেও তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেদীপ্যমান। এই বংশের শিল্পীদের ধারণা

> There is nothing ugly; I never saw an ugly thing in my life: for let the form of one object be what it may light, shade, and perspective will always make it beautiful.—Constable.

এ-ব্যাপারে তাঁরা একটা যুক্তি-সংগত কারণও দেখান। তাঁদের মতে রুগ্নতাকে দূর করার উপায় রুগ্নতাকেই সজীব করে দেখানো, ক্লেদকে পরিহার করার উপায় ক্লেদের কদর্যতাকে প্রকাশ, বৈকল্যকে দূর করার উপায়

বিকলাঙ্গকে উলঙ্গ করে পরিবেশন করা। বসন্তের ওষুধ যেমন হয় পচা গো-মাংসের পুঁজ থেকে, রক্তচাপের রুগীকে যেমন সুস্থ করে তোলা হয় নিদ্রাকারী বিষবটিকা প্রয়োগে তেমনি সমাজের ব্যাধিকে দূর করতে হলে দরকার ঐ ব্যাধির দুর্গন্ধকে উদ্‌ঘাটিত করা। পিকাসো তাঁর 'ল্য দেমোয়েযেলস দ্যাভিগনন' ছবিটা নাকি ঐ উদ্দেশ্যে এঁকেছিলেন। বারসেলোনার এ্যাভিগনন নামক একটি রাস্তার পার্শ্ববর্তী বেশ্যালয়কে কেন্দ্র করে পিকাসো এই ছবিটি আঁকেন। এতে পাঁচটি উলঙ্গ বেশ্যার মূর্তি আঁকা হয়েছে এমনভাবে যে দেখে দর্শক আহত হবে। পিকাসোর বন্ধুরা পর্যন্ত ঐ পাশবিক নিষ্ঠুরতায় আঁকা ছবিটা দেখে আহত হয়েছিলেন।

> And it was meant to shock. It was raging, frontal attack, not against sexual 'immorality', but against life as Picasso found it—the waste, the desease, the ugliness, and the ruthlesness of it.

বলেছেন Success and Failure of Picasso -র লেখক জন বার্জার। অবক্ষয়িত সভ্যতার মুখোশকে ছিঁড়ে দেখাবার জন্যেই পিকাসো ১৯০৭ সালে ছবিটি আঁকেন। আর জনগণের সামনে সেটাকে উপস্থিত করা হয় ১৯৩৭ সালে। ছবিটি আঁকার এক বছর আগে লেরু বারসেলোনাতে যে বক্তৃতা দেন পিকাসোর অভিপ্রায়ও ছিল তারই অনুরূপ :

> Enter and sack the decadent civilization...... destroy its temples...tear the veil from its novices.

সব কিছুই পূর্বসূরীদের অনুকরণ ব'লে "হানাদার মস্তিষ্কে"র শিল্পীরা চেয়েছিলেন চিন্তার স্বাধীন মুক্তি, সেচ্ছাচারী স্বপ্নের প্রতিলিখন এবং চিন্তার ধ্বনির শ্রুতিলিখন। আর তাই অবক্ষয়িত মানব সভ্যতার ধ্বংসের উপরে তাঁরা ওড়াতে চেয়েছিলেন অবচৈতনিক সুররিয়ালিজমের বিজয় নিশান। কিন্তু জারার ডাডাবাদ যেমন অতিশীঘ্র সুররিয়ালিজমের মুখোশ পরে চেহারা পাল্টেছিল তেমনি এক্সপ্রেশানিজম ও সুররিয়ালিজম বিলম্ব না করে পরেছিল এক্‌জিসটেন্‌শ্যালিজমের জামেআর। সুররিয়ালিজমের

প্রচণ্ড প্রেমিক আঁদ্রে ব্রেতোঁ সাত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দল গঠন করে বিফল হয়েছিলেন, খসাতে পারেননি সে চাদর অস্তিত্ববাদীদের শরীর থেকে। কিন্তু ব্রিজওয়াটারের তালিকা দেখেই বুঝতে পারবেন অস্তিত্ববাদীদেরও পোশাক ছিঁড়তে শুরু হয়েছে। এবং যে রোমান্টিকতা একদা আধুনিকতার ঘুঁষি খেয়ে উল্টে পড়েছিল সে আবার স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—হয়তো বা পাল্টা আক্রমণের সংকল্প নিয়ে। ফলত এর অন্তর্নিহিত কারণ লুকনো আছে স্বপ্নচারী মানুষের স্বভাবে—সে কেবল বদল চায়—'কেবল বাসা বদল।'

গদ্যে উপমা

গদ্যে উপমা প্রয়োগ বাঞ্ছিত কি না, বাহুল্য কি না? এবং উপমা কেবল কবিতায় ব্যবহার্য এবং অব্যবহার্য এই মত সমর্থনীয় কি না?

বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর লেখকগণের প্রত্যেকের লেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁরা সবাই তাঁদের গদ্য রচনায় কোন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে,—গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে যে কোন গদ্য রচনায়—উপমা ব্যবহার করেছেন। গদ্য সাহিত্যের সবচেয়ে বড় যে দু'জন লেখক সেই রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্র ত বটেই এমন কি শরৎচন্দ্র, প্রমথনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, এবং আধুনিক কালের সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকেরাও ঐ অভ্যাস থেকে অব্যাহতি পাননি।

গদ্য লেখা যদি খুব বেশী কাব্যিক হয় তা'হলে সেটাকে আমরা গদ্যের একটা ত্রুটি বলে মনে করি, কিন্তু প্রসাদগুণ সম্পন্ন সরস রচনা যাকে বলা হয় তেমন গদ্য ত কাব্যের স্বভাবমণ্ডিত হবেই। গদ্য কখন সরস হয় কখন হৃদয়গ্রাহী হয়? বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে যে সে যখন কাব্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সামান্য হলেও কিছুটা অলঙ্কার তার অঙ্গবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন। কবিতার সঙ্গে রমণী অথবা সুন্দরী রমণীর কিংবা রহস্যময়ী সুন্দরী রমণীর তুলনা করি বলে গদ্য যে কাটখোট্টা পুরুষ হবে এমন মত নিশ্চয় গ্রাহ্য নয়। গ্রাহ্য নয় এইজন্যে আসলে পুরুষও যখন ঘরের বাইরে আসে তখন তাকে পোশাক পরে বেরিয়ে আসতে হয় আর সে পোশাক যত পরিপাটি সুবিন্যস্ত এবং সুসমঞ্জস হয় ততই ভাল,—খুব বেশী দামী না হলেও; কিন্তু দামী পোশাকে যে পুরুষেরও রূপ খোলে সে বিষয়ে কোন সুরসিক আমার সঙ্গে অন্যমত হবেন বলে মনে করি না। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কথা গিয়ে দাঁড়ায় এই যে গদ্যকেও রূপবান হতে হবে। তার গায়ে যদি পোশাকও না থাকে ত তার খালি দেহটা হবে সুশ্রী, সুঠাম, ছন্দময়।

আধুনিক গদ্য পোশাকের বাহুল্য বর্জন করলেও অল্প পোশাকে নিজেকে তার সুঠাম সুন্দর করার ঝোঁক আছে। আর তার চলাফেরার মধ্যে একটা বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে না তুলে সে বাইরে আসার পক্ষপাতী নয়। তর মানে সেও চায় দৃষ্টিহারী হতে, সেও চায় সৌন্দর্য প্রকাশ করতে, সেও চায় রূপশ্রী হতে। এ কথাকে মানলে শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় সেই একই কথা। অর্থাৎ কাব্যের যা কাম্য গদ্যেরও কাম্য তা—সুন্দর হওয়া।

যখন সৌন্দর্য স্বীকৃত সত্য বলে গৃহীত হল তখন তা প্রকাশের প্রথম শর্ত হিসেবে প্রসাধন কথাটিকে গ্রহণ করতে হবে। সে প্রসাধন কি ? কবিতা ও গদ্য কি একই প্রসাধন দাবী করে ?

ধরা যাক আমরা যত সাদামাঠা গদ্য লিখি না কেন তার মধ্যে বিশেষণ ব্যবহার না করে পারি না। অর্থাৎ বিশেষ কোন গুণ, বিশেষ কোন দোষ আরোপ করতে গেলে ঐ বিশেষণ ছাড়া উপায় থাকে না। আমরা যখন একটা ফুলের কথা বলি তখন তার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারি না। ফুলটা কি রকম ? ভাল না মন্দ বলেও রেহাই নেই। যেহেতু পৃথিবীতে বহু বর্ণের ফল আছে সুতরাং তার বর্ণটিকেও চিহ্নিত করতে হয়। তারপর . আরও একটি প্রশ্ন আসে এবং তা ফুলের গুণ নিয়ে। এই গুণের প্রশ্ন আসার কারণ, কিছু ফুল আছে গন্ধযুক্ত, কিছু ফুল আছে গন্ধহীন, তাই। অর্থাৎ যে ফুলটির কথা বললাম সে ফুলটি সৌগন্ধযুক্ত ফুল কি না তারও উত্তর দিতে হয়। কিন্তু তবুও প্রশ্ন নিঃশেষিত হল না ; ফুলের বর্ণ যেমন এক রকম নয় তেমনি ফুলের গন্ধও এক রকম নয় ; গোলাপের গন্ধ নয় হেনার মত। উগ্র, তীব্র, স্নিগ্ধ, কোমল এমনি বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হয় ফুলের গন্ধের। কিন্তু শুধু বিশেষণ আরোপ করেও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। আসে তুলনামূলক বিচারের কথা, আসে উপমার কথা।

আমরা যখন কোন মেয়ের রূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি তখন মেয়েটি শুধু সুন্দর শুনে তৃপ্ত হই না, শুনতে চাই কত সুন্দর সে এবং আরও প্রশ্ন জুড়ে দিই সেই সাথে : কার মতো সুন্দর সেই মেয়েটি ? অন্য আর একটি সুন্দরী মেয়ের রূপের তুলনা দিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। যখন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না তখন তার সৌন্দর্যের তুলনা জড় ও অজড়

প্রাণী বস্তু বা পদার্থের মধ্যে সন্ধান করি ; কখনও ফুল, কখনও চাঁদ, কখনও তারা, কখনও পাখী, দীঘি, নদী, হ্রদ, ঘাস, সোনা, রূপা, প্রাণী, জড় প্রভৃতি নানা ধরনের দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করি এবং এতেও যখন প্রাণ ভরে না তখন তার তুলনা চলে অদৃশ্য বস্তুর সঙ্গে, কাল্পনিক বস্তুর সঙ্গে—হুরী, পরী, কিন্নরী, অপ্সরী এইসব এসে যায় ; তুলনা চলে মিষ্টতার সঙ্গে, সৌরভের, সুরের সঙ্গে, গানের সঙ্গে, অনুভূতি-গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে। ব্যাখ্যার জন্যে, এবং মানুষের মনে উদিত সবগুলো প্রশ্নের জন্যে, বিশেষণ থেকে শুরু করে সকল উপমার পথে পা বাড়াতে হয়। অতএব শুধু গদ্য ও কবিতায় নয়, শিল্পসাহিত্যে উপমা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। যে-লোক বক্তৃতা দেন তাঁকেও যেমন উপমার আশ্রয় নিতে হয় তেমনি যে লোক নাচেন তাকেও মুদ্রার উপমার সাহায্য নিতে হয়। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ নৃত্যশিল্পটাকে উপমা বললে বোধ হয় ভুল হয় না।

কিন্তু গদ্যে যে উপমা থাকবেই এমন কোন কথা নেই, একমাত্র কল্পনাপ্রবণ এবং কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন লেখকের রচনাতেই উপমার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাঙলা গদ্যের যিনি প্রথম প্রকৃত স্রষ্টা তিনি নিঃসন্দেহে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লেখায় সুর ও ছন্দ থাকলেও, সন্ধি-সমাসবদ্ধ পদের বহু চিহ্ন থাকলেও সেখানে উপমার প্রয়োগ সামান্য। পূর্ণ উপমার সাহায্য নেওয়ার তাঁর প্রয়োজনও হয়নি। চাঁদের মত মুখকে তিনি 'চন্দ্রবদন' বলেই কাজ সেরেছেন। ঐ একটি মাত্র শব্দের মধ্যেই উপমা হয়ত লুকিয়ে আছে কিন্তু যে উপমা আমরা বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলে দেখি তেমনি ধরনের উপমা ঈশ্বরচন্দ্রে বিরল। সম্ভবতঃ তার কারণ পরবর্তী লেখকগণের সকলেই কেবল শরৎচন্দ্র ছাড়া, কবি। এবং শরৎচন্দ্রকেও ব্যাপক অর্থে কবি বলে চিহ্নিত করা যায়। কেননা তাঁর কল্পনার চরিত্রটি অনেকখানি কবিরই মত।

আবেগ কি উপমার জন্ম দেয় ? দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের একটি চরিত্র যখন বলে :

> নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার ন্যায় করাল, দুর্ভিক্ষের মত ভয়ঙ্কর আমি সমগ্র এশিয়াকে পদতলে দলিত করে চলে এসেছি।

তখন সে কি নাটকের বাস্তবতাকে লঙ্ঘন করে? কিংবা তাঁর অন্য আর একটি নাটকের আর একটি চরিত্র যখন বলে:

> তবে তাই হোক, মা, আমি অগ্নির মত জ্বলে উঠি তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়; আমি ভূমিকম্পের মত সমস্ত সাম্রাজ্যখানিকে ভেঙে চুরে দিয়ে চলে যাই তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত এসে তাকে গ্রাস কর।

তখন মনে হবে বাস্তবে আমরা যে আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করি এ ভাষা তা নয়। এ-শুধু কথা নয় কবিতা, কেননা এর প্রতিটি পংক্তি উপমা-বহুল; অথচ ভাষাটি—কবিতার নয় নাটকের; তা'হলে কবিতা হয়ে কি এ নাট্য-ভাষার চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে?

ঘটনাসংঘাতে প্রখর অনুভূতি আবেগে রূপান্তরিত হয় আর আবেগ প্রকাশের পথ খোঁজে বিভিন্ন উপায়ে, একটা মাধ্যম বেছে নিতে হয় তাকে এবং সে মাধ্যম এমনি হওয়া চাই যাতে সে তার নিজের রূপকে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। ভাষা ঐ মাধ্যম বটে কিন্তু ভাষা তাই যা অন্য একটি হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টিতে পারঙ্গম। অন্য আর একটি হৃদয়কে আবেগে উন্মোচিত করতে গেলে ভাষাকে কেমন হতে হবে? সে গদ্য হলেও তাকে কি প্রসাধনে সুজ্জিত হতে হবে না। আবার সেই নারীর উদাহরণ উপস্থিত করতে হয়—যে নারীটি সাধারণ আর যে নারীটি মনোলোভা, পুরুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষী যে, তার মধ্যে তফাৎ আছে। মনকে আকর্ষণ করতে গেলে মনের মত করে নিজেকে তৈরী করতে হয়। পরিচ্ছদহীন, অঙ্গবাস-হীন যে দেহ দিগম্বর সে দেহ কি পুরুষের মন আকর্ষণ করে না? করে। শুধু মাত্র দেহটাই যদি অলঙ্কারের চেয়ে সুন্দর হয়। কিন্তু তাও বোধ হয় পরম সত্যের সবটুকু নয়। তা যদি হত তাহলে প্রাচীন কাল থেকে মানুষের এই অঙ্গবাসের প্রয়োজন পড়ত না। পৃথিবীর প্রথম প্রিয়া খোঁপায় যে ফুল গুঁজেছিল সে শুধু তার নগ্নদেহ দেখিয়েই তার বাঞ্ছিত জনের চিত্তহারী না হতে পেরেই—তাইত এত রঙ-বেরঙের বিচিত্র সজ্জার সমারোহ, এত অলঙ্কারের আড়ম্বর। বিবাহের বধূটিকে ত তার রান্নাঘরের কাপড় পরিয়ে চালিয়ে দিলেই চলে, কেন তাকে হলুদ-স্নানে স্নিগ্ধ করে চন্দনে চর্চিত করে, আতরে সুগন্ধে সুরভিত করে, রঙিন বাসে সুসজ্জিত করতে

হয় ? নবীন বরকে বিমুগ্ধ করতে নয় কি ? রূপকে ছাড়িয়ে রূপাতীতের জন্ম দিতে গেলে রূপকে অপরূপ হতে হয়। কেননা অপরূপ যে প্রেম সে ঐ অপরূপ ছাড়া মুগ্ধ হয় না। শুধু মাত্র দেহটা ত ভোগতৃষ্ণাকেই উদ্বোধিত করে কিন্তু তারও ওপরে যে মানুষের অন্য আর এক তৃষ্ণা আছে সে ভীষণ স্পষ্ট রূপকে সহ্য করতে পারে না, কেবল তারই জন্য প্রয়োজন হয় রূপের রহস্য সৃষ্টির। কেবল রহস্যের অন্ধকার পর্দার অন্তরালে আন্দোলিত মৃদু বিচ্ছুরিত জ্যোতিই মানুষের কাম্য। কেননা মানুষ সহজে যেটা পায় সেটা পাওয়ায় তার লোভ নেই।

আরও একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন ঃ

> কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থা বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র—নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্য-পিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শত সহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তার স্বরে যে একটি কাংসক্রেংকার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে অরণ্যমহোৎসবের প্রাণ জাগয়া ওঠে।

তিনটি দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে একটি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে—'মাতৃস্তন্য-পিপাসু—ঊর্ধ্ববাহু শত-সহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাস'। কি প্রয়োজন ছিল ঐ উপমার ? ঐ উপমা ছাড়াই ত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। তা হয় না ; কিন্তু রসের পূর্ণ সঞ্চারে কিছু ঘাটতি থাকে বোধ হয়। একটা বিষয় স্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়টিকে সুন্দর বলে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন সাধারণভাবে সেটি সুন্দর নয়, অন্ততঃ কোকিলের সুরের মত মিষ্ট নয়, কিন্তু লেখক চান সেটাকে সুন্দর করে দেখাতে। ঐ সুন্দর করে, মধুর করে দেখাতে হলে

মাধুর্যসৃষ্টির আয়োজনের প্রয়োজন, তার আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের দরকার। দরকার এইজন্যে যে তিনি মন্দের মধ্যে ভালো দেখেছেন, যা অন্যের চোখে নাও পড়তে পারে। তাঁর দেখাটা যে অসাধারণ দেখা সেটাই তিনি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। কথাটা বোধ হয় সব শিল্পীর বেলাই খাটে। শিল্পীর কাজ বিশেষকে সবিশেষ করে দেখানো। আমরা দেখার বস্তুর মধ্যে প্রতিদিন দেখেও যেটা দেখি না সেটাকেই দেখানো শিল্পীর বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু গদ্যের আর এক ধরনের প্রকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি লেখা থেকে আমরা তার উদাহরণ দিতে পারি :

> দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত সুরকে বাঁশীর সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশী বাজে না।
>
> সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতিদিনের কাজে কর্মে কথায় ভরে গিয়েছে—প্রতিদিনের ভয় ভাবনা কৃপণতায়।

এ-লেখাটি রূপক। এবং বললে ভুল হবে না যে গদ্যের আকারে এটা একটা পূর্ণ কবিতা।উপমা এখানেও ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু প্রতিতুলনার বস্তুটিকে আড়ালে রেখে। বাঙলা গদ্যে এ-ধরনের লেখায় রবীন্দ্রনাথের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যদি বলি ঐ 'বাঁশী' প্রতীক তবু ভুল হয় না। এবং 'আঁধি' শব্দটি বসেছে অন্য আর একটি শব্দের পরিবর্তে, যে শব্দের পরিবর্তে বসেছে তার মত বলে 'আঁধি' ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সেই উপমাই এল শেষ পর্যন্ত।

গদ্যেও যদি 'উপমা' একটি প্রধান অবলম্বন হয় এবং কবিতাতেও যদি সেই একই 'উপমা' অবলম্বন হয় তাহ'লে তাদের ভিতরকার ভেদচিহ্ন ব্যবহৃত হবে কোন খানে ? আমরা অর্থাৎ যারা এই আধুনিক কালের লেখক, কিংবা পাঠক, তাঁরা সবাই জানি যে গদ্য আঙ্গিকের এক ধরনের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে প্রচুর সৃষ্টি হয়েছে—অনেকটা গদ্য-পদ্যের ভেদাভেদ লুপ্ত করে। এবং আমরা উপরোদ্ধৃত রবীন্দ্র-রচনাকে কাব্য বলে বিবেচনা করতেও কুণ্ঠিত হই না। এই যদি অবস্থা হয় তাহ'লে দু'জনের বিশেষত্ব

নিরূপিত হবে কি ভাবে? শুধু কি পোশাক পাল্টে পুরুষ নারী হতে পারে অথবা নারী হতে পারে পুরুষ?

আসলে যে জিনিষটা গদ্য-পদ্য অথবা গদ্য এবং কবিতার মধ্যে বিভেদ নির্দেশ করে সে উপমা নয় কিংবা ছন্দও নয়, সে হল সুর, সে হল শব্দ-বিন্যাস; বাক্যরচনায় শব্দ যে আঙ্গিকে গদ্যে ব্যবহৃত হয়, কবিতায় তা হয় না। সুতরাং কেবল গদ্যে উপমা ব্যবহৃত হলেই সেটা কাব্য হয়ে যায় না।

সংলাপ
ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৭

গদ্য ও গদ্য কবিতা

কবিতা কি জানার আগে কবিতার আকারগত কতকগুলো লক্ষণের সংগে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছন্দের সংগে গদ্য ছন্দের প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে 'পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙকার'-এর কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ ছন্দের স্পষ্টতাই প্রথমে কবিতাকে গদ্য থেকে পৃথক হিসেবে চিহ্নিত করে। তারপর কবিতার আর কি কি গুণের কথা বাকী থাকে ? নানা ধরনের উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প এবং রূপক-প্রতীকের ব্যবহার। এই সব শর্তগুলো যদি ভাব প্রকাশের সময় গদ্য লেখায় রক্ষা করা যায় তা'হলে সে গদ্য কবিতা হতে পারে —অন্তত আধুনিক কবিদের তাই ধারণা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে 'গীতাঞ্জলি'কে ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করতে গিয়ে গদ্যে কবিতা লেখা যায় কিনা তাঁর মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল এবং 'লিপিকা'র 'কয়েকটি লেখায়' 'বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না' সেটা তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। বস্তুত 'লিপিকা'র গদ্যগুলি পড়লে এক ধরনের কাব্যের আমেজ যে তাতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ফলত গদ্য এবং গদ্য কবিতার সংগে সুস্পষ্ট পার্থক্য কি জানার আগে আমাদের জানতে হবে পদ্যের সংগে কবিতার পার্থক্য কোথায়। পদ্যে সেই সব অলঙকার থাকে না যা কবিতায় থাকে। অর্থাৎ উপমা, রূপক প্রতীক চিত্রকল্পের কোনো ব্যবহার থাকে না এবং রস উৎসৃজনকারী কল্পনা অথবা ভাবের কিম্বা চিন্তা অথবা আবেগের সন্নিবেশ থাকবে না পদ্যে। বলা বাহুল্য 'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলো গানে অলঙকারের স্পষ্ট উপস্থিতি নেই কিন্তু সেগুলো উৎকৃষ্ট কবিতা এইজন্যে যে তা মহত্তম ভাবনায় স্পন্দিত। পদ্যে কোন মহৎ ভাবনার প্রকাশ ঘটেনা। সুতরাং কেবল ছন্দ নিয়ে পদ্যের কবিতা হওয়ার যোগ্যতা নেই। অতএব 'সুস্পষ্ট ছন্দ ঝঙকার' কবিতার একমাত্র শর্ত নয়। ছন্দের ঐ বাধ্য-বাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েও

কবিতা যে কবিতা হয়ে উঠতে পারে এমনি একটি চিন্তাধারায় গদ্য কবিতার সৃষ্টি। বুদ্ধদেব অনূদিত বোদলেয়ারের নিম্নলিখিত গদ্য কবিতাটি :

বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো :
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, অথবা ভগ্নীকে ?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা ?
ঐ শব্দের অর্থ কখনো জানিনি।
তোমার দেশ ?
জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য ?
পারতাম বটে তাকে ভালবাসতে—দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন ?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভু অচেনা মানুষ কী ভালবাসো তুমি ?
আমি ভালবাসি মেঘ, ... চলিষ্ণু মেঘ ... ঐ উঁচুতে ...
ঐ উঁচুতে ...
আমি ভালবাসি আশ্চর্য মেঘদল !

একটি মহৎ কবিতা। মহৎ কবিতা কেননা একটি মহৎ ভাবনায় কবিতাটি আন্দোলিত। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। কবিতাটি আমাদের মহত্তম কতকগুলো ভাবনায় জাগিয়ে তুললেও যে অর্থকে সে প্রকাশ করতে চায় তা খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত নয়। অর্থাৎ তার সমস্ত শরীরটা আমাদের চোখের সামনে নেই, কতকগুলো অঙ্গ কেবল বাইরে থেকে তার আবৃত অঙ্গের দিকে আমাদের আহ্বান করছে, আমাদের গভীর দুর্নিবার লোভ জাগিয়ে তুলছে। ঐ গুণটি আছে বলে গদ্যে রচিত হয়েও এটি কবিতা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু কাব্যগুণ বর্জিত গদ্য হলে সে হত একটি নগ্ন নারী। তার আনখকেশাগ্র পর্যন্ত উন্মোচিত থাকত আমাদের চোখের সামনে। ঐ নিরাবরণ, নিরাভরণ, ব্যক্ত, বিকশিত দেহে কোনো রহস্যের আমন্ত্রণ নেই। এক নিমেষেই সমস্ত কৌতূহলের সে

অবসান ঘটাচ্ছে। অনায়াসেই সেই উদ্ঘাটিত রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বলেই সে আমাদের কৌতূহলের লোভের সমুদ্রে ঝড় তোলেনা। এবং তখন সে শুধু গদ্যই থাকে, সে গদ্য কবিতা হতে পারে না।

গদ্য নিরাবরণ হয়, কিন্তু নিরাভরণ হয় কি? অর্থাৎ রচনার আভরণ বলতে আমরা যা বুঝি, পরিষ্কার ভাষায় যাকে বলা হয় অলঙ্কার, এ না থাকলেও গদ্য হয় কি না? কোনো রকম বিশেষণ যোগ না করে, উপমা ব্যবহার না করে, গদ্যলেখা সম্ভব কি না? এবং চিন্তার শরীরস্থ প্রতিটি কোষের অথবা ধমনী-স্পন্দের সাক্ষাৎ পেতে হলে কোন রকম বঙ্কিম অথবা পরোক্ষ রীতির সাহায্য ব্যতিরেকে তা সম্ভব কিনা? শব্দের দ্বিতীয় হাত ছাড়াই প্রথম হাতেই কার্যোদ্ধার হয় কি না? এ-গুলো দেখতে হলে সেই একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয় অর্থাৎ যেখান থেকে প্রকৃত বাঙলা গদ্যের উৎপত্তি সেখান থেকে।—আমি বিশেষভাবে বাঙলা গদ্য সাহিত্যের কথা বলছি। সত্যিকার বাঙলা গদ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে তৈরী হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বিরচিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থের এক জায়গায় আমরা দেখি :

> দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবাল জল-সেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি অনুসূয়ে, কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন করিতে আসিয়াছি, এমন নয়, আমারও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে। ··· মহর্ষি অতি অবিবেচক ; এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন। অথবা যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবালযোগেও বিলক্ষণ শোভা পায়, যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্ক সম্পর্কেও সাতিশয় শোভমান হয় সেইরূপ, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী বল্কল পরিধান করিয়াও যারপর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন।

এখানে 'নবমালিকাকুসুমকোমলা' শব্দটি শকুন্তলার বিশেষণ হিসেবে প্রযুক্ত। কিন্তু ঐ শব্দটি একটি সন্ধিসমাসবদ্ধ পদ মাত্র নয়। শব্দটি একটি উপমাও বটে। শকুন্তলা কোমল। কিসের মত কোমল? কুসুমের মত কোমল। কি রকমের কুসুম? নবমালিকায় গ্রথিত থাকে যে কুসুম সেই

রকমের নতুন টাটকা অবাসী কুসুম। শেষের বাক্যগুলো বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। 'যেমন' শব্দ প্রয়োগ করে সেখানে উপমাকে অর্ধনগ্ন করে তোলা হয়েছে। যা হোক্ আমরা দেখতে পেলাম বাঙলা গদ্যের যাত্রা শুরু হল কাব্যরসভূঞ্জিত শব্দ দিয়ে এবং বিদ্যাসাগরের পরের বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রও ভাষাকে সংস্কৃতের গম্ভীর পদচারণা থেকে অব্যাহিত দিতে গিয়েও কাব্যের আবেগকে নিষ্কোষিত করতে পারলেন না ? তাঁর নিছক বর্ণনার মধ্যেও শিল্পের আঁচলে ফুটে উঠল কবিতার মুখ :

> রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাক্‌চিক্য —সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে ; মুদিতেছে ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে, তাঁহার পশ্চাতে আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে, তৎ-পশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। বাড়ীর চারিদিকে ঝাউগাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে।

এবং তারপর জন্ম হল গদ্যের মহত্তম সেই শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের যিনি বঙ্কিমকুসুম থেকে মধু পান করে শুরু করলেন তাঁরা নিজের গদ্য রচনা এবং তার মধ্যে দেখা গেলো অনেক বেশী কবিত্বের বেগ, গতি, পুষ্পনির্যাস এবং তাঁর গদ্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে সন্দেহ হতে থাকে আমরা কবিতা পড়ছি না গদ্য পড়ছি :

> আমি কে! আমি কেমন করিয়া খদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান, পরিবর্তমান স্বপ্ন-প্রবাহের মধ্য হইতে কোন মজ্জমানা কামনা-সুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, হে দিব্যরূপিনী, তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে, খর্জুর কুঞ্জের ছায়ার, কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে ; তোমাকে কোন্ বেদুঈন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জ্বলন্ত

বালুকা-রাশি পার হইয়া কোন রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল।

উল্লিখিত গদ্যস্তবকে ছন্দ, বিশেষণ, উপমা এবং উপমায় উজ্জীবিত চিত্রকল্প ও রোমান্টিক কবি-কল্পনা সব কিছুই কবিতার ভাবসম্পদ সৃষ্টি করেছে। খাঁটি গদ্য হিসেবে এটি গদ্য নয়—আবার এটাকে খাঁটি কবিতাও বলা চলে না। তবে এটা কি?

ফলত সমস্ত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির বিষয় যেন গল্পের যতটা তার চেয়ে বেশী কবিতার; আধা বাস্তব আধা স্বপ্নের জগৎ যখন গদ্যে দেখা দেয় তখন তা আর সম্পূর্ণ গদ্য থাকে না; তখন গদ্যের পেশীর তরঙ্গ মুছে গিয়ে তার উপর মসৃণ মেদের পেলবতা জেগে ওঠে। আর চিরকালের কবিতা তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে ভীষণ আমন্ত্রণ জানায় পাঠকের আবেগকে। পাঠকের কাছে, আবেগের অসহায় শিকার যারা, সেই জন্যে সেই গদ্য পছন্দ যার মধ্যে আছে কবিতার লাবণিমা। এবং রবীন্দ্রনাথ যে অনুভূতির রাজ্যে তোলপাড় জাগিয়ে দেন তারও কারণ আবেগের পুরুষ-ক্ষুধার সামনে তিনি ঐ গদ্য লেখাতেও এগিয়ে দিয়েছেন কবিতা নামক রূপসী নারী যুবতীকে।

তাহ'লে কোন চিহ্নিত রেখায় আমরা গদ্যকে গদ্য কবিতা থেকে বিযুক্ত করব? 'মঘনাদবধ' মহাকাব্যটিকে আমরা গদ্যে রূপান্তরিত করলে—তার অলঙ্কারাদি বাদ না দিয়ে,—সেটি কাব্য বলে গণ্য হবে কি না? নিশ্চয় কেউ সেটাকে কাব্য বলে স্বীকার করবেন না? কেন স্বীকার করবেন না তার উত্তর পেলে আমরা ঐ অদ্ভুত প্রশ্নের সমাধানের প্রথম সিঁড়ি অতিক্রমের উপায় পাব। উত্তরটা সম্ভবত এই হবে যে, আবেগসঙ্কুল ছন্দের জন্য ওর যে উপাদান, ওর যে বিষয়, সেটা কাব্য নয়, সেটা কাহিনী মাত্র—কিন্তু ঐ কাহিনীর করুণাঘন বিষয়ের স্পর্শে সত্যের প্রতি উদ্বাহু ক্রন্দসী আত্মার আবেগে ছন্দে আত্মপ্রকাশই কবিতা। গদ্য যদি শুধু কাহিনী না হয়ে অনুভূতির গভীর স্তর থেকে উঠে আসা সংক্রমিত চেতনার উদ্ধার হয়, আবেগের মন্দ্রিত আত্মার স্পন্দন হয়, তখন তা গদ্য হয়েও কবিতা হতে পারে। তখন তার আকৃতি গদ্যের হলেও তার সত্তা হবে কবিতার। তখন সে দেখতে মানুষের মত হলেও ব্যবহার করবে মানুষীর মত।

বস্তুতু একটা অনুভূতির কাণ্ড জড়িয়ে কবিতা গড়ে ওঠে লতার মত চতুর্দিকে ফুলের কামনা ছড়িয়ে। ঐ অনুভূতিটা যদি গদ্যের হয় তাহলে কবিতা তাকে বুকে ধরে পল্লবিত হতে পারবে না, পাতা গজাবার আগে সে যাবে শুকিয়ে। আর অনুভূতি যদি কবিতার হয় তাহ'লে সে যে কোন আধারে অবস্থান করে খদ্যোতের মত আলো ছড়াবে। কিন্তু এত কিছু বলার পরেও বলতে হয় যে কবিতার পক্ষে গদ্যের আধারটা সবচেয়ে কৃত্রিম, খানিকটা নারী অভিনেত্রীর অভাবে রমণীসদৃশ পুরুষের গোঁফ কামিয়ে প্রসাধন দিয়ে রমণী সাজানো। কেন ? কবিতায় যেমন ছন্দ আছে সুর আছে গদ্যেও তেমনি ছন্দ আছে সুর আছে—যদিও কবিতার সুর ও ছন্দ গদ্যের সুর ও ছন্দের সমার্থক নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সিকান্দার (আলেকজান্ডার) যখন বলেন ঃ

> বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস। দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় ; রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণমেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য সৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে—আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। এর তুষার মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এর বিরাট নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হয়ে ছুটেছে, এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের ন্যায় তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

তখন এই প্রাকৃতিক বর্ণনায় যে শব্দ ঝঙ্কার এবং যে ছন্দ দুলে ওঠে সেটাকে কবিতা ছন্দ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবাই অসম্ভব। কেন অসম্ভব সেটা আমরা পাশাপাশি একটা গদ্য কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতার একটি স্তবক এমনি :

> অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
> গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যান-নিমগ্না পৃথিবী,
> নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
> অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা !

একদিকে আপক্ব ধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাত-সূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশির-বিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে ;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত' ।
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপান্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখীর মতো তোমার ঝড়—
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর ফোলা সিংহ ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উপুড় হয়ে
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদি ডাকাতের মতো।

লক্ষণীয় যে এটাও সেই প্রাকৃতিক বর্ণনা—গভীর ভাবোদ্দীপক হলেও। এবং পদ্যছন্দের মত এটাকে যদি না ভাঙা হত তাহ'লে এর আকৃতিটা ঐ গদ্যেরই মত দেখাত। পংক্তিগুলো এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে দেওয়ার কারণ এটাকে কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা। উপরের উদ্ধৃত গদ্যটিকেও এমনিভাবে ছন্দে ছন্দে ভেঙ দেওয়া যায়। যেমন :

বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস।
দিনে প্রচন্ড সূর্য
এর গাঢ় নীল আকাশ
পুড়িয়ে দিয়ে যায়;
রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে
তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়
স্নান করিয়ে দেয়।
তামসী রাত্রে
অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জে

যখন এর আকাশ ঝলমল করে
আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

কিন্তু আরও সুবিধা হয় যদি আমরা রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি গদ্য রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে সেটিকে ছন্দে ভেঙে দেখাই। লিপিকার 'মেঘদূত' প্রবন্ধের শেষের বাক্যগুলি এমনি :

> প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ বেজে ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির' পরে তুলে দিক তার বনান্তের রঙটির মতো রঙিন তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুল মালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।
>
> যখন ঝিল্লীর ঝঙ্কারে বেনুবনের অন্ধকার থরথর করছে, বাদল হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিভে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক ভিজে ঘাসের গন্ধে-ভরা বনপথ দিয়ে আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথ রাত্রে।

যে-কোন কাব্যরসিক এর কাব্যগুণ সম্পর্কে মুহূর্তেই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। তবু এটাকে কবিতার ছন্দে ভাগ করে দেখা যাক :

প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয়—
তাই—
হঠাৎ বেজে ওঠা বীণার তারের মত
চকিত হয়ে উঠুক।
সে আপন সিঁথিঁর 'পরে তুলে দিক
দূর বনান্তের রঙটির মতো—
রঙিন তার নীলাঞ্চল।
তার কালো চোখের চাহনিতে
মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি
আর্ত হয়ে উঠুক।

সার্থক হোক বকুল মালা
তার বেণীর বাঁকে বাঁকে
জড়িয়ে উঠে।
যখন ঝিল্লীর ঝংকারে
বেণুবনের অন্ধকার থর্‌থর্‌ করছে,
যখন বাদল হাওয়ায়
দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিভে গেল,
তখন সে তার অতি কাছের
ঐ সংসারটিকে ছেড়ে দিয়ে আসুক
ভিজে গাছের গন্ধে—
ভরা বনপথ দিয়ে
আমার নিভৃত হৃদয়ের
নিশীথ রাত্রে।

ঠিক একই উপায়ে রবীন্দ্রনাথের একটা গদ্য কবিতাকে গদ্যে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন:

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা
ভাবিনি সম্ভব হবে কোন দিনা॥
আগে ওকে বার বার দেখেছি
লাল রঙের শাড়িতে—
ডালিম ফুলের মত রাঙা;
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলন-চাঁপার মতো চিকন গৌর মুখখানি ঘিরে।

'হঠাৎ দেখা' কবিতার ঐ পংক্তিগুলির ভাঙা আকৃতিকে গদ্যের পংক্তিতে অতি সহজেই সাজানো যায়:

রেল গাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোন দিন। আগে ওকে বারবার দেখেছি লাল রঙের শাড়িতে—ডালিমফুলের মতো

রাঙা ; আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়, আঁচল তুলেছে মাথায়—
দোলন-চাঁপার মতো চিকন গৌর মুখখানি ঘিরে।

এমনি অনেক উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে, আসলে যাকে আমরা ছন্দ বলি তা যে কোন সুশ্রাব্য সুন্দর সরস এবং উৎকৃষ্ট গদ্যের অঙ্গ। যে-গদ্যে ঐ ছন্দ থাকে না সে-গদ্য রসহীন মাধুর্যহীন। তাহলে কি, আমাদের ধরে নিতে হবে গদ্য এবং কবিতার মধ্যে কোন তফাৎ নেই ?

বিশদ পুনরাবৃত্তি : রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

> গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা।---পরীক্ষা করেছি লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে।—গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' থেকে ইতিপূর্বে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি 'লিপি-কা'র অল্প কয়েকটি লেখার অন্যতম লেখা সেটি। কিন্তু ঐ কাব্যগুণ ঐ ছন্দ, ঐ সুর একমাত্র 'লিপিকা'র গদ্যেই আছে নাকি ? দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐ উদ্ধৃতিতে নেই, রবীন্দ্রনাথের বহু গদ্য রচনায় নেই ? বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে নেই ? নেই কি শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের গদ্য লেখায় ? বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের একটি নমুনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাঙলা সাহিত্যের আরও কয়েকজন শক্তিমান গদ্য লেখকের রচনার অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

গদ্য : শরৎচন্দ্র

> আজ আমার জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া তাহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া শৈশবের কত কথাই না মনে পড়িতেছে।

গদ্য : নজরুল

আজও লিখছি বন্ধুর ছাদে ব'সে। সব্বাই ঘুমিয়ে। তুমি ঘুমুচ্ছ প্রিয়ার বাহু-বন্ধনে। আরো কেউ হয়ত ঘুমুচ্ছে একা শূন্য ঘরে—কে-যেন সে আমার দূরের বন্ধু—তার সুন্দর মুখে নিবু-নিবু প্রদীপের ম্লান রেখা পড়ে তাকে আরো সুন্দর, আরো করুণ করে তুলেছে ; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে-তালে তার হৃদয়ের ওঠা-পড়া যেন আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। —তার বাম পাশের বাতায়ন দিয়ে একটি তারা হয়ত চেয়ে আছে—গভীর রাতে মুয়াজ্জিনের আজানে আর কোকিলের ঘুম জড়ানো সুরে মিলে তার স্তব করছে— —"ওগো সুন্দর ! জাগো ! জাগো ! জাগো !"

[কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠি থেকে]

গদ্য : অবনীন্দ্রনাথ

ভক্ত খুঁজছেন ভক্তিকে, শাক্ত খুঁজছেন শক্তিকে আর নর খোঁজে গাড়ি-জুড়ি, বি·এ পাশের পরেই বিয়েতে সোনার ঘড়ি এবং তার কিছু পরেই চাকরি এবং এমন সুন্দর একটা বাসাবাড়ি যেখানে সব জিনিষ সুন্দর করে উপভোগ করা যায়। হা-হুতাশ কচ্ছেন কবি কল্পনা-লক্ষ্মীর জন্যে এবং ছবি লিখিয়ের হা-হুতাশ হচ্ছে কলা-লক্ষ্মীর জন্যে, ধরতে গেলে সব হা-হুতাশ যা চাই সেটা সুন্দরভাবে পাই এইজন্যে, অসুন্দরের জন্যে একেবারেই নয়।

[সৌন্দর্যের সন্ধান : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী]

গদ্য : প্রমথনাথ

যখনই বলি এ বস্তু সুন্দর তখনই এ কথাটি ঊহ্য রয়ে যায় যে, তা সকলের কাছেই সুন্দর। ইউনিভার্সাল ভ্যালিডিটি অবশ্য দর্শনের বিষয়। সুতরাং আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যতই অদার্শনিক কথা বলি না কেন, একটা না একটা ফিলসফি তার মধ্যে থেকে উঁকি মারবে। আর সে ফিলসফি যে কত কাঁচা অথবা পচা, তা ধরা পড়বে আপনাদের দার্শনিক চূড়ামণি প্রেসিডেন্টের কাছে। অথচ কি করা যায় ? কাব্য ম্যাজিক হতে পারে কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।

গদ্য : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কুসংস্কার ছেড়ে শুনলে আমাদের কান ওই লাইনটার মধ্যে একটা অদৃশ্য ছন্দের ঝঙ্কার ধরতে পারবে। কিন্তু সেই গূঢ় শৃংখলার মূলে কোনও রহস্য নেই ; কোন উপমা আর ভাবের বৈকল্পিক বিন্যাসেই সেই প্রতিসাম্য সুগঠিত। তুলাদণ্ডের একদিকে সন্ধ্যা যেমনই রজনী-গন্ধার ভারে নুয়ে পড়ে অমনি ভোর বেলাকার কনক চাঁপা ফুটে উঠে তার প্রতিপক্ষে দাঁড়ায়। আমাদের সংশয় যেই শুধায় 'জাগল কে' ? তখনই অর্ঘে আর আরাত্রিকে তার প্রশ্ন যায় হারিয়ে।

[কাব্যের মুক্তি : স্বগত]

গদ্য : বুদ্ধদেব বসু

কবি—তিনি কখনো অবিকল সামাজিক বা স্বভাবী মানুষ হতে পারেন না—তাঁকে হতে হবে কোন-না-কোন দিক থেক অভাবগ্রস্থ, যে অভাবের ক্ষতিপূরণ করে 'দৈব' অথবা অবচেতনের ক্ষমতা। এই কথাটা আধুনিক মানুষের, আর এই কথাই চিরকালীন।

[কালিদাসের মেঘদূত : পৃ: ২০]

গদ্য : এয়াকুব আলী চৌধুরী

ব্যথা তৃষ্ণা ভয় ভক্তি বিস্ময় ও আনন্দ যখন ভিতরে তীক্ষ্ম তীব্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, বাহির তখন তাহার আবেগে কম্পিত হয়—মানুষের সর্বাঙ্গে তাহার ক্রিয়া ফুটিয়া উঠে। ফল যখন ভিতরে রসে গন্ধে পূর্ণ হয় তখন সর্বাঙ্গ দিয়া পাকিয়া উঠে, বিনা বাতাসে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। তাম্রতারের অভ্যন্তরে যখন তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিতে থাকে তখন সমস্ত তার থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলির প্রতিটি গদ্যই ছন্দময়। এই ছন্দ 'ছন্দ' হয়ে ওঠার কারণ অর্থের সংগে আবেগের আশ্লেষ। যেখানে আবেগ কৃত্রিম সেখানে ছন্দও কৃত্রিম। যদি মনে করা যায় গদ্য প্রধানত বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং অর্থ প্রকাশের দ্বারা আপনার দায়িত্ব পালন করে ; তাহলে বুঝতে হবে

সে গদ্যের সংগে আর্টের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ যে গদ্যে আর্ট নেই তাকে ভালো গদ্য হিসেবে মেনে নিতে আমাদের বাধে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন আসে, গদ্যের সঙ্গে কবিতার তাহ'লে পার্থক্য কি? গদ্যে ছন্দ আছে বলে কি সকল গদ্য রচনাই গদ্য কবিতা? নিশ্চয় নয়। ছোটগল্প যেমন এই জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে কোনো একটি চিহ্নিত অবিস্মরণীয় বিশেষ ঘটনার প্রতিচিত্রন অথবা প্রতিবিম্বন, সেই একটিমাত্র শিশিরবিন্দুতে একটি সূর্যের অবগাহনকে একটি কবিতার বিষয় বলেও ভাবা যায়। ক্ষুদ্র কবিতার বেলায়, সনেট কিম্বা গীতি-কবিতার বেলায় ঐ একটি মাত্র স্বয়ম্ভু ক্ষণিক চেতনায় ভাবনা অথবা কল্পনার কথা খাটলেও মহাকাব্যের বেলায় তা খাটে না। কিন্তু মহাকাব্যের ভাষা গদ্যের ভাষা নয়। আর ছন্দময় গদ্যভাষাকে কবিতার ভাষা মনে করলে উপন্যাসও প্রায় মহাকাব্যের সংগে তুলনীয়। কেননা সেখানে বহু ঘটনার বিমিশ্রণে তার জগৎরূপের উৎপত্তি। কিন্তু যেমন উপন্যাস মহাকাব্য নয়, তেমনি মহাকাব্য নয় উপন্যাস। যদিও মহাকাব্যের কাহিনীটাকে গদ্যে প্রকাশ করা সম্ভব তবু ইলিয়াড আর ওডিসির গদ্য অনুবাদগুলো কবিতা নিশ্চয় নয়। গদ্য হয়ে গেলে তা যখন আর কবিতা থাকেনা তখন গদ্যের ভাষাকে কবিতার ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কি করে? বলা আবশ্যক, গদ্যের আর পদ্যের ছন্দ ও সুর দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। আর কাব্যিক গুণসম্পন্ন যে গদ্যের কথা আমরা প্রায়শই বলি আসলে তা সমস্ত সৎগদ্যেরই আত্মা।

উপরের ঐ পূর্ণচ্ছেদের পরে আরও কিছু বলার অবসর না থাকাই স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু ঐ পূর্ণচ্ছেদের আগের বাক্যগুলিকে সমাপ্তির শেষ ঘন্টা বলে আমি মনে করতে পারিনি কতকগুলো অনিবার্য সম্ভাব্য প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। এ প্রবন্ধে পাশাপাশি প্রমাণ দেখানোর জন্যে দ্বিজেন্দ্রলালের যে গদ্যের এবং রবীন্দ্রনাথের যে গদ্য কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছি আসলে তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় সেটা দেখানো হয়নি। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য নিছক বর্ণনা, রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার অংশটুকু শুধু বর্ণনা নয়—ভাবনা। জীবনের কোনো একটা গূঢ় সত্যকে, যা কবির উপলব্ধির অন্তরালে লুকিয়েছিল, তাকে প্রকাশ করার জন্য শুধু ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগবে ঐ ভাষা গদ্যের না

কবিতার ? রবীন্দ্রনাথের "মেঘদূত" প্রবন্ধের যে অংশটুকু উপরে উদ্ধার করে দেখিয়েছি তার ভাষাটা গদ্যের কিন্তু তার ভাবনাটা কবিতার। মনে রাখা উচিৎ যে গদ্যকে কবিতার মত ভেঙে সাজালেই সে কবিতা হয় না। আমার ধারণা কবিতার ভাবনার সংগে কবিতার ভাষার মিলনেই সত্যিকার কবিতার সৃষ্টি হয়। কবিতার ভাষায় আর গদ্যের ভাষায় সব চেয়ে বড় পার্থক্য শব্দের স্থায়িত্ব। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দটি চিরকালের বিমূর্তের ইঙ্গিত বাহক শব্দের, গদ্যে ব্যবহৃত শব্দটি ক্ষণিকের ; কবিতায় ব্যবহৃত শব্দটি অমর, গদ্যে ব্যবহৃত শব্দটি মর ; কবিতার শব্দটি বদলালে তার ভাবনাটি, তার ছন্দ, তার সুর এবং তার আঙ্গিক বদলে যায়, গদ্যের শব্দটি বদল করলে তার ছন্দ, সুর ভাবনা আঙ্গিক কিছুটা অবিকৃত রাখা যেতে পারে। অন্তত কবিতার মত তার অস্তিত্ব শুধু বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না তার একটি শব্দ পরিবর্তনে। শুধু মাত্র এই কারণেই কোনো গদ্য কবিতাকে কবিতা বলা যায় না তাকে বলা যায় ভাবোদ্দীপক গদ্য।

বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে আমি বোদলেয়ারের একটি গদ্য-কবিতা তুলে দিয়ে সেটাকে 'মহৎ কবিতা' বলেছি। এবং তাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছি, "কবিতাটি আমাদের মহত্তম কতকগুলো ভাবনায় জাগিয়ে তুললেও যে-অর্থকে সে প্রকাশ করতে চায় তা খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত নয়।" তার মানে কবিতার অস্পষ্টতার গুণ আছে বলেই ঐ গদ্যাংশটিকে আমরা কবিতা বলি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে অস্পষ্টতা কবিতার একটি মাত্র গুণ সমস্ত গুণ নয়। আর গদ্যের স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার ছাঁদে সাজানো হয় বলেই অস্পষ্টতায় কাব্যব্যঞ্জনার রহস্য থাকে না। ঠিক এইখানে এসে প্রথমে কবিতার সুরের কথা ভাবতে হবে এবং ভাবতে হবে গানের সুরের কথা। মনে রাখতে হবে সুরের মধ্যে একটি বাক্যহীন লোকের অন্ধকারের দ্যোতনা আছে। একাকী সুরের ঐ স্পন্দন আমাদের আত্মার গুহায় লুকিয়ে থাকা অনেক অজানা ফুলের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। অব্যক্ত সেই তন্ময় জগতের ঘুম ভাঙানোর ক্ষমতা থাকে বলে ভাবার্থে গভীর না হয়েও কবিতা তার ছন্দবীণায় আমাদের আনন্দ জোগায়। গদ্যের ভাষার কিন্তু এককভাবে ঐ গুণটি নেই। ঐ গুণটি না থাকার জন্যে একটি শ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতার সংগে শ্রেষ্ঠ কবিতার পার্থক্য অনেক। এবং যথার্থ অর্থে ঐ পার্থক্য রচনা করে সংগীতের দুর্নিরীক্ষ্য শরীর। এখন অবশ্য আর একটি

কথা তোলা যেতে পারে। ঐ সংগীত গদ্যে প্রবিষ্ট করানো যায় কিনা। বলা বাহুল্য কোরানের গদ্যে ঐ সংগীত আছে, ঐ সুর আছে, আছে কবিতার সেই আধ্যাত্মিক দ্যোতনা, সেই অন্ধকার অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা—কোনো অর্থকে না জানিয়ে যে মনকে বাইরের আলো থেকে গুটিয়ে তন্ময় অন্ধকারের আকাশে পেঁৗছে দেয়—যেখানে আছে অসংখ্য তারার হিরন্ময় দ্যুতি।

কোরানের এই গদ্যকে তাই কি গদ্য-কবিতা বলা যাবে ? মনে রাখতে হবে বাইরে থেকে আমরা যাকে গদ্য-কবিতা বলি তা কবিতারই আধুনিকতম একটি আঙ্গিক মাত্র। কবিতাকে, অথবা বলা যেতে পারে কবিতার আত্মাকে, গদ্যের আকৃতির মধ্যে পরিবেশন করা হয় বলেই তাকে আমরা গদ্য-কবিতা বলি। কথাটাকে আরও স্বচ্ছ করা যাক। গদ্য-কবিতা শুধু মাত্র গদ্য নয়। প্রথমে সে কবিতা তারপর সে গদ্য-কবিতা। এইখানেই একটি সহজ বিবাদ চোখে ধরা পড়ে। ভাব আর ভাষা মিলে যেমন কবিতা, ভাব ভাষা মিলে তেমনি গদ্য। ভাব ছাড়া যেমন কবিতা হয় না তেমনি ভাব ছাড়া গদ্য হয় না। বাকী থাকে ভাষা। আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি যে গদ্যের ভাষা আর কবিতার ভাষা ঠিক এক নয়। যদিও আমরা লক্ষ্য করি যে গদ্যের মধ্যে উপমা থাকে, বক্রোক্তি থাকে, অনুপ্রাস থাকে এবং মাধুর্য উদগারের জন্যে থাকে ধ্বনির সমতাল, তবু গদ্যের ভাষা শেষ অবধি কবিতার ভাষা নয়। পুরোপুরি কবিতার ভাষা নয় বলেই গদ্য কবিতাকে কেউ শুধুমাত্র 'কবিতা' বলে না। এবং ঐ কাব্যিক গুণের দরুণ কোরানকে এক ধরনের গদ্য-কবিতা বললে সেটা বোধহয় গদ্য কবিতার সূত্রানুযায়ী নির্ভুলই হবে। নির্ভুল হবে এই জন্যে যে কোরানের গদ্যে শুধু কবিতার ছন্দ অথবা ছন্দস্পন্দের মিলই নেই আছে কবিতার ভাষার মত আলোছায়ার অন্ধকার সৌন্দর্য— তার স্থূল বাচ্যার্থের তলায় অলক্ষ্য আলোর যে দুর্দান্ত ইশারা আছে তা যে-কোন মহৎ কাব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নিঃসন্দেহে।

আরো একটা কথা। কোরানকে সুর করে পড়া যায়। যেমন ছন্দস্পন্দিত সমিল কবিতাকে সুর দিয়ে গাওয়া যায়। কিন্তু কোরানকে সুর দিয়ে পড়া গেলেও সুর করে গাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' ও 'তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিখা'কে সুর দিয়ে যে-

ভাবে গাওয়া হয় অথবা নজরুলের 'বিদ্রোহী' কিংবা সুকান্তের 'রানার' কবিতাকে যে-ভাবে সুর দিয়ে গাওয়া হয় ঐ রকমভাবে কোরানকে গান করা যাবে না। আর গাইলে সেটা হবে পরচুলা লাগিয়ে নারী তৈরীর চেষ্টার মত অপপ্রয়াস।

এটা ঠিক, ছন্দ-স্পন্দিত মাইকেলী অক্ষরবৃত্ত হচ্ছে সেই কবিতা যার মধ্যে সংগীত থাকলেও তা গানের উপযুক্ত নয়. তার মধ্যে গান আছে কিন্তু গীতলতা নেই। বলা যাক : সেটা মিউজিকাল কিন্তু মিউজিক নয়। ঐ রকম কোরানও মিউজিকাল কিন্তু মিউজিক নয়। এবং এইভাবে বলা যাক কাব্যিক গদ্যও মিউজিক্যাল।

বস্তুত সূক্ষ্মভাবে যে পার্থক্য গীতি-কবিতার সঙ্গে গানের ; সেই একই পার্থক্য গদ্য-কবিতার সঙ্গে কবিতার এবং গদ্যের সঙ্গে গদ্য-কবিতার। এই পার্থক্য জানা থাকলে গদ্য-কবিতাকে যেমন কেউ সত্যিকার কবিতা বলবে না, তেমনি গদ্যকে বলবে না গদ্য-কবিতা। অথবা শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াবে এমনি যে, গদ্য-কবিতা আসলে একটি মনগড়া শব্দ আসলে তা শুধু গদ্যই—কবিতা আদৌ নয় ; যেমন গীতি-কবিতা নয় আসলে গান।

কুহেলী কালের কবিতা

সাহসী সত্তা ব'লে এ কালের কবিদের মধ্যে কিছু নেই তার মানসিকতায় এমন জটিল রোগ বাসা বেঁধেছে যার নিষ্ক্রমণের পথ প্রায় অবরুদ্ধ। রোগ কেবল ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের সামান্যতম প্রত্যাশা বিরলদৃষ্ট।

এর কারণ সাহিত্যরাজ্যে নেই ; এর কারণ প্রকৃতিতে, পৃথিবীতে। সুস্থ ব'লে নিজেকে ভাবতে গেলে যে অবস্থার মধ্যে বাঁচতে হয় সেই অবস্থারই দারুণ পরিবর্তন ব্যাধিকে সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

এ-জন্যে আমরা ব্যক্তি কবিকে দায়ী করতে পারি না। কেননা ঐ অবস্থার মস্ত বড়শীতে আটকে সুতোর পরিমাপে তাকে খেলা করতে হয়। সেই মাপের বাইরে যাওয়ার যেমন তার ক্ষমতা নেই তেমনি তাকে ছিঁড়ে বেরুবার মত ভীষণ বল থেকে সে বঞ্চিত।

অপরিচয়ের জন্য মানুষের কাছে পৃথিবীটা আগে যত বড় ছিল এখন তা নেই, কালটাও মানুষের কাছে ছোট হয়ে এসেছে। কালের কথা ইতিহাস যখন থেকে তার ঝাঁপিতে পুরতে শুরু করেছে তখন থেকেই মানুষের জীবনের অনেক রহস্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতীতকে দেখে এবং অতীতের ভবিষ্যত অতীতকে দেখে মানুষের যে অভিজ্ঞতা তা দিয়ে পরিণত মানুষ স্বপ্নের কথা ভাবতে গেলে ঠোক্কর খায়। কোন সফলতাময়, সম্ভাবনাময় এবং আশাময় সম্ভাবনার কথা সে কল্পনা করতে পারে না।

এরই সংগে বিধাতা সম্বন্ধে একটি আস্থা-অনাস্থার প্রশ্ন আছে। অতীতে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করত, ধর্ম বিশ্বাস করত, বিধাতাকে বিশ্বাস করত। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাসের সেই দেয়ালে ভীষণভাবে চিড় ধরতে শুরু করেছে।

এই আস্থাহীনতার কারণ কি মানুষ সুচতুর হয়েছে বলে ? মানুষের অন্তর্দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়েছে তাই ? মানুষের চৈতন্য সুতীক্ষ্ম হয়েছে

সেই জন্যে ? অথবা সভ্যতার অগ্রগতিতে তার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সীমা বিস্তীর্ণ হয়েছে সেই কারণে ?

পৃথিবীতে মানুষের সংসারে অভাব জিনিষটা চিরদিনের। সংসারে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, উৎপীড়ন, অনাচার, বিদ্বেষ, হিংসা চিরদিনের—এবং পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, শঠতা এবং পাশবিকতা সবই। কিন্তু এসব কি মানুষের মূল লক্ষ্যকে আড়াল করতে পেরেছে কখনো ? কিন্তু একদিন মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

মানুষ পরাশ্রয়ী জীব, এবং স্বার্থপর। সে স্বার্থ কখনো ব্যক্তির, কখনো পরিবারের, কখনো জাতির এবং কখনো দেশের। এই স্বার্থপরতাকে ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বে ওঠা মানুষের পক্ষে প্রায় সম্ভব হয় না। প্রশ্ন হবে মানুষ কেন স্বার্থপর হয় ? নিজেকে বাঁচাতে গিয়েই মানুষ স্বার্থপর হয় এবং ঐ কারণে দেশ, জাতি এবং ধর্মের জন্য মানুষ স্বার্থপর হয়। এই স্বার্থকে ছেড়ে মানুষের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভবপর নয়। কারণ মানবিক বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে আত্মোৎসর্গ করলে মানুষকে অন্যের স্বার্থে আত্মাহুতি দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একদিন ভারতীয় বৌদ্ধরা এ-কারণেই হিন্দুদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। বাঁচার স্বার্থ বুঝলে তাদের এমন পরি-ণতি ঘটত না।

বাঁচার, এবং সুন্দর হয়ে বাঁচার, জন্যে মানুষের স্বার্থবোধ একালে এসে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। অন্যকে বাঁচাবার চেয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা এখন অধিকতর। এরই সংগে বলতে হয় মানুষের সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ এবং সূচীবোধ যত বেড়েছে তত বেড়েছে তার মনের লোভ। বললে অন্যায় হবে না যে এ-কালের মানুষের লোভ দিগন্তস্পর্শী।

এই ভীষণ বিস্তীর্ণ লোভের মাঝখানে শক্তিহীনের অবস্থা মর্মান্তিক। এবং হৃদয়বান যাঁরা তাঁরা সেই ক্ষমতাহীনদের বিলাপে দিশাহারা। দিশাহারা কেননা তাঁরা অতিমানুষের শক্তিতে বলীয়ান নন এবং প্রতিরোধের পথ তাঁদের ঘনকণ্টকাকীর্ণ।

তাই শুধু ক্রন্দন দেখি। একালের সাহিত্যে তাই হাসির চেয়ে কান্নাটা বেশী, আশার চেয়ে হতাশা বেশী, আনন্দের চেয়ে দুঃখ অনেক। কোথাও

সে কান্না চাপা, কোথাও তা শব্দময় অন্তর্ভেদী, কোথাও মলিন গণ্ডের উপরে অশ্রুরেখা।

এ ক্রন্দন অসহায়ের নিঃসন্দেহে ; কিন্তু যে অসহায়ের বিধাতা আছে তার নয়। কারণ বিধাতায় বিশ্বাসীর ক্রন্দন ত ক্রন্দন নয়।

রবীন্দ্র-সংগীতে আছে :

দিনের আলোর আড়াল টানি
কোথায় গেলে নাহি জানি
অস্তরবির তোরণ পরে
চরণ বাড়ালে
আমার রাতের আঁধারে ॥

দুঃখের মুহূর্তে তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাসী মন বাঞ্ছিতের সাক্ষাৎ পেল অতএব তাঁর দুঃখ তীব্র হওয়ার সময় পেল না। অপ্রাসংগিক হবে না যদি আমরা এইখানে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিই।

শিল্পীর দুঃখ-বোধটা কেমন ? নিশ্চয়ই যে-কোন রকমের অভাবই দুঃখের জন্মদাতা। শিল্পীর সে অভাবটা কি ? রবীন্দ্রনাথের ত অর্থাভাব ছিল না কিন্তু তাঁর মানসভূমি কি নিষ্কণ্টক ছিল ? অর্থাৎ আমাদের ধরে নিতে হয় মানুষ মাত্রই কোন না কোন অভাব দ্বারা পীড়িত। এবং একজন শিল্পীর জীবনে দুঃখবোধের জন্যে যে-কোন একটি অভাবই যথেষ্ট।

তাই যদি হয়, দুঃখ যদি মানুষের জীবনের চিরকালের সত্য বলে স্বীকৃতি পায় তবে বিগত কালের কবির সংগে এ-কালের কবির পার্থক্য কোনখানে ? উভয়ের দুঃখ কি সমার্থক ? যে-কবি লিখেছিলেন : We look before and after/and pine for what is not—তাঁর উপলব্ধিগত বেদনা আর আজকের যুগের কবির অনুভূতিলব্ধ বেদনা কি দু'রকমের ?

আসলে আমাদের দেখা উচিৎ দুঃখের উৎস কোনখানে ? সে কি মানুষেরই হৃদয়ে অথবা তা ঐ দৃশ্যমান প্রকৃতিতে, পৃথিবীতে, মনুষ্য-সৃষ্টি সমাজে ? যদি তা প্রকৃতপক্ষে হৃদয় কিংবা মনই হয় তাহলে তার জন্যে সমাজকে বেশী দায়ী করা যায় না ? সমাজের হস্তক্ষেপ ছাড়াই মানুষের মন

আপনা আপনি সমস্যার সৃষ্টি করে ; হয়ত সৃষ্টি করবার তাগিদে নিশ্চিত নিদ্রালু হৃদয়ে দুঃখব্যাধির চারা রোপণ করে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির নায়ক মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করল কেন ? প্রত্যক্ষে ত তার কোন অসুখ ছিল না ? তার ত

বধূ শুয়েছিল পাশে— শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—

সে ত

কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;

এবং তার

হাড়হাভাতের ব্যথা বেদনার শীতে
এ জীবন কোনদিন কেঁপে ওঠে নাই ;

তবু—'জ্যোৎস্নায়' সে 'দেখিল কোন ভূত ?' সম্পূর্ণ নিরভাব এই লোকটি মৃত্যুর ইশারায় নড়ে উঠল কেন ? তাহলে কি কবির কথাই সত্য

'নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে।' ?

আসলে আমরা জানিনা এমনই কিছু কি আমাদের দুঃখের কারণ ? দস্তয়েভস্কির Insulted and the injured এর নায়িকা নাতাশার কথা 'ওহ্, কেন আমরা সকলেই সুখী হতে পারি না !' কি একই কারণের অন্তর্গত ?

অর্থাৎ সাধারণভাবে যে দুঃখটাকে আমরা আধুনিক মানুষের দুঃখ বলি আসলে তেমন দুঃখ বলে পৃথিবীতে কখনো কিছু নেই? তাহলে রোগের, দারিদ্র্যের, অবমাননার এবং উৎপীড়নের কথা শিল্পের কুহেলীর মধ্যে জোয়ারের নদীর মত অতন্দ্র হল কেন?

এখন আমরা কি বলতে পারি দুঃখকে গভীর করবার জন্যে আমরা যে তীব্র শব্দ ব্যবহার করেছি সেটা নিছক বাহুল্য নয়। সংশয়, শঙ্কা, সমস্যা মানুষের জীবনের তিনকালের বাঁধাধরা নিয়ম। মর্মান্তিক সমস্যাগুলোকে উৎপাটিত করবার জন্য পৃথিবীতে বারবার মহাপুরুষেরা এসেছেন এবং তাঁরাই হয়ত অন্য মানুষের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করে চলে গেছেন। আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন নিশ্ছিদ্র সমাধানের জন্ম হয়নি। মানুষের জীবনে গৃহ-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, যৌন-সমস্যা, অন্ন সমস্যার মোকাবেলার সাথে সাথে, গোষ্ঠী-সমস্যা, ধর্ম-সমস্যা এবং জাতি-সমস্যা দেখা দিয়েছে। মানুষের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে এবং জীবন-ধারণ এবং জীবন-রক্ষার সমস্যা বিশাল থেকে বিশালতম রূপ ধারণ করেছে।

এসব নানা অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে শিল্পী যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন তার মাথার উপরে কুয়াশাময় রাত্রির আকাশ আর তার চারপাশে আকাশ-স্পর্শী দেয়াল। সঙ্কটময় অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি? সেই উপায় অন্বেষণে আজকের শিল্পী-সাহিত্যিকেরা দিশাহীন।

আধুনিক সাহিত্যকে অনুধাবন করতে গিয়ে আমাদের উপরোক্ত কথাগুলোকে বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আধুনিক সাহিত্যের সংগে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আধুনিক শিল্পের। প্রকৃতির অনুরূপ কোন বস্তুর নির্মাণকে আধুনিক শিল্পী শিল্প বলে না। শিল্পীর মানস-দর্পণে বস্তু যেভাবে যেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, প্রতিভাত হয় তাকে যথার্থ তেমনি-ভাবে নির্মাণই শিল্প। শিল্পীর মানসিক গঠন অনুযায়ী বস্তুরূপে আকৃতির রূপান্তর ঘটে। রোদের যে রঙ আমাদের সাদা চোখে দেখি, ত্রিকোণ কাঁচে তাকে দেখি অন্যভাবে, সেখানে রোদের একটি রঙ সাতটি রঙে রূপায়িত। আকাশের চাঁদটা হয়ত ঢেউ-ওঠা নদীতে একটি সোনার সিঁড়ি।

ফলতঃ আধুনিক শিল্প অথবা সাহিত্য বিচারে কতকগুলো মতবাদের কথা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। এই মতবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণায় আসতে পারি। মতবাদগুলি Futurism, Surrealism, Dadaism, Impressionism, Expressionism, এবং Existentialism. বস্তুবাদীদের সংগে মতানৈক্যে এইসব ism গুলোর উৎপত্তি। বস্তুবাদীদের বিশ্বাস বস্তুর স্থান প্রথমে তারপরে চেতনা। বস্তু ছাড়া চেতনার স্থান নেই। অতএব শিল্পীমানসের পিছনে ব্যক্তিসত্তার চেয়ে বস্তুসত্তাই বেশী রকম ক্রিয়াশীল। সাহিত্যে এই ধরনের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ নয়। কারণ মানসিকগঠন অনুযায়ী উপাদনের রূপ বদলায়। এবং এইজন্যেই শাহাদাৎ হোসেন তাজমহলকে যেভাবে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তেমন করে দেখেননি। মানসিক প্রবণতার এই আকৃতি অনুসারে ১৯০৯ সালে ইতালীয় কবি ফিলিপ্পো তোমমাসো মারিনেত্তি ফিউচারিজম উদ্ভাবন করেন। তিনি নিয়মানুগত শিল্পসৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে প্রচার করেন যে আধুনিক যান্ত্রিকতা ও বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আমাদের পূর্বেকার ভাবনাকে পাল্টে দিয়েছে। সুতরাং আগামীকালের সাহিত্য হবে শৃঙ্খলাহীন, ছন্দস্পন্দনহীন বাক্‌পঞ্জী। আগের কালের রোমান্টিকতা আবেগব্যাকুলতা এ-সবকে অস্বীকার করে এঁরা বললেন : আমরা চাঁদনী রাতকে বাতিল করব। এঁদরে কাছে শব্দের অর্থপ্রতীকের শৃঙ্খলমোচন ছিল বড় কথা।

এরপরে প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে জার্মানীতে এক্সপ্রেসানিজমের আবির্ভাব হয়। ফিউচারিজম থেকেই এর উৎপত্তি। ১৯১৪ সালে হেরমান বর নামক একজন অষ্ট্রিয়ান লেখক সাহিত্যে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। এই এক্সপ্রেসানিজম ইমপ্রেসনিজমেরই প্রতিক্রিয়ার ফল। ১৯০০ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ইমপ্রেসানিজমের প্রাধান্য দেখা যায় কাব্য সাহিত্যে। এ দলের কবিরা মনে করতেন : সুসংহত, সুবিহিত, সুপরিকল্পিত শব্দসমূহের সাহায্যে কল্পনাবাসী চিত্রকে যথাযথ ফুটিয়ে তোলা যায়। এবং এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভূত এক্সপ্রেসানিষ্টদের মতে বস্তুধর্ম ও যৌক্তিকতার বাঁধাগতের সাহায্যে আমাদের যে বিশ্বাস গড়ে উঠছে বস্তুর যথার্থ ভাবরূপ বা আইডিয়াকে তা ফুটিয়ে তুলতে পারে না। তাই এঁরা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সন্ধান করতে সচেষ্ট হোন। ফলে সাদা চোখে এঁদের ভাষা

প্রলাপোক্তির মত মনে হয়। কারণ এঁরা দেখলেন দৃশ্যমান বস্তু এবং মনোজ চেতনার সংগে কোন যৌক্তিক মিল নেই।

এক্সপ্রেসনিজম থেকে ডাডাইজম এবং ডাডাইজম থেকে সুররিয়ালিজমের জন্ম। ডাডাইষ্টদের মতে : দৃশ্যমান বস্তু, বস্তু-চৈতন্য ও তাকে প্রকাশ করবার জন্যে ভাব ও ভাষা এদের কারও সংগে কারও সম্পর্ক নেই। যুক্তি এখানে সম্পূর্ণ অর্থহীন। এঁরা বললেন, শিল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সংগে কোন রকম যোগাযোগ নেই। চিন্তা ও প্রকাশকে যা অভ্রান্ত ও অবশ্যম্ভাবী যুক্তিজালে বাঁধতে চায় তাকে এঁরা পরিহাস করে উড়িয়ে দিলেন। এই ডাডাবাদীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মতদ্বৈধ শুরু হয়। এবং এঁদেরই নতুন দলটি সুররিয়ালিজম অর্থাৎ অতিবাস্তববাদের স্রষ্টা। হার্বার্ট রীডের মতে এঁদের লক্ষ্য হল : বস্তু জগৎ ও মনোজগৎ, চেতনা ও অচেতন, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সীমাবন্ধনকে অস্বীকার করে এমন একটি Super-reality সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, চিন্তা ও কর্মসংবেগ— পরস্পরে একাত্ম হয়ে ওঠে।

মানুষের চেতনসত্তার অন্তরালে যে একটি অবচেতন সত্তা আছে সুররিয়ালিষ্টরা তারই প্রাধান্য দিলেন। তাঁরা বললেন বস্তুর প্রকৃত রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না বাস্তবগ্রাহ্য যুক্তি।

এর পরে এক্সিসটেনসিয়ালিজমের কথা। এটা খুব আধুনিক মত নয়। দিনেমার ধর্মশাস্ত্রবিদ কার্কগার্ড (১৮১৩—৫৫) সর্বপ্রথম এর দার্শনিক পটভূমি তৈরী করেন। দস্তয়েভস্কির সাহিত্যে এবং জার্মান ঔপন্যাসিক কাফকার গ্রন্থেও এর পরিচয় মেলে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই মতবাদ প্রথম ফরাসী দেশে এবং সমস্ত ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। জাঁ পল সাঁত্রে তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনকে সাহিত্যে প্রয়োগ করেন। একদল ঈশ্বরবাদী অন্যদল নিরীশ্বরবাদী। মোটের উপর অস্তিত্ববাদীর মূল কথা হল মানুষের আত্মার স্বাধীনতা। পরিবেশের চাপে পড়ে মানুষের সেই আত্মাটাই যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় ; তার ইচ্ছার অনুকূল স্রোতে গা ভাসাতে না পেরে বোধের, অনুভূতির, উপলব্ধির সংক্রমণে আত্মা তার নিরন্তর পীড়ন ভোগ করে। এই গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশের বাইরে গিয়েই মানুষ সত্যিকারভাবে নিজেকে

খুঁজে পায় ; সে তার আমিত্বকে প্রকাশ করে। এই আমিত্বে বিশ্বাসীরাই অস্তিত্ববাদী।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই চেতনা কি ? মানুষ পৃথিবীতে কি জন্যে এসেছে এবং কেন এসেছে ; মানুষ কোথা থেকে এসেছে কোথায় যাবে, পাপ কি পুণ্য কি এই সব জ্ঞানার্জনের দিন থেকেই মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে। বলতে গেলে ধর্ম মানুষ নিজেরই প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে এবং যে নিয়মের নিগড় আজ তার আত্মিক যন্ত্রণার কারণ তারও সৃষ্টি তার নিজেরই। মানুষের ভাগ্যে কেন এমনটি হল এই রহস্যময় প্রশ্ন মনীষীরা যুগে যুগে ভেবেছেন এবং আজকের মানুষের মনে সে ভাবনা সীমাহীন। যুগাতিক্রান্তে মানুষের সকল সমস্য জটিল থেকে জটিলতম পথে যতই এগিয়ে যাচ্ছে তার জিজ্ঞাসাগুলো ততই নিবিড়, কঠিন অভেদ্য জটাজুটে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কবিতা এই জটাচ্ছন্ন চিন্তাধারা, আপাতদৃষ্টিতে বড় সংগতি-হীন। সব কবিই মগ্ন ; আপনার চেতনায় অবচেতনায় মগ্ন। তাঁরা বলেন অগোচরীভুত মনের কথা, এবং যেমন বহু গ্রন্থিযুক্ত কালের ইতিহাসের সংগে সুপরিচিত, তার কথা। এবং এই কারণেই সাম্প্রতিক কবিতার যেটা আসল চরিত্র তা'হল প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসের অভাব, কোন সুঠাম পথ ধরে শান্তি অথবা সুখের উচ্চ অধিত্যকায় উপনীত হওয়ার বিশ্বাসের অভাব। তার কারণ অতীতের এবং বর্তমানের সমস্ত অভিজ্ঞতা তাদের বারবার শুধু এইটুকুই জানিয়েছে যে পৃথিবীতে আত্মার যন্ত্রণা যতটা সত্য, অলৌকিকে বিশ্বাসের আনন্দ ততটা মিথ্যা।

বাংলাদেশের কবিতাতেও এই অবিশ্বাস প্রকট। কেন এই অবিশ্বাস ? কেন এখনকার কবি লেখেন :

> যেহেতু উপায় নেই ফেরবার, আমার সম্মুখে
> দুটি পথ অবারিত, আমন্ত্রণে প্রকট চটুল—
> গলায় বিশ্বস্ত ক্ষুর কিংবা অলৌকিক বিশ্বাসের
> রাজ্যে শুধু অন্ধের স্বভাবে বিচরণ,— ?
>
> —শামসুর রাহমান

আমরা পাঠকেরা বলছি আশাবাদী হন আশাবাদী হন কিন্তু কবিরা, কোন কবিই তা হতে পারছেন না, হচ্ছেন না। লিখতে গেলেই তাঁরা লেখেন—

দ্রৌপদীর শাড়ীর মতন আয়ু বেড়ে চলে
অন্ধ চলে ব'য়ে যায় কাল
সময়ের দাঁতে উদ্ধন্ধনে আমি ঝুলে আছি
ঝুলে আছি আহা ঝুলে আছি।

—হাসান হাফিজুর রহমান

একি চেনা প্রবাহে গা ভাসান অথবা পৃথিবীব্যাপী সংক্রমিত আত্মার যন্ত্রণা থেকে উৎসৃষ্ট।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে আমাদের কবিরা যা লিখতেন অর্ধ-শতব্দী পরে তা আর চোখে পড়ে না। কবিদের এখন মাথা ভারী, পা ভারী, তারা সব অস্বচ্ছন্দ। সত্য বটে মধ্য উনবিংশ শতাব্দীর বোদলেয়ারের চিন্তাধারার সংগে আমাদের মধ্য বিংশ শতাব্দীর কোন কোন কবির মিল আছে। কিন্তু সে কি শুধু ব্যক্তির মানসিকতার সংগে ব্যক্তিমানসিকতার মিল ?

শামসুর রাহমানের একটি কবিতার একটি স্তবক এমনি :

রুটির দোকান ঘেঁষে তিনটি বালক সন্তর্পণে
দাঁড়ালো শীতের ভোরে, জড়োসড়ো। তিন জোড়া চোখ
বাদামী রুটির দীপ্তি নিলো মেখে গোপন ঈর্ষায়।
রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে তারা, তিনটি বালক
তৃষিত আত্মাকে সঁপে সংযত লোভের দোলনায়
অধিক ঘনিষ্ঠ হ'ল তন্দুরের তাপের আশায়।

[তিনটি বালক : রৌদ্র করোটিতে]

কবিতাটির সংগে র‍্যাঁবোর Les Effares (The Tranfixed) কবিতাটির মিল আছে।

Black in the snow and fog at the great lighted airshaft, their bums rounded,

On their knees, five little ones—what anguish ! Watch the baker making the heavy white bread.

They see the strong white arm that shapes the grey dough and sets it to bake in a bright hole.

They listen to the good bread cooking. The Baker with his fat smile hums and old tune.

They are huddled together, not one of them moves, in the waft of air from the red vent, warm as a breast.

এ সংগতির মানে কি ? এ ভাবনার উদ্বোধন ঘটিয়েছে যে সমাজ সেই সমাজ নয় কি ? এবং কবির চিত্তমঞ্চে কি প্রতিদিন এই সমাজ, এই দেশ এই পৃথিবীর দৃশ্যাবলীর অভিনয় হচ্ছে না ?

কবি লেখেন, মানে কবি শুধু পর্দাটা তুলে দেন। এই আমাদের চোখে দেখা পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, নগরে, পৃথিবীতে যা ঘটছে তা মানুষ মাত্রেরই মনের মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল সেই অভিনয় ; আর এক কুয়াশার পর্দায় তা ছায়াছন্ন। মানুষেরা তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে চেষ্টা করে, সেই অস্পষ্ট আঁধারের মধ্যে আলো পেতে আলিঙ্গনের বাহু বাড়িয়ে ব্যাকুল হয়। কবি যিনি তিনি সেই সাধ পূরণ করেন, সেই অভিনয়ে শৃঙ্খলা আনেন, তিনি আলো জ্বালেন, সেই পর্দা উন্মোচন করতে সাহায্য করেন। শুধু কোন প্রাতিস্বিক চেতনা নয়, ব্যক্তিগত বেদনা নয়—সর্ব-জনের কামনা. সর্বজনের কান্নায় তিনি ফুঁপিয়ে ওঠেন।

কবির সংগে সংশ্লিষ্ট যা, তা আবার সর্বজনের কেন ? কারণ নৈঃসঙ্গের চূড়ায় অধিষ্ঠিত কবির মন সর্বাংশে এই পৃথিবীর মানুষের মন। মানুষের যে চামড়ায় আগুনের সেঁক লাগলে ফোস্কা পড়ে, যে পেটে ক্ষুধা লাগলে নাড়ী মোচড় দেয়, যে বুকে পিপাসা জাগলে গলা শুকিয়ে আসে কবির সে চামড়া, সে পেট আর সে বুক ভিন্ন নয়। অতএব কবির যে যন্ত্রণা, তা মানুষের যন্ত্রণা, কবির যে ক্ষুধা তা মানুষের ক্ষুধা এবং কবির পিপাসা মানুষের পিপাসা।

এ দেশের কবিরা যদি মানসিক বিকার ও ব্যাধিতে ভুগছেন বলে মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে এদেশের মানুষও সেই মড়ক মহামারীতে আক্রান্ত। বিকৃতি সমাজে প্রবেশ না করলে কবির মনে প্রবেশ করেনি।

মাহে-নও
অগ্রহায়ণ : ১৩৭৩

সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের সমস্যা

আমাদের এখানে ভাল সাহিত্য-পত্রিকার অভাব। পত্রিকা যে দু'একটা বেরোয় না, এমন না। কিন্তু কোন পত্রিকাই দীর্ঘায়ু পায় না। অধিকাংশ পত্রিকাই অল্প সময়েই প্রাণ হারায়। এই অপমৃত্যুর কারণ কি?

প্রথমতঃ ভাল পত্রিকার জন্য আমরা ভাল লেখা চাই। কিন্তু ভাল যাঁরা আমাদের এখানে লেখেন তাঁদের সংখ্যা কম। এবং তাঁরা এত কম যে মাত্র একটি পত্রিকার জন্যে বাছাই করা লেখা পেতে গেলে অন্য পত্রিকার উপোসে মরা ছাড়া গতি নেই। উপোস এই জন্যে যে ভাল লেখকেরা বেশী লেখেন না, কিংবা অবসর পান না।

দ্বিতীয়তঃ অর্থ সমস্যা। আমরা যারা এখান থেকে পত্রিকা বের করি তারা লেখকের পারিশ্রমিক দিতে অপারগ। আমাদের যাঁরা ভাল লেখক তাঁরা কখনো পরম সচ্ছলতার মুখ দেখেন না এবং অভাবের হা পূরণ করার জন্যেও তাঁরা অনেক সময় লেখেন এবং অনেক সময় মৌলিক রচনাকে বাধ্য হয়ে দূরে সরিয়ে অনুবাদের আশ্রয় নেন। সুতরাং অর্থ দিয়ে রচনা কিনতে না পারার জন্যেই যথাসময়ে লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয় কারণ, পাঠক-সমস্যা। আমাদের দেশে পাঠক নেই সে কথা সত্যি নয়। কিন্তু সংস্কৃতি এবং সুন্দরের চর্চায় আগ্রহী পাঠক নিতান্ত অল্প। এর ফলে সাহিত্য-পত্রিকার যে একটা বাজার আছে সেখানে আগন্তুকের ভীড় নেই। সুতারং অবিক্রীত পত্রিকার ম্লান হাসি কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশকের ঠোঁটে আশ্রয় নেয়। এবং তিনি, প্রকাশক, নিরুৎসাহের অন্ধকার ঘরে কখন একদিন অগোচরে আশ্রয় নেন। নিভু-নিভু প্রদীপ নিভে যায়।

গৌণ কারণের আর একটি (আমি হয়ত গৌণ কারণ বলে ভুল করলাম) হল বিজ্ঞাপন। পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা মস্ত উপায় পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন ছাপা। কারণ বিজ্ঞাপনের পয়সাতে একটি পত্রিকা, তার

কপাল ভাল হলে ছাপা খরচ, কাগজ খরচ, মায় লেখকের পারিশ্রমিক পর্যন্ত চালিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু বিজ্ঞাপন কে দেয়। আর বিজ্ঞাপন সময় সময় দিলেও পয়সা কে দেয়। আমাদের জীবনে স্বার্থ জিনিসটার মর্যাদা এত বেশী যে নিজের কাজ একবার কোনক্রমে সারতে পারলে আমরা হাওয়া হয়ে যাই। (সব বিজ্ঞাপনদাতার বেলায় কথাটা সত্যি নয় অবশ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত জানাশোনার মধ্যে বিজ্ঞাপনের চাকা আবর্তিত হয় বলে কথাটিকে অর্ধসত্যে গ্রহণ করা যায়।) সুতরাং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন হয়ত বা জুটলেও সেই আসল বস্তুটি জুটবে না। মোট কথা সর্বব্যাপারে সহানুভূতির অভাব।

এবং হৃদয়ের এই আন্তরিক অভাব একা শুধু বিজ্ঞাপনদাতার নয়, শুধু লেখকের নয়, প্রকাশকেরও।

এই প্রসংগে একটা কথা বলতে চাই, তা হল এই যে, আমার উপরের ঐ মন্তব্যকে পত্রিকা প্রকাশক মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারেন যদি আন্তরিক আগ্রহ এবং অটল উদ্দীপনা নিয়ে তিনি বিজ্ঞাপন সংগ্রহে মনোনিয়োগ করেন।

আজকাল অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, অনেক অফিস, অনেক প্রকাশকের নতুন নতুন চেহারা আমরা দেখতে পাই। এবং তাদের সবারই নিজেকে প্রচারের প্রয়োজন আছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। এবং তা দক্ষতার উপর নির্ভর করে, নির্ভর করে পরিশ্রম এবং সহানুভূতির উপর।

পত্রিকা প্রকাশের জন্যে প্রকাশকের মনে যদি ক্ষণিকের উন্মাদনা প্রশ্রয় পায় তবে তার বিলুপ্তি অবধারিত। যে সব নেশাগ্রস্ত তরুণেরা নিজের পত্রিকায় নিজের লেখা ছাপা দেখার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেন তারা কয়েক দিনেই অন্য পত্রিকার আশ্রয়ে সন্তোষ লাভ করে আপন কর্মশক্তিকে অবিশ্বাসের ক্ষুধিত মুখে ফেলে দেন। এবং এমনি করে আর একটি পত্রিকা চির-নিদ্রার কোলে তার শিশু দেহটিকে ঢেলে দিয়ে বিদায় নেয়।

অর্থকরী সমস্যাটা নিদারুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু নেশা যদি আত্মার সংগে একাত্ম হয় তাহলে সে সমস্যার কিছুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ; আর তা না হ'লে ঐ নেশার অকালমৃত্যু অনিবার্য। কেবল আত্মরক্ষার জন্যে সৃষ্ট

নেশা বাস্তব হতে পারে। এবং বাস্তবতাই একমাত্র মরণের পথ আগলাতে সক্ষম।

মানে আমি বলছিলাম আমরা যখন কোন পত্রিকা বের করব তখন তার অগ্রপশ্চাতের সমস্ত সমস্যাগুলোকে আমরা বিবেচনা করে দেখব, যাতে সেগুলোকে এড়িয়ে যাত্রাপথকে সচ্ছল করে তুলতে পারি।

অর্থাৎ পত্রিকা বের করার আগে আমরা প্রথমে ভাবব আমরা ভাল লেখা ছাপব কিনা ; আমরা ভাল লেখা ছাপলে ভাল লেখক পাব কি না, আমরা ভাল লেখক পেলে তাকে ভাল পয়সা দিতে পারব কি না।

পয়সার কথাটা এত বেশী করে বলার কারণ এই পয়সা লেখককে প্রকৃতিস্থ করতে পারে, তাঁকে অবসর দিতে পারে, আর সাহিত্যের জন্য এবং শিল্পের জন্য অবসর অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে আমরা যাকে উন্নতমানের সাহিত্য-শিল্প বলি তার জন্যে ত বটেই।

পয়সাটা সাহিত্যের জন্যে যে সর্বস্ব তা বলব না। কেননা দেখা গেছে অনেক সময় স্বচ্ছলতা সাহিত্যিকের সর্বনাশ করেছে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই সেই সব লেখক সত্যিকার লেখক নন। লেখাটা সে লেখকের নেশা নয়, জীবন-মরণ নয়। অবশ্য শিল্পের জন্য 'কাঞ্চন'কে পায়ে ঠেলে দেয় এমন লেখক যদিও দুর্লভ তবু প্রকৃত লেখকের লোভটা অর্থের উপর কেন্দ্রীভূত না হয়ে হবে লেখার উপরে। অর্থটা তার কাছে মুখ্য হবে না।

মুখ্য না হলেও তবু অর্থের প্রয়োজন আছে। এবং এই যান্ত্রিক যুগে মানুষের যখন একটি পা বাড়ানোর উপায় নেই পয়সা ছাড়া, তখন পয়সার লোভে মানুষ অসম্ভব কাজ করতেও উৎসাহী হয় এবং সেই হিসেবে পয়সা দিয়ে যে সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব নয় তা আমরা অস্বীকার করি কি করে ?

এর পরে আলোচ্য বিষয় হল এই যে আমাদের এখানে যাঁরা পত্রিকা বের করেন অথবা যাঁরা কোন পত্রিকার সম্পাদক তাঁরা একটা দায়িত্ব সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন নন। এখানে যখনই কোনো পত্রিকা বের হয়, দেখা যায় সেই পত্রিকার মালিকেরা একটি নিজস্ব গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন এবং পুনঃ পুনঃ নিজেদের মনঃপূত ব্যক্তির লেখা ছাপেন। এতে সুবিধা অসুবিধা দুইই

আছে। সুবিধা হল এই যে মনঃপূত ব্যক্তির লেখা আর নিজের মনোমত লেখা ছাপলে একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। যেহেতু সাহিত্য-পত্রিকার একটা চারিত্র্য অনেকের কাম্য— অতএব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ গোষ্ঠীর প্রয়োজনও কাম্য। কিন্তু অসুবিধা যেটা তা হল এই যে স্বাতন্ত্র্যের দিকে এমনি কড়া নজর রাখতে গিয়ে নতুন লেখক তৈরীর কাজটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না। অথচ পত্রিকার নতুনত্বের জন্যে নিরন্তর নতুনের সন্ধান একান্ত আবশ্যক। কেননা নতুন নতুন লেখকই পত্রিকাকে নতুন জীবন দিতে পারে। তাতে পত্রিকার একঘেঁয়েমী নষ্ট হয় এবং পত্রিকা মাঝে মাঝে পুরনো খোলস পাল্টে উজ্জ্বল চেহারা ফিরে পায়।

আমরা অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি ভাল নতুন লেখকের লেখা অনেক সময় সম্পাদকের ঔদাসীন্যে এবং বীতস্পৃহায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে ; ধৈর্যের অভাবে অনেক সময় সম্পাদকগণ অনেক লেখকের গোটা লেখাটাই পড়েন না এবং সামান্য কিছু পড়েই একটি বিচারহীন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ফলে, যে-লেখা একটি সত্যিকার সাহিত্য হত তা আর সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। এবং ভালো নতুন লেখকেরা, তাঁর লেখার এই পরিণতিতে অনেক সময় ব্যথা পেয়ে নিরাশ হন। হয়ত এমনও হয় সত্যিকার সাহিত্যিক হওয়ার সম্ভাবনাময় একটি জীবন সম্পাদকের অমনোযোগের নিঃশ্বাসে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এটুকুও বলি যে প্রত্যেক লেখকের একটি নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আছে। আছে স্বকীয় চিন্তাধারা, আছে ব্যক্তিমানস, আছে স্বভাব, আছে চারিত্র্য আছে পৃথক নীতি। সম্পাদক যদি, কিংবা পত্রিকা প্রকাশক যদি, তা পছন্দ করেন না বলে তার লেখা না ছাপেন তাহলে অনেক সময় ভাল লেখা ছাপা থেকে নিজের পত্রিকাকে তাঁরা বঞ্চিত করবেন। এবং লেখকও ব্যর্থ হয়ে মনমরা হবেন, উৎসাহহীন হবেন।

দলগত মনোভাব, নীতি কিংবা আদর্শের জন্য অনেক সময় সম্পাদকেরা এই সব কাজ করতে বাধ্য হন, হয়ত নিজেদের পত্রিকার একটা বিশেষ চেহারা, স্বতন্ত্র পরিচয় কিংবা চারিত্র্য তুলে ধরতে তাঁরা এইসব করেন। সে করা ভাল। কিন্তু সুউন্নত শ্রেণীর সেই রকম একদল লেখক আমাদের এখানে কোথায় ?

সাহিত্যে গোষ্ঠীপ্রীতিটা অবশ্য কেবল একা আমাদের দেশের ব্যাপার নয়। এটা সব দেশে সব কালে থাকে। মানুষে মানুষে মতামতের এত ব্যবধান যে কোন দু'টো মানুষ একই চিন্তার সিঁড়িতে চড়ে একই লক্ষ্য-বস্তুতে উঠতে পারে না। মনোবাসনার এই বিপুল বিভেদ সত্ত্বেও যে মানুষ পরস্পরের বন্ধু হয় তার কারণ বৈসাদৃশ্যের অন্তরালে কোন কোন মানুষের চিন্তা কোন কোন মানুষের চিন্তার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। যাঁদের চিন্তাধারার চেহারাটা সমগোত্রের তাঁরা সমগোত্রীয় মানুষকে যে একটু বেশী ভালবাসবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু মানব জাতির সমস্ত বিভক্ত চিন্তাধারার পরের স্তরে আর একটা চিন্তা আছে আর সেটা হল বিশ্বজনীন চিন্তা। বিপরীত পথে হলেও মানুষ তার অজানা কোন এক এবং একক লক্ষ্যে পেঁছিতে চেষ্টা করে। যে-মানুষ, অথবা যে-লেখক সেই সম্মিলিত বাসনার ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করতে পারেন তিনি বিশ্ববিশ্রুত। সব মানুষই একটি জিনিসকে ভালবাসেন, আর তা হ'ল, সুন্দর। এবং সেইখানে মানুষে মানুষে বিভেদ নেই। আমাদের সম্পাদকেরা যদি লেখকের মধ্যে সেই সুন্দরের দেখা পান, তা'হলে, তাঁকে অগোত্রের লেখা বলে যেন দূরে ঠেলে না দেন ; আর তা না করলে আমাদের সাহিত্য অনেক লোকসান থেকে রেহাই পাবে।

আমরা উপরে বলেছি আমাদের এখানে পাঠক দুর্লভ নয়। কিন্তু সেই পাঠকেরা আমাদের সাহিত্যের কতটা পৃষ্ঠপোষক? এই ঢাকা শহরে কয়েক লক্ষ লোকের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক হাজার পাঠক নিশ্চয়ই আছেন। অথচ সমস্ত বাংলাদেশেও কয়েক হাজার কি হাজার খানেক সাহিত্য-পত্রিকা ঠিকমত বিক্রি হয় বলে আমার মনে হয় না। কেন হয় না। আমাদের সাহিত্য-পত্রিকায় কি তাঁদের ভালো লাগার মত লেখা থাকেনা, না আমাদের সাহিত্য-পত্রিকা ক্রয়ের মত তাঁদের অর্থের সংকুলান হয় না? আমাদের দেশ গরীব হলেও কয়েক হাজার বিত্তশালী লোক যে এদেশে আছে তাত আমরা জানি। সেই সব বিত্তবানদের রুচিসম্মত লেখা কি আমাদের সাহিত্যিকেরা লিখতে অসমর্থ?

নিশ্চয় কোথাও একটা গলদ আছে। সাধারণতঃ ব্যবহারে অভ্যস্ত জিনিসের প্রতি মানুষের একটা দুর্বলতা থাকে। যে ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে

একবার রোগ সারে রোগী পুনর্বার সেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। নতুন চিকিৎসক আর নতুন ওষুধের প্রতি রোগীর যে সন্দেহ, আমাদের ধারণা, আমাদের পাঠকেরা কিছুটা সেই সন্দেহের রোগে ভোগেন।

অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, যে-সমস্ত বড় লেখকেরা বিশ্ব-সাহিত্যের ভূষণ তাঁদের সমান উজ্জ্বল প্রতিভা আমাদের এখানে এখনও দেখা দেয়নি। তবে একটা কথা আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে আমাদের এককালের অনুর্বর ভূমি এখন অনেকাংশে উর্বর এবং তাতে যে ফসল ফলতে শুরু করেছে তা উপবাসী হৃদয়ের নৈরাশ্য নয়। তবু পাঠকেরা এ ফসল যত্ন করে ঘরে নিতে অনিচ্ছুক। এবং এই কারণেই আমাদের ফলবান লেখকেরা যেমন হতভাগ্য তেমনি ভাগ্যহীন সাহিত্য পত্রিকাগুলোও।

কিন্তু উপরোক্ত কথাগুলো আমাদের হয়ত বা পুরোপুরি সত্যি নয়। মানে দু'একটি সাহিত্য-পত্রিকা পাঠকের দৃষ্টি কখনো বা আকর্ষণ করেছে। কিন্তু বলতে কুণ্ঠা নেই, সে পাঠকও বিশেষ শ্রেণীকে অতিক্রম করতে পারেনি। ফলে একটা ব্যাপ্ত চাহিদার অভাবে, আকুল পিপাসার অনটনে বদ্ধ পানির নিষ্কৃতি ঘটেছে না এবং সাহিত্য তার যৌবনের সংগী না পেয়ে বিষণ্ণ মুখে দিনাতিপাত করছে।

সাহিত্য-পত্রিকা সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ সাহিত্য সাহিত্য-পত্রিকা ভিন্ন দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারে না। লেখকের চিন্তাসুরাকে পরিবেশনের জন্য ভৃঙ্গারের প্রয়োজন। সে ভৃঙ্গার সাহিত্য-পত্রিকা ; এবং ভৃঙ্গার বহনের জন্য প্রয়োজন সাকীর। সে সাকী হলেন সম্পাদক অথবা পত্রিকা-প্রকাশক। এদের অভাব মানেই সাহিত্যের স্বর্গপ্রাপ্তি। বাংলাদেশের সাহিত্য কি সেই স্বর্গের সিঁড়িতে পা রেখেছে? তাহলে আর আশা কি?

নাগরিক
১৯৬৮
আশ্বিন : ১৩৭৫

মহৎ কবিতা আর মননশীল কবি

মহৎ কবিতার একটা বিশেষ রূপ আছে যা মহান সৌন্দর্যের মত। দু'একটি উদাহরণের ভিতর দিয়ে বিষয়টিকে বুঝবার চেষ্টা করা যাক। সুইডেনের কবি ভার্নার ফন হাইডেনস্টাইনের একটা কবিতা এমনি :

কত অনায়াসে ক্রোধে জ্ব'লে ওঠে মানুষ
কত অনায়াসে হৃদয়ের কোন খবর না নিয়ে সবাই
ব্যক্তি-প্রাণের দোষারোপে দেখ মত্ত
অথচ প্রতিটি হৃদয়ে রয়েছে সেই অলক্ষ্য কামরা
দরোজায় যার তালা দেওয়া
আর যে তালা খোলে না চাবিতে
ঘরের ভিতরে দীপের আগুন
সে আগুনে কোন তেল
পুড়ছে তা কেউ জানে না
শুধু মনে হয় চাবির ফোঁকর দিয়ে
ম্লান বিশীর্ণ আলো এসে পড়ে বাইরে ; এবং তারই
আভায় আমরা চলি ফিরি ঘুরি ;
অথবা ঘুমিয়ে পড়ি ;
সেই আলোকেই চিনি পথ সেই আলোকিত পথ দিয়ে
চলি আমৃত্যু যেখানে পথের প্রান্ত।

[অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী]

এখানে সুবোধ্য শব্দের গাঁথুনিতে কাব্য-ব্যঞ্জনার দ্যুতিতে একটি চিরগভীর সত্যের মর্মস্পর্শী প্রকাশ আমাদের আন্দোলিত করে।

এই কথাগুলো এমন মর্মস্পর্শী হল কেন ? তার কারণ এর অন্তর্গত ভাবনার মাহাত্ম্য। ভাবনা মহৎ হলে কবিতা মহৎ হয়। অবশ্য একথা সত্য মহৎ ভাবনাটিকে কবির হাত দিয়ে সৃষ্ট হতে হবে। তার মানে, কাব্যের

যে একটা সনাতন রূপ আছে, ব্যঞ্জনা আছে ভাবনাটি তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এর জন্যে কোন অকারণ জটিল উপায়ের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কোনো জটিল আঙ্গিকে জটিল ভাবনাকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত করা হয় মাত্র। কিন্তু কবির কাজ ত তা নয়। কবির কাজ হল তাঁর ভাবনাটিকে পাঠকের হৃদয়ে পেঁছে দেওয়া এবং সে-জন্যে যতটা সহজে, সুন্দরভাবে এবং চিত্তাকর্ষক উপায়ে সেটাকে পেঁছে দেওয়া যায় ততই ভালো। কবি যেন না ভোলেন যে খুব বেশী বাধা পেলে পাঠক বিরক্ত হবেন। এবং ধীরে ধীরে কবিতার প্রতি বিমুখ হয়ে উঠবেন। প্রসংগত এখানে আরও একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলবার চেষ্টা করব। কবিতাটি আরবী কবি বাহাউদ্দীন জুহাঙ্গীর লেখা :

একটি অন্ধ মেয়ের জন্য

ওরা বলে, আমি ভালবাসি যারে সে এক অন্ধ নারী।
আমি বলি, ঠিক, ভালবাসা তাই দ্বিগুণ ঢালতে পারি।
মেয়েটি অন্ধ, না হলে আমার পাকা
চুলের কথাটি দৃষ্টিতে তার কি করে থাকত ঢাকা ?
খোলা তলোয়ার যখনি আঘাত হানে
কে তাতে অবাক মানে ?
বিস্ময় মানি তখনি বারংবার
মরণান্তিক যন্ত্রণা হানে খাপে ঢাকা তলোয়ার।
গুরুজনদের সতর্ক চোখ নেই যার কোনোখানে
আমি ঘুরি সেই আমারি প্রেমের সুন্দর উদ্যানে।
গর্বিত লাল গোলাপের পাশাপাশি
যে জাগায় সাদা নিমীলিতাক্ষী নার্সিসাসের হাসি।

[হাজার বছরের প্রেমের কবিতা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী]

একটু মন দিয়ে দেখলে বুঝতে পারব কবিতাটা কেবল প্রেমের কবিতা হয়েও অন্য অর্থ বহন করে। আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য দেখিয়ে প্রেম অর্জন করতে হয়। মেয়েটি ত অন্ধ নয়, মেয়েটি প্রেমান্ধ, আর প্রেমান্ধ বলেই ত

পক্ককেশের ত্রুটি তার চোখে ধরা পড়েনি। অন্য কথায় চক্ষুষ্মানের ভালবাসার মধ্যে বিস্ময় নেই এবং চক্ষুষ্মানকে ভালবাসার মধ্যে সেই মাহাত্ম্য নেই যে মাহাত্ম্য আছে চক্ষুহীনাকে ভালবাসায়। কবিতাটি সেইখানেই মহৎ হয়েছে এবং কথাগুলো যেহেতু কবির কথা, তাই, তিনি সোনালী কারুকার্যে বাঁধাই করে পাঠককে তাঁর কৈফিয়ৎ উপহার দিয়েছেন। কবির বলবার ভঙ্গিটি তাঁকে বিজয়ী করেছে এবং কতকগুলো অনুপম উপমায় সে বিজয় মহিমান্বিত হয়েছে।

আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে উপরের ঐ কবিতাটিতে এমন শব্দ নেই যার অর্থ আমরা অভিধান ভিন্ন বুঝি না অথবা কোনো ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক উপমা নেই যার জন্যে আমাদের বিদ্যার সাগর হওয়ার প্রয়োজন। যে কোনো অল্প বিদ্বান পাঠকই কথাগুলোর তাৎপর্য বুঝে নিতে পারেন। এতদসত্ত্বেও কবিতাটি মহৎ হওয়াতে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি।

তবে এই প্রসংগে একটা কথা আমাদের বলে নেওয়া দরকার। এ পর্যন্ত যে দু'টি কবিতার আমরা উদ্ধৃতি দিলাম এরা মহৎ কিন্তু স্নিগ্ধ।

কিন্তু কিছু কবিতা আছে যেগুলো উদ্দীপক, এবং রোমহর্ষক। নজরুল ইসলাম এই ধরনের কিছু কবিতা লিখেছিলেন! তার কতকগুলো পড়লে আমাদের রোমাঞ্চ হয়; আমাদের মনের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়; আমরা যেন অবলম্বন পাই, শক্তি পাই, সাহস পাই। সাধারণ মানুষ হয়েও আমরা অতিমানুষের পথে পদচারণা করতে পারি। এদের অন্যতম দুটি কবিতা 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু'। এ-দু'টি কবিতাকে দুটি কবিতাও বলা যায় অথবা একটি কবিতার দু'টি ভিন্নরূপ বলা চলে। 'ধূমকেতু' কবিতাটি ভীষণতম বিদ্রোহের প্রকাশ। মানুষ ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের নির্ধারিত নিয়মকে অবহেলা করতে পারে। মানুষের সেই সীমাহীন অকল্পনীয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। আভিজাত্য এবং আত্মমর্যাদার দীপ্তরূপ দেখাতে মধুসূদন মেঘনাদের মুখে যে ভাষা ফুটিয়েছিলেন :

> ("হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
> রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
> আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কেবা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবাল দলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ?")

[মেঘনাদ-বধ : ষষ্ঠ সর্গ]

নজরুলের বিদ্রোহীর রূপ সে ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের মত ধ্বনিগম্ভীর ছন্দে না লিখে মাত্রাবৃত্তে লিখে নজরুল প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় বীরত্বের গাম্ভীর্যকে আশ্চর্য শক্তিতে বজায় রেখেছেন :

ঐ বামুন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত
মম অগ্নিদাহনে জ্বলে পুড়ে মরে ঠুঁটো সে জগন্নাথ
আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও
তাই বিপ্লব আনি, বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও
তোর নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই মৃত্যুর মুখে থুথু দিই
আর যে যত রাগে রে তারে তত কাল-আগুনের কাতুকুতু দিই !

[ধূমকেতু : অগ্নিবীণা]

বেপরোয়া এক মুক্ত মানস-ভাবনার ক্রোধ এখানে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নদীর মত কবিতার ছন্দটিকে বেগবান ক'রে তুলেছে। কবিতাটির এই গতিঝর্ণার অন্তরালে আছে কবির বক্তব্য বিষয় সম্পর্কিত বিশ্বাসের আন্তরিক চাপ।

বলা বাহুল্য এই কবিতায় আছে আমাদের সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মনের বিরুদ্ধধর্মী বিপ্লবের কথা। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা বলবেন এ-সব নাস্তিকের কথা। আমরা বলব আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ এ একজন মানবপ্রেমিক

কবির কথা। সর্বোপরি মানুষের কথা। কথাগুলো আমরা যেভাবে ভাবি তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ভাবা। তার কারণ অবিরাম একি পর্যায়ের ভবনা ভেবে আমরা ত আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারিনি। কেবল ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে রোগ নিরাময় হয় না বলেই পৃথিবীতে মনুষ্যনির্মিত হাসপাতালের সৃষ্টি হয়েছে। কেবল ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে আমরা মানুষেরা আমাদের ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলেছি, আমাদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করিনি। যেখানে ঈশ্বরের ক্ষমতা সব, ঈশ্বরের ইচ্ছাই সমস্ত সেখানে মানুষের করার কি আছে! সুতরাং দুর্বল দুর্বল হোক, সবল সবল হোক, দরিদ্র দরিদ্র থাক, ধনী ধনী থাক, অত্যাচারী অমর হোক, অত্যাচারিতের দুঃখ চিরঞ্জীব হোক, মানুষের করার কি আছে! মানুষের করার কিছু নেই এ-কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনি পৃথিবীর নির্বাসিত মানুষের গোত্রভুক্ত—তারা সন্ন্যাসী, তারা অপার্থিব, অজাগতিক মানুষ কিংবা অমানুষ। পৃথিবীর জন্যে যেমন মানুষ, তেমনি মানুষের জন্যে পৃথিবী। মানুষ মানুষের জন্য ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে; ঈশ্বরই শুধু মানুষকে সৃষ্টি করেনি। অতএব যে-মানুষ মানুষের জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, মানুষের জন্য তার কর্তব্য অসাধারণ। এই দায়িত্বশীল মানুষের কাছে, বস্তুতঃ মানুষই একমাত্র ধ্রুব। বস্তুতঃ মানুষের জীবনকে, আসলে, ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করেন না, নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ। মানুষের ধ্বংসের জন্যে, অধঃপতনের জন্যে এই সমাজ কিংবা ধর্মের স্রষ্টারা দায়ী, অথবা দায়ী ঐ সমাজ-স্রষ্টার স্রষ্টা। চতুর, বুদ্ধিমান, চরিত্রহীন, কপটাচারী, ভণ্ডের স্রষ্টা, 'ভুয়ো ঈশ্বর'—কবি সেই ঈশ্বরকে জ্বালাবার জন্যে বুকে চিতা জ্বালিয়েছেন—নিপীড়িতের বুকের জ্বালায় ভগবান পুড়ে যাবেন। 'হো হো ভগবানে আমি পোড়াবো বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা।'

পুরনো চিন্তার বাহক না হ'য়েও কবিতাটি আমাদের এক সমৃদ্ধতর চেতনায় জাগিয়ে তুলতে কোথা থেকে ক্ষমতা পেল? এই কবিতায় কবি তৎসম শব্দত বটেই অনেক পৌরাণিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবু কবিতটি কোন গুণে দুর্বোধ্য হ'ল না? কিসের গুণে অলংকার 'সংকরে'র ব্যবহার সত্ত্বেও স্পষ্ট হয়ে রইল? উত্তর সেই একই: সুদূরপ্রসারী মহৎ ভাবকল্পনায় গুণান্বিত বলে।

এইসব মহৎ দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক কবিদের কবিতায় বড় একটা দেখতে পাই না। তাঁদের পরিকল্পনাগুলো এমন ভীরুতার রজ্জু দিয়ে জড়ানো, এমন অহঙ্কারের কিন্তু আত্মকেন্দ্রী চেতনার আবরণে আচ্ছাদিত যে শত চেষ্টাতেও আমরা পাঠকেরা আনন্দের রসে তৃপ্তি লাভ করতে পারি না। পারি না তার কারণ আমরা অন্ধকারে আছি ব'লে অন্ধকারকে ভালবাসি না। আমরা অন্ধকার থেকে মুক্তিকে ভালবাসি। সেই মুক্তির আলোক-বর্তিকা যে কবিতার ছন্দে মশালের মত জ্বলে উঠবে সেই কবিতাই হবে আজকের মহৎ কবিতা।

মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে কাপুরুষের দুঃখের কোনো মূল্য নেই, বীরের দুঃখের মূল্য আছে। 'মেঘনাদ বধে'র ট্রাজেডির নায়ক রাবণ। সীমাহীন দুঃখ তার। 'নিয়তির চাকায় ঘেরা, নিরুপায় বাধ্য' এক মানুষ। কিন্তু মর্মান্তিক বেদনার সাগরে নিমজ্জমান সেই মানুষটির হাহাকারের মধ্যে আছে প্রকৃত মনুষ্যরূপ বীরের কণ্ঠ :

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ,
'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা। রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে।'

[মেঘনাদ বধ : প্রথম সর্গ]

হৃদয় ভগ্ন, কিন্তু পৌরুষের মৃত্যু হয়নি। মৃত্যু হয়নি মানুষিক চেতনার। এই চেতনায় আক্রান্ত বলে দুঃখ মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটায়নি।

কবিকে আমরা এমনি বীর বলেই ভাবতে পারি। শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই বীর। মানুষের হৃদয়-রাজ্য যাঁরা জয় করেন তাঁরা বীর নন তবে কি? বাল্মিকী, বেদব্যাস, ফেরদৌসী কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য মহাকাব্য রচনা করেননি। মহাকালের মানুষের বেদনা তাদের ডেকে এনেছিল মানুষের জন্য স্বর্গ রচনা করতে। ক্ষণকালের সেই স্বর্গে দুঃখী মানুষের পদচারণাই

বেশী। কিন্তু মহিমময় সেই দুঃখ—পৃথিবীর অন্তহীন দুঃখ যার স্পর্শে আনন্দ হয়ে যায়।

আমাদের বক্তব্য ছিল যে মহৎ কাব্যকে মাথা ঘামিয়ে বুঝতে হয় না। মহৎ কবিতার চেহারায় এমন জ্যোতি আছে যা এমনকি অন্ধ পাঠকের চোখের ছানি তুলে আলোর পৃথিবীর সৌন্দর্যে অবগাহন করায়। তার শরীরে এমন একটা শক্তি সততঃ সঞ্চারিত যাকে স্পর্শমাত্রেই অনুভূতির অন্তস্থল পর্যন্ত দুলে ওঠে। মহৎ কবি যাঁরা তাঁরা শব্দ, ছন্দ ও ভাবনার বন্ধনীতে বিশেষ এক সুরের সৃষ্টি করেন। সে সুর মন্ত্রের মত। মনের মধ্যে সে একবার প্রবেশ করলে বহির্জগতে বিচ্ছুরিত মনকে সে এক নিমেষে একস্থানে গুটিয়ে আনে, যেখানে শব্দের গতীধ্বনি কোন মহান অর্থের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দেয় অথবা তা কোন দুরতিক্রম্য অর্থের সাগরে মনকে ভাসিয়ে দেয়। তখন আমরা অর্থ বুঝি অথচ বুঝি না, ধরতে পারি অথচ ধরতে পারি না ; আমরা বেদনার আনন্দে রোমাঞ্চিত হই ; আমরা অলৌকিকের উপভোগে মানবজন্ম সার্থক করি। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটির কথা :

প্রথম দিনের সূর্য
        প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
        কে তুমি ?
        মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
        দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
    পশ্চিম সাগরতীরে
        নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
            কে তুমি ?
                পেল না উত্তর ॥

অতি পরিচিত সহজতম শব্দের ক্ষুদ্র কবিতা। কিন্তু এর মধ্যে গ্রথিত আশী বছরের জীবনকালের অভিজ্ঞতা। এই কবিতাটি তাই আত্মসন্ধানী চোখের সীমাহীন দৃষ্টি এবং জীবনের সারাৎসারের নিঃসীম সাগর। এ-কবিতা, তাই মহৎ কবিতা। কবিতার জন্যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সে অভিজ্ঞতা আসবে আত্মত্যাগে, আত্মসংহারে। সমস্ত জীবনকে, আত্মাকে মনকে বেদনায় নিষ্পেষিত করে নিঙড়ে না নিলে কেবল বুদ্ধি আর বিদ্যা দিয়ে নিশার নিদ্রা নিহত করে সত্যিকার কবিতার জন্ম দেওয়া যায় না।

বীণাতারে করাঘাত হানি সারদার
কী সুর বাজাতে চাহ গুণী? যত সুর
আর্তনাদ হয়ে ওঠে শুনি।

[দারিদ্র্য : নজরুল]

কবি কী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন যে তাঁর কাব্য-বীণায় আর্তনাদ ছাড়া অন্য কোন সুরই রূপময় হয়ে ওঠে না।

দারিদ্র্য কবিতার কটা লাইন এমনি :

পারি নাই, বাছা মোর, হে প্রিয় আমার !
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে। মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি, দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে, জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব আনিন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ? ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস।

উপরোক্ত কথাগুলি কবির জীবনের গভীরতম বাস্তব ঘটনা।

এই বাস্তবিক সত্য আমাদের জীবন থেকে আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। অথচ আমাদের কবিতা আন্তরিক হতে পারছে না। তার মানে আমরা যে অবস্থার মধ্যে বাস করছি, যে অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবন যাপন করছি আমাদের কথাকে আমরা সেই অবস্থা দিয়ে, সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে সাজাতে পারছি না,

তাকে অন্তর্ভেদ করার মত তীক্ষ্ণধার করে তুলতে পারছি না। সে কি আমাদের শক্তির অভাবের জন্য, অথবা কোন প্রেততাড়িত চিন্তার বৈকল্যের জন্য।

আমরা আমাদের লেখকদের কাছে যে জিনিসটা প্রত্যাশা করি তা হল আমাদের কথা। যেখানে আমাদের কথা নেই, আমাদের স্থানের ,কালের, পরিবেশের, পরিবেষ্টনের কথা নেই সেখানে আমাদের মন স্বস্তি পাবে কেমন করে, আনন্দ পাবে কেমন করে। সার্বজনীন অথবা বিশ্বজনীন বড় কথা কিন্তু যে শিকড় থেকে রস সংগ্রহ করি তাকে ভুলে কেবল পত্রপুষ্পের শোভা দেখিয়ে দেশান্তরের পাখীকে কতদিন আকর্ষণ করা যায়? কাণ্ড মূল থেকে রস সঞ্চয় না করলে যে শাখা-প্রশাখায় কুসুমের জন্ম হয় তাও ক্ষীণায়ু হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করবে।

আমাদের এই আলোচনার কোনো অর্থই থাকবে না যদি আমাদের তরুণতম কবিরা এখনকার শিল্প-সাহিত্যের ষ্টাইল পাল্টে গেছে বলে চোখ বুঁজে মুখ ফিরিয়ে নেন। একথা ঠিক, ষ্টাইল জিনিসটা অবিরাম পরিবর্তনশীল। যুগ-মানসের রুচির সংগে পোশাকের পরিবর্তন হয়, পোশাক পরার ধরনের পরিবর্তন হয়। কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চয়ই অপরিবর্তমান। সেটা দেহ। যত রকম করে, যে রকম করে সাজানো যাক অঙ্গের পরিধি সংকুচিত, প্রসারিত অথবা অন্তর্হিত হয় না। কবিতার সেই আসল দেহটা কি? যার উপরে রূপসজ্জা গড়ে ওঠে? সেটা কাব্যের বিষয় অথবা কবির ভাবনা। ঐ ভাবনার সঙ্গে পাঠকের ভাবনা না মিললে পাঠক আকর্ষিত হবেন কেন? আর যে কবিতার ঐ ভাবনা পাঠকের ভাবনায় অনুরাগ সঞ্চার করে সে কবিতা মহৎ না হবে কেন?

আমাদের কালে বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যে-কোনো লেখকের ভাষা সচ্ছল গতিশীল। ভাষা বর্তমানে যে রূপ পেয়েছে তা দিয়ে যে-কোনো ভাবনাকে সচ্ছন্দে সহজে অনায়াসে প্রকাশ করা যায়। লেখকের কাজ হল ভাষার যথোপযোগী ব্যবহার। ব্যবহারের তারতম্যে প্রসাধন কদর্য হয়ে ওঠে। সেইটাই মস্ত কথা, চেহারা অনুযায়ী পোশাক হবে, প্রসাধন হবে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' আর 'বলাকা'র ভাষা দেখলে আমরা বুঝতে পারি ভাবনা অনুযায়ী ভাষা কেমন রূপ পরিবর্তন করেছে।

এই কথাটাকে ধরেই অতি সাম্প্রতিক কবিরা বলবেন যে, আসলে ব্যাপারটা তাই, আমাদেরও ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে, ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের কথা হল কবির ভাবনা কাল-নিরপেক্ষ হবে, না কালানুসঙ্গী থেকে কালাতীত হবে?

এখনকার কবিরা যেহেতু মননশীল তাঁদের লেখাও তাই মনমুখাপেক্ষী। তাঁরা বলেন আমাদের লেখা মনোযোগ দিয়ে দেখান। এ-কবিতা চোখের নয়, নিছক মনের। এবং যেহেতু মন এমনই একটা জিনিস যা অন্তরালবর্তী, তাই কবিতাও অসূর্যম্পর্শা, তাকে দেখতে হলে হেরেমে ঢোকার অধিকার অর্জন করতে হবে।

বড় বড় কথা। কিন্তু পাঠকের শ্রদ্ধা করার কথা নয়। পাঠক কে? কবি ছাড়া অন্য সবাই পাঠক। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে তাঁরাই বা কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন কেন? শ্রদ্ধা ত ভালবাসার সংগে সম্পর্কযুক্ত। এখনকার কবিরা কি পাঠককে ভালবাসেন না? ভালবাসেন তবে কাকে? নিজেকে? আত্মপ্রেমমুগ্ধ কবির লেখা মহৎ হয় কি?

সমকাল
বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৪

সনেট ও নজরুলের গান

নজরুল ইসলাম সনেট লেখেননি কখনো। কেন? তিনি আবেগচারী ছিলেন বলে? কোন কোন সমালোচককে লিখতে দেখেছি যে, যেহেতু নজরুল ইসলাম আবেগের স্রোতে ভেসে যেতেন সুতরাং তাঁর পক্ষে সনেট লেখা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না এই জন্যে যে, সনেটের আঙ্গিক কঠিন রীতির রজ্জুতে বাঁধা—যে রীতির কক্ষে বিচরণ নজরুল-স্বভাবের কাছে অপরিজ্ঞাত—এই তাঁদের যুক্তি। কিন্তু এই যুক্তি যে ভ্রান্তির ফাঁসিতে লম্বমান তার প্রমাণ দেখতে চাইলে নজরুলের গীতি গ্রন্থগুলো দেখবার জন্যে সকল পাঠক সমালোচককে আমন্ত্রণ জানাই। ক্ষুদ্রাকৃতির গীতি-কবিতার কত কঠিন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে নজরুল ইসলাম করেছিলেন সেটা তাঁর প্রতিটি গানের গঠন-নৈপুণ্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। একটা সীমিত বৃত্তের মধ্যে অসীম আবেগকে যে কী ভাবে আন্দোলিত করা যায় তা ঐ গানগুলো না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে, সনেট আর গান কি এক জিনিস? কিন্তু যিনি প্রশ্ন করবেন তাঁকে যদি উল্টে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি সংগীত কাকে বলে তা জানেন? এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি আমরা সংগীত ও কাব্য সম্বন্ধে অবহিত হই।

একটি কবিতা যখন অক্ষরে-শব্দে বন্দী থাকে তখন সে কবিতা, সুর ছাড়া তাকে আবৃত্তি করলে তখনও সে কবিতা থাকে—কেননা কবিতা যে অর্থ জ্ঞাপন করে অনুচ্চারিত থেকেও সে চোখের কাছে, মনের কাছে তা পেঁাছে দিতে পারে। স্তব্ধ থেকে চিত্রকলা যেমন আনন্দ দেয় কবিতাও তেমনি নিনাদিত না হয়েও চিত্তে তৃপ্তি সঞ্চার করতে সক্ষম। তবে ধ্বনি ও ছন্দের প্রয়োজন হয় কেন কবিতায়? হয় এই জন্যে যে ধ্বনিত না হলেও সে ধ্বনির আধার বলে শব্দহীন অবস্থায় মনের মধ্যে সে ধ্বনি সঞ্চার করে? কিন্তু গানকে ধ্বনিত হতে হয়—নিনাদিত না হলে সে তার রূপ প্রকাশ করতে পারবে না। সে কোনো অর্থময় বাক্য, চিত্রময় বাক্য এবং কল্পনা অথবা

ভাব কিংবা ভাবনাময় বাক্যের অপেক্ষা না করে শুধুমাত্র ধ্বনি এবং নাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম। বলা যেতে পারে কথা ছাড়াই গান হতে পারে কিন্তু কথা ছাড়া কবিতা হয় না। এবং এমনিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে, গান কবিতা হতে পারে না কিন্তু কবিতা গান হতে পারে। গান কবিতা হতে পারেনা কারণ গান অর্থময় ভাষার ফলশ্রুতি নয়, কিন্তু কবিতা গান হতে পারে কেননা সে ধ্বনিত এবং নিনাদিত হতে পারঙ্গম, এবং স্বর ও সুরের মাধ্যমে আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচনে সে অলজ্জ। গান যদি বাক্যের প্রত্যাশা না করে তবে বাক্যকে কবিতার আঙ্গিকে সাজিয়ে গান গাওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত হল কেন ?

সংগীতকে শ্রেষ্ঠতম শিল্পকলা বলা হয়। চিত্তে আনন্দসৃষ্টিতে সঙ্গীতের উপর অন্য কোন শিল্প নেই। ঐ আনন্দ কথা কিংবা কবিতা ধারণ করতে অসমর্থ। বলা যেতে পারে কথা কিংবা কবিতার আনন্দের যেখানে শেষ গানের আনন্দের সেখান থেকে শুরু। অনেক সময় মনে মনে কবিতা পড়ে আমরা যখন তৃপ্তি পাইনা তখন আমরা শব্দ করে পড়ি, যাকে আবৃত্তি বলে সেই আবৃত্তিতে আমরা যেন সেই আনন্দের কিছুটা তৃপ্তি সাধন করি। কিন্তু আরও একটা পর্যায় আসে যখন আবৃত্তিতে আনন্দ পাওয়া যায় না—যখন আমরা সুরের আমন্ত্রণ জানাই। আর সুরের মাধুর্যে ধরা পড়লে কবিতা হয়ে ওঠে গান। সব কবিতাই গান হয় না। যে-ভাষা অক্ষর-শব্দ-বাক্যের বাঁধন ছাড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে সুরের দিকে ধাবিত হয় একমাত্র সেই কাব্য-ভাষার পক্ষে গান হয়ে ওঠা সম্ভব। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কবিতা মাত্রই গান হতে পারে না। গান হওয়ার মত সুরের দিকে প্রধাবিত আবেগসম্ভূত ভাষার আধার যে কবিতা শুধু কেবল সেই কবিতারই আছে গান হওয়ার যোগ্যতা। বলা বাহুল্য আমরা যাকে সনেট বলি, বাঙলায় যার নাম আমরা দিয়েছি চতুর্দশপদী কবিতা, এক সময় তার পিতৃপুরুষ ছিল সংগীত :

> In its first beginnings it was a lyrical poem, in the stricter sense of the term, being designed for a musical setting and sung to a musical accompaniment ;*

* Introduction : The Sonnets of Milton : John S. Smart পৃ:, ২

কিন্তু এর পর পরই এই গীতিকবিতাকে সনেটের আঙ্গিকে উত্তীর্ণ করা হয় :

> but it ceased to possess such uses when it became a refined poetic composition, possessing a weight and substance of reflection for which purely lyrical verse is inadequate.*

ঐ refined poetic composition হল সনেট। কোন্ কোন্ নিয়ম-রীতির শাসন-শর্তে সে রূপ পেল ?

> The poet conveys in it a certain idea, grave enough to give matter of thought to the reader, but brief enough to be contained with full and perfect expression, in the compass of fourteen lines. He speaks in his own person, reveals his own emotions and takes the reader into his confidence without reserve.†

বহিরাঙ্গের কলাকৌশলের শর্ত রক্ষার পর উল্লিখিত শর্তগুলো পালন করলে তবেই তা সনেট হবে। অর্থাৎ সনেট শুধু পংক্তিগত মিল রক্ষা করেই এবং চৌদ্দ লাইনের সংক্ষিপ্ত আকৃতিতে গঠিত হলেই হবে না তাকে এমন একটা ভাবনাকে শোষণ করে পুষ্ট হতে হবে যা grave enough to give matter of though to the reader এবং ভাবনার সেই প্রকাশ হবে full and perfect; আর সনেটের কবি যিনি তিনি ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ করবেন উত্তম-পুরুষের কণ্ঠে এবং অবগুণ্ঠিত থেকে পাঠককে নিয়ে যাবেন তাঁর ভাবনার হেরেমে।

সনেট তাই গান নয়। আঙ্গিকের দিক থেকে গীতি-কবিতার ভাস্কর্য-শিল্পিত রূপ সনেট। কিন্তু তা হলেও সনেটের ভাষা গীত-লাবণ্যহীন নয়। যদিও প্রমথ চৌধুরী অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের Lyric মূলতঃ গীতধর্মী—তার flow অসাধারণ সনেট হচ্ছে আমার মতে scultpture -ধর্মী—এর ভিতর

---

* প্রাগুক্ত
† প্রাগুক্ত

> উদ্দাম flow নেই। যেটুকু গতি আছে তা সংহত ও সংযত ; সনেটের ভিতর এমন কোনো তোড় নেই যা পাঠকের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সনেট প্রতিমাধর্মী। অবশ্য আমি এ-কথা বলতে চাইনে—আমার প্রতি সনেট একটি প্রতিমা। কিন্তু Dante প্রভৃতি বড় কবিদের গড়া সনেট তাই। এবং এর সৌন্দর্য অনেকটা technique--এর উপর নির্ভর করে। অবশ্য এর ভিতর যদি প্রাণ থাকে। সে প্রাণ অবশ্য সনেটের ভিতর অন্তঃশীলা ভাবে বয়। Emotion-কে লাগাম ছেড়ে দিলে সনেই গড়া যায় না। আমার এ মত গ্রাহ্য-কিনা তা অবশ্য বলতে পারো। একটি কথা কিন্তু ঠিক, সনেট গান নয়।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা সাধারণত লজিকাল। Emotion-এর চেয়ে তিনি তাঁর লেখায় বরাবর reason-এর দাম দিয়েছেন বেশী। কিন্তু উপরের ঐ লেখায় reason-এর চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতটা বেশী প্রকট হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের যেটা Lyric সেটা রবীন্দ্রনাথের 'গান' ঠিক নয় এবং রবীন্দ্রনাথের গানে emotion থাকলেও সে যে উচ্ছ্বাসময় নয় তা সকলেরই জানা। ঐ চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রমথ চৌধুরী আরো বলেছেন :

> কবিতা বস্তুকেই আমরা আর্টের কোঠায় ফেলি। সনেট এই আর্ট নামক গুণই প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিস। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় কবিদের কবিতায় emotion হয়ত আর্টকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে আছে। কিন্তু art অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী।

কথা হল ' emotion-কে লাগাম ছেড়ে দিলে সনেট গড়া যায় না' এ-কথা ঠিক কিন্তু emotion-কে লাগাম ছেড়ে দিলে কবিতা লেখা যায় কি ? আর 'প্রাণ অবশ্য সনেটের ভিতর অন্তঃশীলা ভাবে বয়' কথাটা মানলে flow কথাটাকে অস্বীকার করা যায় কি করে ? প্রথমে তাহলে আমাদের এই জিজ্ঞাসায় জাগতে হয় যে 'প্রাণ' বস্তুটা কি ? জড়ের সঙ্গে প্রাণীর পার্থক্য নিরূপণ করতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব প্রাণ বস্তুটা কি। অর্থাৎ যা সজীব, সচল, জীবনময় তাই প্রাণের আধার। এবং যেখানে সচলতা আছে, যেখানে জীবন আছে, যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে flow আসবেই। বস্তুত ভাস্কর -নির্মিত 'প্রতিমা' জড় বটে কিন্তু তাকে আমরা আর্ট বলতাম না যদি

না তার সৌন্দর্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হত। অন্যদিকে কবিতার emotion -টা একটা বড় জিনিস। এবং আবেগ মানেই উচ্ছ্বাস নয়। এবং আবেগ ও উচ্ছ্বাস শিল্পে সমার্থকও নয়। সুধীন দত্ত বলেছেন, 'মুখর আবেগ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে।'

সে যা হোক আমার বক্তব্য হল কবিতা নামক সনেট যেমন একটা আর্ট। কবিতা নামক 'গান' তেমনি একটা আর্ট। এবং নজরুল ইসলাম যে গজলগুলো লিখেছেন তা ঐ আর্টের উৎকৃষ্ট উপমা। সনেটের কলাকৌশল যেমন আয়াসে আয়ত্ত করতে হয় ঐ গানের আর্টও তেমনি ঐ কষ্টের অপেক্ষা রাখে। সনেটের যেমন চোদ্দ লাইনের পরিমাপ আছে গানের তেমনি সংক্ষিপ্ত, বিশেষ করে রেকর্ডকৃত, সময়ের পরিমাপ আছে।* যদিও দু'লাইনের একটি গানকে দু'ঘণ্টা ধরে গাওয়াও সম্ভব তবু গানের আকৃতি সনেটের মত খর্ব। এবং খর্ব বলে সনেটে যে সংযমের প্রয়োজন হয় সে সংযম গান রচনাতেও লাগে এবং বলা বাহুল্য গানে emotion যেমন লাগামহীন নয় তেমনি 'প্রাণ'ও তার মধ্যে অন্তঃশীলা। এবং বলা যেতে পারে গানে 'আবেগ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে।'

এখন J. S. Smart -এর কথা মিলিয়ে দেখা যাক। সনেটের মৌল সত্তা গানেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিনা। অর্থাৎ সনেট যেমন পাঠকের মনে ভাবনা জাগায় তেমনি গানও পাঠককে ভাবে ভাবিত করে কিনা। রবীন্দ্রনাথের গান যে চিন্তা জাগায় বিশ্ববাসী তা জানেন এবং যে কবি 'হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে, কুড়াই ঝরা ফুল একেলা আমি', লিখেছেন তিনিও পাঠকের ঐ ভাবনানদীতে যে ঢেউ জাগাতে সক্ষম সে কথা বলা বাহুল্য।

সনেটের ভাবনাগত দিক থেকে গানের সঙ্গে যে তার সম্বন্ধ নিকটতম সেটাও লক্ষ্য করবার বিষয়। উত্তম পুরুষের কণ্ঠে নিঃসঙ্গের যে সম্পর্ক সনেটের বিষয় গানেরও তাই। গানের কবি যেন নিজেকেই গান শোনায়। 'আমি' শব্দটি গানে প্রায়ই উহ্য থাকে না এবং মাঝে মাঝে কবি নিজেকেই

* নজরুলের অনেক গান আছে যেগুলো রেকর্ড-সময়ের পরিমাপে কুলোয় না। লক্ষ্য করা যায় সে কারণে কিছু কিছু গান দু'চার স্তবক বাদ দিয়ে গীত হয়। দীর্ঘ ঐ গান তাই বলে সংযমহীনতার স্বাক্ষর নয়।

'কবি' বলে সম্বোধন করেন। বলা বাহুল্য বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসে যে ভণিতা দেখি নজরুল ইসলাম কোনো কোনো গানে সে ভণিতার উত্তরাধিকার পেয়েছেন হাফেজ উমরের কাছ থেকে এবং এই জন্যই গানের কবিও সনেটের কবির মত speaks in his own person. সনেট গান নয় ঠিক কিন্তু গানের গুণ না থাকলেও ঐ 'প্রাণ' কথাটিকে আমরা সনেটে আবিষ্কার করতে পারব না। অপরদিকে emotion থাকলেও গানে পরিমিতির বন্ধন আছে, প্রমথ চৌধুরী যেটাকে আর্টের বন্ধন বলেছেন।

নজরুলের গানের প্রসঙ্গে দান্তের 'ভিটা নুভা'র কথা মনে পড়ে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'ভিটা নুভা'র 'প্রতিটি সনেট একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ছবি।' নজরুলের সঙ্গীত গ্রন্থগুলোর যে-কোনো জায়গা থেকে একটা গান তুলে দেখানো যায় যে তিনি এমনি ছবি কি-ভাবে এঁকেছেন :

শুক্‌নো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণিবায় ।
জল-তরঙ্গে ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল্‌
ঢেউ তুলে সে যায় ॥

দীঘির বুকের শতদল দলি',
ঝরায়ে বকুল চাঁপার কলি,
চঞ্চল ঝরনার জল ছলছলি'
মাঠের পথে সে ধায় ॥

বন-ফুল আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া,
আলুথালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া,
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া
ধূলি-ধূসর কায় ॥

ইরানী বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লীর প্রান্তর-বন-মনোহারিণী
ছুটে আসে সহসা গৈরিক-বরণী
বালুকার উড়ুনী গায় ॥

প্রকৃত বিষয়টি ঘূর্ণিবায়ু। কিন্তু গানটি দেখলেই একটি নৃত্যরতা সুন্দরী মেয়ের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ-গানটিতে বিশুদ্ধ ধ্বনিই কেবল শ্রুতিগাহ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য। দৃষ্টি ও শ্রুতির সীমা ছাড়িয়ে এর বিষয়-শরীরে সূক্ষ্ম প্রগাঢ় কোন মহৎ ভাবনার প্রতিবিম্বন ঘটেনি। সংগীত যেহেতু বিশুদ্ধ আর্ট এবং সেই অর্থে চিত্রকলাও সুতরাং এর মধ্যে চিন্তার গভীরতা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এতে একটির পর একটি চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে এর যে ছবি ফুটে উঠেছে সুরের মধ্য দিয়ে তাকে আশ্চর্য কৌশলে প্রকাশ করা হয়েছে। যিনি চিত্রশিল্পী অথবা সংগীত-শিল্পী তিনি এটুকুতেই খুশি কিন্তু যিনি ভাবনাশীল তিনি আর একটু বেশী প্রত্যাশা করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে শুধু ছবি কবিতা নয় তারও অতিরিক্ত কোনো বিষয়। সনেটে ঐ ভাব থাকে, গভীর কোন-বক্তব্য, কবির জীবনদর্শন। এবং বলা বাহুল্য গভীর বক্তব্যহীন বিষয়ের উপর সাধারণত সনেট লিখিত হয় না। গান অমন কোন কঠিন শর্তের মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু বহু গান আছে যেগুলো তাদের গভীর বক্তব্য, সংবেদনশীল ভাবের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। প্রসংগত আমরা যখন নজরুলের গানে শুনি 'কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী,' 'আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরীএ-কোন সোনার গাঁয়,' 'এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল,' 'মুসাফির মোছ এ আঁখিজল/ফিরে চল আপনারে নিয়া,' তখন সুর ছাড়াও গভীর এক একটা ভাবে আমরা আন্দোলিত হই এবং কবির অভিজ্ঞতানিসৃত বাণীর অমৃতে আমাদের চিত্ত স্পন্দিত হতে থাকে। ফলত সনেটের যেমন আছে আঙ্গিকের কঠিন শাসন তেমনি গানের আছে মিউজিক্যাল সেটিংয়ের শাসন—অন্ততঃ গানের বাণীটিকে নির্দিষ্ট পরিধির বৃত্তে আবর্তিত হতে হবে। সেই জন্যে মিল রক্ষায় সনেটেরই মতন গানকে ইচ্ছাধীন হবার উপায় নেই। কিন্তু ঐটুকুই নয়, ক্ষমতাবান কবি সনেটের চেয়েও কঠিন অনুশাসনের ভিতর রেখে গান সৃষ্টি করেন। নজরুলের দু'একটি গান উদ্ধৃত করে আঙ্গিক বিচার করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে :

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা-সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী
সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা॥

আগে মন	করলে চুরি
	মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা	এত যে ব্যথা
	তবু যেন তা' মধুতে মাখা ॥
চকোরী	দেখ্‌লে চাঁদে
	দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,
আজো বুদলে	ঝুলন ঝোলে
	তেমনি জলে চলে বলাকা ॥
বকুলের	তলায় দোদুল্‌
	কাজ্‌লা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী	কাঁখে গাগরী
	চরণ ভারি কোমর বাঁকা ॥
তরুরা	রিক্ত পাতা
	আস্‌লে লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গ'লে	ঝরেছে ব'লে
	ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা ॥
ডালে তোর	হান্‌লে আঘাত
	দস্‌রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে	অলি না ছুঁলে
	বনে কি দুলে ফুল- পতাকা ॥

মূলতঃ গানটি বারো লাইনের হলেও এখানে তাকে ভেঙে চব্বিশ লাইন করা হয়েছে। এর আঙ্গিক নৈপুণ্যের বিচার করতে গেলে গানটিকে বারো লাইনের কবিতা বলে ধরে নিতে হবে অর্থাৎ পংক্তিগুলো সাজাতে হবে এমনি করে :

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন করলে চুরি, মর্মে শেষে হান্‌লে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥*

অথবা তাকে এমনি সাজানো যায় :

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন করলে চুরি
মর্মে শেষে হানলে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥

কিন্তু ছন্দের ভাঁজ আলগা ক'রে কবিতাটিকে সাজালে কবিতাটির আকৃতি হবে এমনি :

ভুলি কেমনে
আজো যে মনে
বেদনা সনে
রহিল আঁকা ॥

আজো সজনী
দিন রজনী
সে বিনে গনি
তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন
করলে চুরি
মর্মে শেষে
হানলে ছুরি।

* 'নজরুল-গীতিকা'তেও গানটিকে এমনিভাবে সাজানো হয়েছে।

এত শঠতা
এত যে ব্যথা
তবু যেন তা
  মধুতে মাখা ॥

গানটিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর স্বরাচারী ছন্দের কোন পরিবর্তন হয়নি। সনেটের বেলাতেও ঐ ছন্দের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আঙ্গিকের পরিবর্তন হয় কি? মধুসূদনের একটি সনেটের উদাহরণ নেওয়া যাক:

কার সাথে তুলিবে, লো সুর-সুন্দরী,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?
হেরী অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনি রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে,
যবে কেলি করে তারা সুবাহ-অম্বরে!
কিন্তু কি অভাব তব, ওগো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!

পর্ব ভাগ করে সনেটটিকে কবিতাতেও রূপান্তরিত করা যায় যেমন:

কার সাথে তুলিবে,
  লো সুর-সুন্দরী,
ও রূপের ছটা কবি
  এ ভব-মন্ডলে?

আছে কি লো হেন খনি,
যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত,
কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী,
যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম
মণির উজ্জ্বলে ?—

উল্লিখিত রূপান্তরটা সম্পূর্ণ কষ্টকর। বস্তুতঃ উপরের গানটিতে মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্তের মিশ্রণ থাকাতেও ওর আঙ্গিককে রদবদল করেও ওর মৌল সত্তার পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সনেটগুলো অক্ষরবৃত্তে রচিত হয় বলে পর্ব ভাঙলে তার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পয়ারকে ভেঙে আভ্যন্তরীণ মিলে মিলে পর্বে-পর্বে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন যে চৌদ্দ অথবা আঠরো অক্ষরের পংক্তি আসলে কতকগুলো ছন্দযতির অস্বীকার। কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দকে চৌদ্দ অথবা আঠারো অক্ষরের পয়ারের পংক্তিতে উত্তীর্ণ করা যায় কি? 'বলাকা' কবিতাটির প্রথম পংক্তিটিই আঠারো মাত্রার: 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।' কিন্তু তার পরবর্তী পংক্তিটি 'আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা' চোদ্দ মাত্রার এবং তৃতীয় পংক্তিটি 'বাঁকা তলোয়ার' ছ'মাত্রার। তারপর চতুর্থ পংক্তিটি 'দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার' এবং পঞ্চম লাইনটি 'এল তার ভেসে আসা তারা ফুল নিয়ে কালো জলে' যথাক্রমে চোদ্দ ও আঠারো মাত্রার। অর্থাৎ এখানে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার অক্ষরের অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত বলে মাত্রার অনুশাসন মানা হয়নি এবং প্রথম পংক্তির মাপ অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিকে সংযুক্ত করলে অক্ষর কিংবা মাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় কুড়ি। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেই এটা করেছিলেন। কিন্তু অমনি ইচ্ছাকৃতভাবে মধুসূদনের পয়ার ভাঙা সম্ভব না। সম্ভব না এই জন্যে যে তার অন্তর্নিহিত মিল শব্দাক্ষরের সংগে শব্দাক্ষরের নয় ধ্বনির সংগে ধ্বনির। সুতরাং পর্বভাগে বিন্যস্ত ধ্বনির যতি ছাড়া মধুসূদনের পয়ার ভেঙে মুক্ত ছন্দে লেখা অসম্ভব।

পংক্তি শেষের কয়েকটি আক্ষরিক মিল ছাড়া সনেটে আনা সম্ভব নয় বলেই সনেটের আঙ্গিক কঠিন অনুশাসনে বন্দী। মনে রাখতে হবে সনেটের ঐ পংক্তিশেষের আক্ষরিক মিলটাই বড় কথা নয়, ওর পর্বান্তর্গত সাংগিতিক ধ্বনির মিলটাই বড় কথা। ঐ ধ্বনি একটা ক্রমিক সংখ্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে প্রবাহিত হতে হতে সনেটের প্রথম আট লাইনের পংক্তিতটে গিয়ে মিলিয়ে যায়। তারপর যেন একটা মোচড় খেয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে ষষ্টকের তীর থেকে তার মধ্যস্থলে পেঁছিয় এবং মধ্যবিন্দু স্পর্শ করে তীর্থ সমাপনে আবার সে স্বভূমির দিকে পা বাড়ায়। ঢেউয়ের এই যাতায়াতটা একটা অনির্বাণ গতির মধ্যে অবস্থান ক'রে একটা অপ্রতিরোধ আবেগকে আকর্ষণ করে। যতক্ষণ সে ঐ আবেগ উৎসৃজনে অক্ষম হয় ততক্ষণ সে দৃশ্যমান আঙ্গিকের রুক্ষ্ম সনেট হয় মাত্র কিন্তু মধুপর্ক কবিতা হয় না। সনেট যখন ঐ কবিতা হয় তখন তার সংগে সংগীতের কোন পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ মৌল অর্থে সনেটও সংগীত।

এখন দেখা যাক গান সনেটের মত কখনো কখনো একরৈখিক ভাবনার অনুসরণ করে খ-মধ্যে ধাবিত হয় কিনা। এবং নজরুল ইসলাম অমনি গান রচনা করেছেন কি না! জ্যামিতির উপপাদ্যের মত প্রথম পংক্তিতে একটি জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে অংকের ফল বের করার মত বিভিন্ন উপমা অথবা কারণ দর্শে শেষ লাইনে সনেট তার ফল মেলায়।

বলা বাহুল্য পেত্রার্ক, মিল্টন এবং কীটসের মত কেউ কেউ অষ্টক-ষষ্টকের আঙ্গিক মানলেও শেক্সপীয়ারের সনেটের আঙ্গিক অন্য রকম। তবু ভাবের জ্যামিতিক প্রশাসন শেক্সপীয়ারও মেনেছেন। কিন্তু তাই বলে সনেট যে কখনও স্তব-স্তোত্র-প্রার্থনা হয়নি তা নয়। এবং মিল্টন ত বটেই এমনকি বোদলোয়ার, মালার্মে ও কীট্সও ঐ স্তব রচনায় অংশ না নিয়ে পারেননি। বিষয়ের দিক থেকে যেমন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অথবা ফুল-পাখী-চাঁদকে নিয়ে সনেট লেখা যায় তেমনি ঐ ব্যক্তি অথবা আল্লার প্রতি ভক্তি-নিবেদন থেকে শুরু করে ফুল-পাখী-চাঁদ-তারাও গীতকারের হৃদয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত হয় না। এবং এই জন্যে নজরুলের 'চাঁদের দেশের পথ ভোলা ফুল চন্দ্রমল্লিকা', 'ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বউ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা', 'নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান', 'সাহা-রাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে

যারে আলোর নাচন', বিষয়ের দিক থেকে স্তুতিমূলক সনেটের মতই ভাবোদ্দীপক কবিতা।

বস্তুত সনেট যেমন গাণিতিক সূত্র ধরে এগোয় গানকেও অমনি তার নিয়মিত কাঠামোর মধ্যে পরিক্রম করতে হয়। এবং রাগের মিশ্রণ নজরুল ইসলাম কখনো কখনো ঘটালেও সুরের গতি লক্ষ্য করে তাঁকে বাণীর অশ্ব ছোটাতে হয়েছে। এবং যে-কোন অনভিজ্ঞ সংগীত শ্রোতার পক্ষে বোঝা কঠিন নয় 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' গানটির সুর কোথায় গিয়ে বাঁক নিচ্ছে। এমনি আবৃত্তি করলে প্রথম দু'টি লাইন (গ্রন্থে মুদ্রিত লাইন হিসেবে চারটি লাইন) মাত্রাবৃত্তের টানাটানা বিলম্বিত লয়ে পড়তে হয় এবং তৃতীয় লাইনে যেয়ে হঠাৎ স্বরবৃত্তের চটুল নৃত্যে উচ্চারণে দ্রুতির সৃষ্টি হয়। পুনরায় চতুর্থ লাইনে সে উল্টে ফিরে যায় আরম্ভ বিন্দুর দিকে। সম্পূর্ণ একটা বৃত্ত ঘোরার পর সেই একই পথে আবর্তন না করে একটা প্রশাখা পথে সে আবর্তিত হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। মাত্রাবৃত্তের একটানা গতির মধ্যে স্বরবৃত্তের এ-বাধাটুকু ইচ্ছাপ্রসূত এবং এখানে নজরুল ইসলাম শুধু কবি নন, কারিগরও বটেন, যাঁকে সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রতিটি বাঁক, কোণ এবং বৃত্তকে একই মাপে একই স্পেসে একই দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নির্মাণ করে নিতে হয়েছে, সে কোণ এবং নক্সা যেমন চোখের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন তেমনি গান বলে সুরের জন্য কানের কাছেও তার ঐ নিখুঁত পরিমাপ অত্যাবশ্যক। বলা বাহুল্য এখানে প্রতি পর্বশেষের আক্ষরিক এবং শব্দের ধ্বনিগত মিল ত বটেই, প্রতি বাঁকের মোচড়ে পংক্তি শেষের শব্দগত মিলের নিখাদ ধ্বনিও লক্ষ্যযোগ্য। বস্তুত সংগীতজ্ঞ হিসেবে তাঁর তালফেরতা জানা থাকাতে ছন্দ সহজ স্বাচ্ছন্দে ধরা দিয়েছে। কিন্তু ঐ গানের সংযত কারিগরীর নৈপুণ্য বোধ হয় শেষ কথা নয়। এটুকু ছাড়িয়ে এসে ওর অন্তর্গত অর্থের সাথে সাথে শব্দ ব্যবহারের দিকে তাকালে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের চোখে পড়বে। আমি শেষের চারটি লাইন কবিত্ব শক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন বলেই মনে করি। প্রেম সুন্দর, বেদনা ও আঘাতে প্রেমিকের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হলেও সে ঐ সুন্দরের স্তব থেকে প্রত্যাবর্তন করে না বরং আঘাতের বিনিময়ে সে উপহার দেয় সুন্দরকে। 'যা সত্য তাই সুন্দর' সেই সত্যসুন্দর সুখের পথ ধরে আসে না। শীতের হিমেল নিঃশ্বাসে গাছের পাতাঝরা দেখেই আমরা বুঝি যে এর পরবর্তী কালটা বসন্তের—যখন

ফুল ফুটবে। তেমনি ফল জন্মাবার সাথে সাথে ফুলের ঝরে যাওয়া দেখে আমরা বুঝি ফুল মৃত্যুকে বরণ করেই ফলের আগমনের পথ তৈরী করল। অমনি ফুলভরা শাখায় আঘাত করলেই তবে ফুল ঝরে এবং ফুলের জন্মের কারণ ত আসব অন্বেষণে পতঙ্গের পুষ্পে-পুষ্পে বিচরণে রেণুর বিচ্ছুরণ। মুকুলে অলি না বসলে ফুলের পক্ষে গর্ভধারণ সম্ভব হত না এবং নতুন ফুলেরও জন্ম হত না। এই যে ফুলে-ফুলে বন ভরে যাচ্ছে সে ত অলির স্পর্শাঘাতেরই কারণে। তেমনি কবির ব্যথারূপ মুকুলে প্রেমের বেদনার আঘাত লাগে বলেই ত তার পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই বিপুল সৃষ্টির উৎস সন্ধান করলে আমাদের চোখে ঐ বেদনাসুন্দরের রূপ ধরা পড়বে। কবির বক্তব্যের ঐ গূঢ়ার্থের সংগে সংগে এখানে কবির সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি এবং অলংকার প্রয়োগের কৌশল চোখ এড়ায় না। কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে এতগুলো বিষয়ের সমন্বয় বিরলদৃষ্ট। সংযম অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞাদৃষ্টি শিল্প-সচেতনতা এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান ভিন্ন এই ধরনের সৃষ্টি অসম্ভব। এবং আনন্দের কথা নজরুলে এই রকমের সৃষ্টি সামান্য নয়।

ফলত অপূর্ববস্তনির্মাণবাদীরা যে বলেন, সংগীত আবেগনিষ্কৃতি নয় আরটিটেকচার অব সাউন্ড অর্থাৎ ভাবের অভিব্যঞ্জনা না ঘটিয়ে কেবল শব্দের ইমারত দিয়ে সংগীত রচিত হয়—আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রাসংগিক বিষয় হিসেবে সে সম্বন্ধে কিছু বলে এ-প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটাবো। কবিতার কথা বাদ দিয়ে যে গান সে গান শব্দ-ধ্বনির ইমারত (architecture of sound)শব্দের ইমারত (architecture of words) নয়, সে গানে আবেগ অথবা অনুভূতির সংশ্লেষ অত্যাবশ্যক বিষয় নয়। বস্তুত ঐ ইউরোপীয় মতানুযায়ী ধ্বনিই তার অপূর্ব বিন্যাসের দ্বারা শ্রোতার মনে ভাব উদ্রেকে পারঙ্গম। ঐ মত অংশত আমরাও স্বীকার করি এবং লক্ষ্য করি যে গান অতএব নির্মাণকুশলতারই অবদান। কিন্তু বলেছি কথাটা অংশত সত্য হলেও সর্বাংশে, অন্তত আমাদের কাছে, সত্য নয়। সত্য নয় এই জন্যে যে, ভাবের, বক্তব্যের এবং আবেগের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বিনা গান যে মনো-ত্তীর্ণ হতে অক্ষম তার অনেক উদাহরণ আধুনিক গানে মিলবে। আধুনিক গানে ঐ architecture of sound এর নৈপুণ্য দেখিয়ে কখনও কখনও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু সে সৌন্দর্য গভীর চেতনা-

প্রস্তুত না হওয়ায় এবং কবিতার প্রাথমিক শর্ত পালনে অক্ষম হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা সদ্যোপাতী অম্বুবিম্ব।

অর্থাৎ আমাদের ধারণায় হঠযোগী নয়, যোগীর ধ্যানই গান। যাতে থাকবে ধ্বনির অপূর্ব বিন্যাসের সংগে সংহত আবেগ এবং ভাবনার সংমিশ্রণ। নজরুল ইসলামের গানে রিদম, মেলোডি আর হারমনির সংগে ঐ সংযত আবেগের প্রকাশ লক্ষণীয়। শিল্পের ঐ কঠিন অনুশাসনে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্য নির্মাণে সক্ষম বলে আমরা তাঁকে উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবি বলি না, বলি মহত্তম কবি-শিল্পী।

নজরুল একাডেমী পত্রিকা
গ্রীষ্ম : ১৩৭৭

মাতৃভাষা

ইংরেজী ভাষার কবিতা পড়তে গিয়ে আমার অনেকবার মনে হয়েছে আমি কি কবিতাটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পেরেছি যেমন রবীন্দ্রনাথের নজরুল ইসলামের কিম্বা অন্যান্য বাঙালী কবিদের কবিতার পুরোপুরি স্বাদ পাই ? আমার মনে হয় পারিনি। ইংরেজী ভাষাটাকে যথেষ্ট বুঝি না বলে যে ইংরেজী কবিতা পড়ে তেমন স্বাদ পাই না, সে-কথাটাও আমার মানতে আপত্তি আছে। তার কারণ খুব ভাল করে একটা কবিতার অর্থ বুঝে নিয়েও আরও কিছু অর্থ বুঝতে বাকি থাকে। আমার মনে হয় সেই অতিরিক্ত বস্তুটিই কবিতার সারকথা এবং সারটুকু বোধ করি একমাত্র মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার কবিতা পড়ে পাওয়া যায় না। আমি অনুভূতির স্বাদের কথা বলছি।

কেন যায় না ? যায় না এই জন্যে যে কবিতা শুধু অর্থের সিঁড়ি বেয়ে হৃদয়ে পেঁৗছে না, আরও অনেক অনুষঙ্গের স্রোতে মিশে হৃদয়ে পেঁৗছে। অনুষঙ্গগুলো কি ? আবহাওয়া, ভৌগোলিক পরিবেশ, ঐতিহ্য, লোক-সংস্কৃতি, পুরাণ, পরিচিত ধ্বনি, পরিচিত শব্দ, পরিচিত রঙ এইসব এবং আরও সুক্ষ্ম কিছু যা কেবল অনুভূতি বলতে পারে, ভাষা পারে না।

এই সব গুলোর জন্য চোখ এবং কান ত আছেই তাছাড়া আছে ইন্দ্রিয়গত স্পর্শানুভূতি। পাখী, ফুল, গন্ধ, গান এসব ঐ পথ ধরে আসে, আসে আকাশ, নদী, বন, পর্বত আর তাদের বিচিত্র রূপ, যেগুলো চোখে পড়ে ; আর সব কাহিনী জন-শ্রুতি প্রবাদ যা সব স্মৃতিতে গেঁথে থাকে।

দেশ, কাল, পাত্র আসে সাথে, আসে ধর্ম-কাহিনী, ধর্মানুভূতি, জাতিগত বিশ্বাস। আর একটা কথা এমন কতকগুলো রং এবং এমন কতকগুলো ধ্বনি থাকে যা শুধু শব্দের রং ও ধ্বনি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। যেটা শেখার ব্যাপার নয়, যেটা অন্তরঙ্গতার ব্যাপার, অভিজ্ঞতার ব্যাপার, স্মৃতির ব্যাপার এবং ভালবাসার ব্যাপার।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত একটি জাপানী কবিতার অনুবাদ পড়ে আমরা আনন্দ পাই, সুধীন দত্ত-কৃত হাইনের কবিতার অনুবাদ পড়ে আমরা খুশী হই, বুদ্ধদেব বসুর অনূদিত বোদলেয়ারের কবিতা পড়ে আমরা রোমান্স অনুভব করি, কেননা সেটাকে আমরা মাতৃভাষায় পেয়েছি। কিন্তু মাতৃ-ভাষার কাব্য গীতাঞ্জলি যখন ইংরেজীতে অনুবাদ হল তখন আমরা সেই ইংরেজী পড়ে আর গীতাঞ্জলি পড়ার আমোদ পেলাম না। কি হারিয়ে গেছে ঐ অনুবাদে ?

উত্তর সহজ। আছে নাকি বাংলার বর্ষা, শরৎ, তার আকাশ, তার মেঘ, তার প্রকৃতি, তার দাদুরির রাত্রিকালীন মহাসঙ্গীতের ধ্বনি ঐ অনু-বাদে ? আছে নাকি রাধিকার অভিসারের গোপন রোমান্স, আর যে বাঁশী বাজাত শ্যাম তার প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে তার সুর বাতাসে মিশে ? বাংলা কবিতায় আছে। শ্যাম বর্ণটিকে অনুবাদ করে যখন গ্রীন লিখি তখন একটা সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় ; শ্যাম ত শুধু একটা বর্ণ নয়, সেত সবুজ নয়, তার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে বংশীধারী প্রেমিক কৃষ্ণের রূপচ্ছবি।

ঐ জন্যই হাইনের কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ (এবং আরও কেউ কেউ কোন কোন বিদেশী কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে) দেশীয় সংস্কৃতির, দেশজ শিল্প এবং ঐতিহ্যের ছাপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন :

কোনারকের সুন্দরীদের পাছা বেজায় ভারী
বাঙালীদের নেইকো আবার নাকের বাড়াবাড়ি।

সুধীন্দ্রনাথের অনূদিত এই কবিতাংশের কোনারক কিংবা বাঙালীর নাক স্বাদেশিক।

হাইনের কবিতায় এইসব ছিল না। তাই হয়ত এ দুটি লাইনকে অথবা সম্পূর্ণ কবিতাটিকে অনুবাদ না বলে সুধীন দত্তের নিজের কবিতা বলতে হয়। বলতে হয় এ আর একটা বাংলা কবিতা। এবং অনুবাদ যতক্ষণ আর একটা কবিতা না হয় ততক্ষণ সে হৃদয়-গ্রাহ্যও হয় না। এই কথাটাকে যদি স্বীকার করি তাহলে বুঝতে পারব যে স্বদেশী ভাষার উপ-লব্ধি আমাদের মনে কতটা স্থান দখল করে থাকে।

আমি দেখেছি আমাদের সমাজে এক দল লোক আছেন যাঁদের কাছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি অধিকতর প্রিয়। আচারে-ব্যবহারে, রুচিতে-অভিরুচিতে, পোশাকে-আশাকে, কথায়-বার্তায় এমনকি উচ্চারণে পর্যন্ত ঐ সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেন। তাঁদের বাড়িতে রেডীও বাজলে অধিকাংশ সময় সেন্টার ধরা থাকে ইউরোপ অথবা আমেরিকার কোন স্টেশনে যেখান থেকে প্রতীচ্যের ভাষা এবং সঙ্গীত ভেসে আসে। আমি জানি না তাঁদের কাছেও তাঁদের মাতৃভাষার চেয়েও ঐসব পরদেশী ভাষা বেশী পরিচিত কিনা এবং তাঁদের কাছে ঐ ভাষার কবিতাও সম্পূর্ণ স্বাদ বয়ে নিয়ে আসে কি না। হয়ত আসে, কেননা আমি আবু সয়ীদ আইয়ুবকে ইংরেজী গীতাঞ্জলির প্রশংসা করতে দেখেছি। তিনি নাকি মুগ্ধ হয়ে পাঠ করতেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব অবাঙালী, তাঁর মাতৃভাষা উর্দু, তাই প্রথম থেকে বাঙলা ভাষায় তিনি লেখাপড়া করেননি, যেটা বাঙালী সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বেলাতেও ঘটেছিল, পরবর্তীকালে এঁদের দুজনকেই বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে দেখেছি।

একেবারে শিশুকাল থেকে ইংরেজী আচার-আচরণ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা এবং উচ্চারণের অনুকরণের ফলে হয়ত সেই ভাষার নাড়ীর স্পন্দন তাঁদের অন্তরঙ্গ হয় এবং ঐ বন্ধুত্বের পথে সে হয়ত ভাষার অন্তরনিঃসৃত অমৃতের স্বাদ পায়—আমাদের কাছে যা অনুভূত হয় না। কিন্তু তখন তার মাতৃভাষাকে আর বাঙলা বলা যায় না কিছুতেই। বিদেশী ভাষাকে ধাত্রীদুগ্ধের মত পান করে সে ঐ ভাষাকে মাতৃভাষার সমান করে নিতে পেরেছিল বলেই, তার সঙ্গে তার একটা গোপন নিবিড় আসক্তি জন্মেছিল বলেই, সে তার আত্মার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল বলেই, ঐ ভাষাকে সে মাতৃভাষার মত নিবিড় করে পেয়েছিল। তবু বলি সে নিবিড়তা কি ঘনিষ্ঠভাবে নিবিড় ?

অন্তত একজন মহামান্য কবির কথা মনে পড়ে যায় এই প্রসঙ্গে। মহাকবি মধুসূদনের কথা। ইংরেজী ভাষাকে তিনি ভালবেসেছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যকে, তার কাব্যকে। ইংরেজ কবি হওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ধর্ম ছেড়েছিলেন, জননীর বিপুল স্নেহকে পর্যন্ত ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজী তাঁর ধ্যান ছিল, জ্ঞান ছিল, নিদ্রায়, জাগরণে অহর্নিশি তারই স্বপ্ন দেখে সময় কাটত তাঁর। তবু তাঁর অন্তরের

রহস্য তিনি উন্মোচন করতে পারেননি। বিদেশী ভাষায় লাভবান হলেও তিনি তাঁর বৈমাত্র সুলভ আচরণকে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন ; তাই মাতৃভাষার প্রশস্তি গেয়ে বলেছিলেন :

হে-বঙ্গ-ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন !

ভাল ইংরেজী রবীন্দ্রনাথও লিখতেন। ইংরেজী সাহিত্যে তিনি ডক্টরেট না পেলেও অনেক ডক্টরেটকে শেখাবার স্পর্ধা রাখতেন তিনি। তবু ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজী লিখতে নিষেধ করেছিলেন এক সময়। এর কারণ কি কোন গোপন ঈর্ষা ? আমার তা মনে হয় না। গীতাঞ্জলির ভক্ত-পাঠক ইয়েটস ধরতে পেরেছিলেন কোথাকার সেই গোপন দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনায় আসন পেতেছে। সত্য-কথাই বলেছিলেন ইয়েটস। তবু হয়ত বিতর্কের অবকাশ আছে। বলবেন কেউ যে উর্দুভাষী হয়েও ইক-বাল কি করে ফারসী ভাষায় কাব্য রচনা করলেন ? আমি ফরাসী জানি না, জানলে দেখতাম ইকবাল কতটা সার্থক তাঁর ফারসী কবিতায়। হয়ত সার্থক তিনি যখন ফারসী ভাষীরাও তাঁর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেখানেও একটু কথা আছে। আর তা হল ফারসীটা বোধ হয় ইকবালের কাছে ঠিক বিদেশী ভাষা নয়। যেমন আমাদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ঠিক বিদেশী ভাষা নয়। যে-কারণে বৈষ্ণব কবিদের এবং ষোল বছরের রবীন্দ্র-নাথের রচিত ভানুসিংহের পদাবলী আমরা বাংলা কবিতার মতই উপভোগ করতে পারি। এ-প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করব। ইউরোপের ভাষাগুলো ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাভাষীর কাছে অল্পাধিক পরিচিত। সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকার সঙ্গীতের নোটেশান বোধকরি একই রকমের। সেই পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে আক্রান্ত মানুষের কাছে ভাষার পার্থক্যটা ধ্বনির সাম্যের দ্বারা দূর হয়, একজন প্রতীচ্যের কবির কবিতা, তা তিনি যে দেশেরই হোন না কেন, যে-কোন প্রতীচ্যবাসীর হৃদয় স্পর্শ করবে, যেমন আমাদের প্রাচ্যবাসীদের কানে প্রাচ্য সঙ্গীত কিছুটা করে।

অন্তত মধ্য এশিয়া, আরব, ইরান ভূমির সংস্কৃতির গভীর যোগাযোগের ফলে আমরা এমন এক সংস্কৃতির বর্তমানে উত্তরাধিকারী যার কাছে ধ্বনির জন্যও উর্দু-ফারসী কবিতার আস্বাদ পাওয়া বিচিত্র নয়। আমরা দেখেছিও,

উর্দু এবং হিন্দী গান—সে ভাষার সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও, আমাদের প্রাণে ব্যাপক আবেদন বয়ে নিয়ে আসে, অথচ তার চেয়ে বেশী ইংরেজী জেনেও আমরা ইংরেজী গানের আবেদনে তেমন সাড়া দিতে পারি না। হয়ত পারতাম আরও অনেক কাল, অনেক বছর ধরে সে যদি আমাদের সংস্কৃতির রক্তে-মাংসে সংস্কৃত হয়ে, আরবী-ফারসী শব্দের মত মিশে যেতে পারত। কিন্তু তার আগেই সে এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে।

বলা বাহুল্য ভারতীয় সংগীতের নোটেশন আর বাংলা সংগীতের নোটেশন ভিন্ন নয়। যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করেন তাঁদের উর্দু ও হিন্দী ভাষার মাধ্যমে তার মজ্জাকে উদরস্থ করতে হয়। বাংলার রাগ-সংগীতের ধারায় তার রক্ত প্রবাহিত বলে ঐ ধ্বনির সংগে আমাদের পরিচয় রক্তের সম্বন্ধের এবং তাই উর্দু ও হিন্দী ভাষা ভিন্ন হলেও ইউরোপীয় ভাষার মত বৈমাত্রিক নয়।

যে প্রসঙ্গ থেকে যে প্রসঙ্গে এলাম তার মধ্যে একটা সুতো আছে—মালায় যেমন থাকে। অর্থাৎ আমার যেটা মাতৃভাষা সে স্বতন্ত্র বটে কিন্তু কারো কারো রক্ত তার ধমনীতে আছে। সেই রক্ত সম্পর্কের ভাষাগুলো ছাড়া অন্য ভাষার আবেদন আমাদের কাছে ততখানি গ্রাহ্য নয়। আর যেগুলো গ্রাহ্য বলে মনে করি সেগুলো আমাদের আত্মীয় হলেও পরমাত্মীয় নয় ; তাই তাদের সংগেও আমাদের হৃদয়ের কিছুটা দূরত্ব থাকে বৈ কি ! প্রত্যক্ষ গভীর আবেদন শুধু মাতৃভাষাতেই পেতে পারি। কেননা তার রক্তের সংগে আমাদের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন।

দৈনিক পাকিস্তান
২১শে ফেব্রুয়ারী
১৯৭০

কবিতার শব্দগত এবং ধ্বনিগত মিল যে অপার সৌন্দর্য বহন করে তার প্রমাণ হল কবিতা কখনো অনূদিত হয় না। একটা কবিতার ভার, ভাবনা অন্য ভাষায় হয়ত কিছুটা নেওয়া সম্ভব কিন্তু যে অপরূপ শব্দের, ছন্দের এবং ধ্বনির উপর নির্ভর করে সমস্ত কবিতাটির আত্মা গড়ে ওঠে তাকে রূপায়িত করা অসম্ভব। বলা যায় কবিতাকে নতুন করে সৃষ্টি করা যায় মাত্র কিন্তু আসল কবিতাটিকে অবিকলভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা যায় না।

গীতাঞ্জলির যে অনুবাদ পড়ে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ পাঠক মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই বাংলা গীতাঞ্জলির কাব্য-সৌন্দর্যের বিচার করেননি। এবং ইংরেজী গীতাঞ্জলির কাব্য-সৌন্দর্যের বিচারে তাঁরা নিক্তি নিয়ে বসলে তাকে কোনো পুরস্কারযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচনা করতে পারতেন কিনা সেটা ইংরেজ-পাঠকই জানেন ।

কথাটা আর একটু বিশদ করা যাক। হাইনের একটা কবিতাকে অনুবাদ করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন :

> ব্যাধের হাতে মারা গেলেন কৃষ্ণ-ভগবান
> তানসেনও সে কলমা পড়ে হ'ল মুসলমান।

হাইনের কবিতায় ঐ কৃষ্ণ, ভগবান, তানসেন, মুসলমান কিছুই ছিল না। তাহলে অনুবাদটা কিসের হল? শব্দের, অর্থের অথবা ভাবার্থের?

যদি ভাবার্থের মূল্য দেওয়া হয় তা'হলে আর কবিতার ফর্মের মূল্য থাকে না। অথচ কাব্য-সৌন্দর্যের মূল্য এবং মান নির্ণয়ে আঙ্গিকের অথবা ফর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির গদ্যানুবাদ করেছিলেন কাব্যিক ইংরেজী ভাষায়। তাতে কবিতার অন্তর্নিহিত আইডিয়ার হয়ত মৃত্যু ঘটেনি, যে বাণী তিনি দুনিয়াকে দিতে চেয়েছেন তাও হয়ত তার মধ্যে বিরাজিত

কিন্তু ঘুরে ঘুরে মাধুর্যের তরঙ্গে যে অর্থ ব্যাপকভাবে, গভীরভাবে পাঠক-চিত্তে গিয়ে দোলা দেয় এবং অনেক অপ্রকটিত প্রচ্ছন্ন চিত্রের পর্দা উন্মোচন ক'রে তাকে এক অদৃশ্য আলোক-সাগরে টেনে নিয়ে যায় গদ্যের ঐ স্পষ্ট নগ্নমূর্তিতে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কি ?

তা যে পাওয়া যায় না তার কয়েকটি উদাহরণ আমরা দিতে চেষ্টা করব। বোদলেয়ারের Le Beau Navire (সুন্দর জাহাজ) কবিতাটিকে বাংলায় বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করেছেন এবং ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন Roy Campbell. দু'জন অনুবাদকই অবশ্য মূল কবিতার কাব্য সৌন্দর্যটুকু, অর্থাৎ এর ছন্দ, ধ্বনি, আঙ্গিক প্রতিটি অঙ্গরাগ ঠিক রাখার চেষ্টা করেছেন। তবু তার ভিতর থেকে দু'জনেই যে মূল কবিতা থেকে দু'দিকে ছিটকে পড়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মূল ফরাসী কবিতাটির একটি স্তবক এমনি :

Tes bras, qui se joueraient des precoces hercules,
Sont des boas luisants les solides emules,
Faits pour serrer obstinement,
Comme pour l'imprimer dans ton coeur, ton amant.

অর্থ হল : তোমার যুগল বাহুর তুলনা হয় না শিশু হার্কিউলিসের সংগে, দ্যুতিমান অজগরেরই যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী তারা। প্রেমিকের মুখচ্ছবি তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত করতে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে বাঁধার জন্য যেন তার সৃষ্টি।

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ হল :

প্রবল নায়কের বিরোধী খেলোয়াড় অকাতর,
ও-দু'টি বাহু যেন কান্তি ঝলকিত অজগর,
প্রেমিক বাঁধা পড়ে, ক্ষমাহীন
অতি কঠিন তোর হৃদয় কারাগারে, চিরদিন।

এবং Roy Campbell করেছেন এইভাবে :

Your arms precocious Hercules would grace
And vie with phythons in their bright embrace :
The pressure they impart
Would print your lover's image on your heart.

এখন বুদ্ধদেবের কবিতাংশের অর্থ কি দাঁড়াল : বলবান নায়কের সংগে খেলা করে প্রতিপক্ষ (নায়িকা) কাতর হন না ; তার বাহু দু'টি যেন অজগরের মত কান্তি ঝলকিত ; হে প্রেমিকা, তোমার ক্ষমাহীন কঠিন হৃদয়-কারাগারে চিরদিনের জন্যে প্রেমিক বাঁধা পড়ে।

এবং ক্যাম্পবেলের কবিতার অর্থ হয় এই : বালপ্রৌঢ় হারকিউলিসের মত তোমার বাহুদ্বয় উজ্জ্বল আলিঙ্গনে অজগরের প্রতিদ্বন্দ্বী ; আলিঙ্গনের সময় ওরা যে-ভাবে চাপ দেবে তাতে তোমার প্রেমিকের রূপচ্ছবি তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যাবে।

অর্থের দিক থেকে ক্যাম্পবেল মূল কবিতার কাছাকাছি আছেন প্রায় কিন্তু বুদ্ধদেব বসু কিছুটা দূরে সরে গেছেন। ভাবগত দিক থেকে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-সৌন্দর্য বেশী নষ্ট হয়েছে বলা চলে না। আসল কবিতার precoces Hercules কে তিনি প্রবল নায়ক বানিয়েছেন। এতে অসুবিধা হয়েছে এই যে, হারকিউলসের সংগে শক্তির যে একটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা ঐ 'প্রবল নায়ক' সৃষ্টি করতে পারে না। যে বাহুর নির্মম আলিঙ্গনে প্রেমিকের রূপচ্ছবি চিরদিনের জন্যে প্রেমিকার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে যাবে সে বাহুর ক্ষমতা যে অকল্পনীয়ভাবে তুলনা-হীন সে-কথা বলাই বাহুল্য। এবং সেই অচিন্ত্যনীয় ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে 'হারকিউলিস' এবং 'অজগর' ব্যবহার করে বোদলেয়ার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির এবং দিব্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমত গ্রীক পুরাণের শক্তির দেবতা হারকিউলিস ; অতএব তার কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সেই ভয়ংকর ক্ষমতাশালী পুরুষের সমস্ত যুদ্ধ এবং কর্মকাণ্ডের রূপকল্প উপমেয়ের শক্তির চরম তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা প্রমাণ করবে। দ্বিতীয়ত 'অজগর' শব্দের সংগে সংগে পাঠকের চিত্তে ভেসে উঠবে সেই ক্ষুধিত সাপের কথা যার খপ্পরে পড়লে তার প্যাঁচ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারার ক্ষমতা নেই কোন জীবের। বুদ্ধদেব বসু প্রথম উপমানটা রাখেননি, দ্বিতীয়টা রেখেছেন। যাতে মূল কবিতার কিছুটা সৌন্দর্য তিনি আটকাতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু ছন্দের জন্য তিনি প্রথম উপমানটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। বস্তুত ঐ হারকিউলিস শব্দটা রাখতে গেলে বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের কবিতার ফর্মটা আর রাখতে পারতেন না ; তাহলে তাঁর মৌল উদ্দেশ্যটা নষ্ট হত। অর্থাৎ আঙ্গিকের ভিতর থেকে যে

সৌন্দর্যটা ফোটে তাহলে সেটা মারা যায়। অন্তত ছন্দের দোলায় এবং সমশ্রেণীর ধ্বনিসৃষ্টির মাধ্যমে কবিতাটার কিছুটা সাদৃশ্য বজায় রাখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদকে কিছুটা মেনে নেওয়া গেলেও উদ্ধৃত কবিতাংশের শেষ দুটো লাইনকে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধদেব বসুর আবিষ্কৃত চরণ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসু এখানে অনুবাদে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েছেন। প্রেমিকার ক্ষমাহীন কঠিন হৃদয় কারাগারে চিরদিনের জন্য প্রেমিক বাঁধা পড়বে বোদ-লেয়ার ত সে চিত্রকল্প আমাদের চোখের সামনে ধরেননি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'বর প্রার্থনা' নামক একটি জাপানী কবিতার বাংলা অনুবাদে একস্থানে লিখেছিলেন

দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম।

সেই বুকে, সেই হিয়ার অতলে প্রেমিকার সুতীব্র আলিঙ্গনে প্রেমি-কারই হৃদয়ে প্রেমিক পুরুষের মূর্তি চিরতরে মুদ্রিত হয়ে যায়।

এখানে সুন্দর রমণীর বাহুদ্বয়কে বোদলেয়ার প্রাচ্য কবিদের, বিশেষ করে বাঙালী কবিদের, মত মৃণালের সংগে তুলনা করেননি। মৃণালের সংগে রমণী-বাহুর তুলনা করলে তার কমনীয় সৌন্দর্যের দিকটাই শুধু চোখে পড়ে কিন্তু তার সংগে ব্যক্তির কোন ইমেজ গড়ে ওঠে না মনে। কিন্তু অজ-গরের সংগে সংগে রমণীবাহুর রূপের দুর্জয় ক্ষমতা ভেসে ওঠে। যে রূপে বলিষ্ঠ পুরুষের পৌরুষ দুর্বল হয়ে যায়, দ্রব হয়ে তার শির লুটিয়ে পড়ে তার পাদপদ্মে, সে রূপ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পেলব কমনীয় হলেও তার আভ্য-ন্তরীণ ক্ষমতা অসীম। একটা দুর্দান্ত পুরুষকে আটকাবার জন্য ঐ নারকীয় রূপই যথেষ্ট। ঐ অন্তর্নিহিত অর্থটাকে রূপ দিতে গিয়েই হয়ত বুদ্ধদেব বসু 'অতি কঠিন তোর হৃদয় কারাগার' লিখেছেন। কিন্তু এটা আরও বেশী অপ্রাসংগিক এই জন্যে যে এখানে পুরুষকে আটকাবার জন্যে কঠিন হৃদয়ের কারাগারের প্রয়োজনই ছিল না।

প্রসংগত বুদ্ধদেব বসুর এই কাণ্ড করার কারণও বোঝা যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিধ্বনির আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন :

> তাঁরই কবিতার অনুবাদে আমাদের আগ্রহ জাগে, যাঁর মধ্যে যেন নিজেরই একটা সম্ভাবনার উন্মীলন দেখতে পাই, যাঁর বিষয়ে একবার অন্তত মনে মনে বলি—'আহা, আমি যদি উনি হতুম।' কিন্তু এই ঐক্যবোধের ফলেই মনের মধ্যে অন্য একটি ভাবও জেগে ওঠে, মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয়—'আহা, উনি এ-কথাটা কেন বললেন না।' অর্থাৎ অনুবাদের শ্রমসূত্রে কবির নিজের ভাবনাও সজীব হয়ে ওঠে, কখনো কখনো তার ইচ্ছে হয় মূল কবিকে মুখোশের মত ব্যবহার করে ফাঁকে ফাঁকে নিজেরই কথা উচ্চারণ করবার।

সম্ভবত বুদ্ধদেব বসু সেই নিজের কথাই উপরোদ্ধৃত কবিতায় ফাঁক বুঝে চালিয়ে দিয়েছেন। সেটা যে খারাপ হয়েছে তা নয় এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শেক্সপীয়রকে অথবা হাইনেকে অনুবাদ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েও যে সেই স্বাদ উপঢৌকন দিতে সমর্থ হয়েছেন তাও ঠিক। কিন্তু আমার যে মৌল প্রশ্ন এতে ত তার উত্তর হল না। উত্তর না হওয়ার কারণ বোঝাবার জন্যে আমাকে আরও এক কদম সামনে যেতে হচ্ছে।

আমীর হোসেন চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের একটি গানের এমনিভাবে অনুবাদ করেছিলেন :

> That who conceals Herself escaping from right
> And beckoning from far distance away
> Does She surrender Herself today through the
> sweet melody of this Spring-song ?

কবিতার মূল চেহারাটি ছিল এমনি :

> সে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
> ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে
> সে কি আজ দিলো ধরা গন্ধে ভরা
> বসন্তের ঐ সঙ্গীতে।

ঐ যে ভিতরে অক্ষরগত, ধ্বনিগত মিল, ঐ যে শৃংখলিত শব্দে দুলে দুলে এগিয়ে চলা, এবং একটা অধরা রূপকে তা থেকে ফুটিয়ে তোলা, সে কি উপরোক্ত অনুবাদটিতে ফুটতে পেরেছে।

বলছি অনুবাদ হাজার সুন্দর হলেও মূল কবিতার সৌন্দর্য তাতে ফুটে উঠবে কি না। এবং অনুবাদ সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণুদে কি Hollowmen এর অংগ নির্মাণ কৌশলের মাধুর্য পাঠককে উপহার দিতে পেরেছেন? অর্থাৎ আমরা কি

Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the shadow
For thine is the kingdom-এর

অনুবাদ

বাসনা আর তৃপ্তির মধ্যে
বীজ আর সত্তার মধ্যে
তত্ত্ব আর অবতারের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই ত সব মায়া।

পড়ে মূল কবিতার সবটুকুই পেয়েছি একেবারে কিছু না হারিয়ে? হয়ত খুব বেশী কিছু আমরা হারাইনি। হারাইনি কেননা ওর মধ্যে ছিল কথোপ-কথনের ভঙ্গি। ভাষা ছিল নির্ভার, ধ্বনি-নির্ভর হয়। কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি:

দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেইক্ষণে দেয় ভরি

মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল
বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল—

স্তবকটির সচ্ছন্দ অনুবাদ কিছুতেই সম্ভব না এবং তা নয় বলে রবীন্দ্রনাথ T. S. Eliot-এর কবিতার বাংলা অনুবাদে সাফল্য দেখালেও অন্তত গীতাঞ্জলির অনুবাদে সেই গীত-ধ্বনির মাধুরিমা বিলাতে পারেননি। না পারার কারণ কি এই যে খাঁটি কবিতার অনুবাদ একেবারেই অসম্ভব এবং নিম্নোক্ত কবিতাংশের অনুবাদও :

আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল ছল ছল ছল্ চল-ঊর্মির হিন্দোল দোল!

সওগাত
পৌষ : ১৩৭৫

শহীদুল্লাহ্ : একজন নিঃসঙ্গ পথিক

কোন কোন মানুষ কঠিনকে ভালবাসেন। মাংসের চেয়ে মজ্জার লোভ বেশী তাঁদের। তাই হাড় ভাঙবার পরিশ্রমে তাঁরা ক্লান্ত হন না কখনো! দুর্গম পথের সেই ক্লান্তিহীন অভিযাত্রী ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। যে পথে অনেক লোক হাঁটে না কিংবা বলা যায় যে পথে নিঃসঙ্গতাই একমাত্র সঙ্গ, একা তিনি হেঁটে চলেছিলেন ঐ দুরতিক্রম্য কোন এক আলোর সন্ধানে। মাঝে মাঝে পথের পাশের কোন কোন লোভনীয় বস্তু তাঁকে আকর্ষণ করেছে, সেদিকে মানুষিক তৃষ্ণায় হাতও এগিয়ে গেছে তাঁর ; কিন্তু তাঁর অন্বিষ্ট পথ-পরিক্রমায় তিনি ছিলেন নিরলস।

তাঁর অন্বিষ্ট পথ ছিল কঠিন। কেন কঠিন? সাধারণত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অন্তত তিনটি জিনিসকে শ্রদ্ধা-শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখে। বিদেশী ভাষা, ব্যাকরণ এবং অঙ্ক। ঐ প্রথম দুটি কঠিন বিষয়ই ছিল শহীদুল্লাহ্‌র প্রিয় গবেষণার বস্তু। সম্ভবত মাতৃভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য ঐ ভাষাশিক্ষার কৌতূহল ছিল তাঁর আজীবন সঙ্গী। খুঁটি বাংলা কি ? সে কি সত্যিই খাঁটি ! না তা মিশ্রিত ভাষার রক্তের সংকর সন্তান ! তার জননী সংস্কৃত না পালী, গৌড়ীয় প্রাকৃত না আর্য-প্রাকৃতের অপভ্রংশ কিংবা তার মূল বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী কোন আদিবাসীর ভাষার ? এই কৌতূহল তাঁকে প্ররোচিত করেছিল ভাষার চরিত্র নিরূপণে তুলনামূলক ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে।

ঐ কৌতূহলের সাঁকোয় চড়ে তিনি হেঁটে গিয়েছিলেন ইতিহাসের বিস্মৃত পৃষ্ঠায়। তাঁর অনুসন্ধানের পথে তাঁর পূর্বগামীরা সাহায্য করেছিল হয়তো ; কিন্তু আরও গভীর সত্যের বোধ হয় পরিচয় পেতে চেয়েছিলেন তিনি। এবং এই সত্যকে পাওয়ার জন্য এতদঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা ত বটেই এমনকি তাদের ব্যাকরণ এবং ধ্বনিতত্ত্ব পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে ঘাঁটতে তিনি আলস্যবোধ করেননি।

ফলত বাংলা সাহিত্যের আর একজন দিকপাল মাইকেল মধুসূদন দত্তও অনেকগুলো ভাষা শিখেছিলেন ; কিন্তু তাঁর সে ভাষা শিক্ষা ছিল তাঁর কবি-সত্তার পুষ্টির জন্য। শহীদুল্লাহ্ কবি ছিলেন না। বলা যেতে পারে, তিনি ছিলেন ভাষা-বিজ্ঞানী। কবির পক্ষে ভাষার আকার, রূপ, সৌরভ এবং তার অন্তর-নিঃসৃত রসই যথেষ্ট, তার প্রয়োজন হয় না ভাষার জন্ম-ইতিহাসের, তার উৎস-কাহিনীর। কিন্তু বিজ্ঞানী ওতে সন্তুষ্ট নন, তিনি শব্দের সংগে শব্দ বাজিয়ে আনন্দ পান, তিনি দেখতে চান কি করে জন্ম হল ঐ ফুলের, কি করে গেঁথে উঠল তার পাপড়ি, তার পরাগের উৎস কোনখানে এবং তার রঙের বৈচিত্র্যেরই বা কি কারণ। বলা বাহুল্য তাঁর সাধনা সৃজনে নয়, তাঁর সাধনা বিশ্লেষণে।

আর বিশ্লেষণের পথ হল সত্যের পথ। তাই সেখানে ফাঁকির স্থান নেই। এই ফাঁকি দেওয়া জ্ঞান পেতে চাননি বলে প্রকৃতপক্ষে তাঁর জ্ঞানের মধ্যে ভেজালের পরিমাণ খুবই কম এবং বর্তমানে এ জিনিস এমন দুর্লভ যে আবার তাঁর মত আর একজনকে ফিরে পাওয়া প্রায় অভাবনীয়। বস্তত একজন সাহিত্যিকের কিংবা কবিকে গদ্য অথবা পদ্য রচনা করবার জন্য ভাষার নাড়ী-নক্ষত্র জানবার, বোধ হয়, তেমন প্রয়োজন পড়ে না। যদিও জানলে অপকার হয় না। কেননা ভাষা আগে চলে এবং ব্যাকরণ তার পিছনে। কিন্তু গবেষককে ঐ সরল পন্থায় বিশ্বাসী হ'লে চলে না ; ছন্দ-বিজ্ঞানের চেয়ে তার টান শব্দ-বিজ্ঞানের দিকে। তাই ব্যাকরণের বেড়া না ডিঙিয়ে তার রুদ্ধকপাট খোলার মন্ত্র শিখবার সাধনা করেন তিনি এবং যেহেতু বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে আত্মীয়-সম্পর্ক, অতএব সংস্কৃত শিখেই শহীদুল্লাহ্কে বিদেশী ভাষা শিক্ষার পথে পা বাড়াতে হয়েছিল। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আসলে সংস্কৃত নিজেই শ্বেতাঙ্গবাহিত বিদেশী ভাষা।

বস্তুত বাংলা ভাষার ঐ উৎসসন্ধানে বৌদ্ধ কবিগণের দোহা-পাঠের জন্য যেমন তিনি পালী শিখেছিলেন তেমনি চর্যাপদের বিশুদ্ধ পাঠের জন্য তাঁকে তিব্বতী ভাষা শিখতে হয়েছিল। কারণ তাঁর মতে : তিব্বতী জ্ঞান ছাড়া শুদ্ধ পাঠ বা অনুবাদ সম্ভবপর নয়। (বাংলা সাহিত্যের কথা : চর্যাপদ প্রসঙ্গ।) এবং চর্যাপদের পাঠ আলোচনা করতে গিয়ে, টেঙ্গণ-

পাদের চর্যাপদের একটি পংক্তি —"বেঙ্গ (গ) সংসার বড়হিল জআ" উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন তাঁর পূর্ববক্তা প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, সুকুমার সেন প্রমুখ ভষাবিদগণ যে-সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সঠিক নয়। সঠিক পাঠ হল : 'বেঙ্গস সাপ চঢ়িল জাই।' যার মানে ব্যাঙের দ্বারা সাপ আক্রান্ত হয়। এবং ঐ মজার কথার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে একটি প্রাচীন গানে অমনি একই ধরনের অর্থ-নিরূপক পংক্তি আছে। আর তার অর্থ হল : ব্যাঙ শোয় আর সাপ প্রহরী থাকে।

আমি তাঁর সত্যান্বেষণের একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম। তাঁর লেখা গ্রন্থে এমনি ভুরিভুরি ব্যাপার আছে সেগুলো নির্ভয়ে—তাঁর আবিষ্কৃত বিষয় বলে—নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়।

আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি লেখেননি কিংবা আমরা তাঁকে সে-সব লেখার সময়, অবসর ও পরিবেশ দিতে পারিনি। তবুও এ-কথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে তিনি যা দিয়েছেন তা তাঁর বয়সের তুলনায় পরিমাণে সামান্য হলেও ওজনে অসামান্য এবং তাঁর ভাঁড়ারে আগামী দিনের গবেষকদের জন্য ফসলের যে বীজ তিনি রেখে গেছেন তার দাম একমাত্র সেই কৃষকই বোঝে যে বীজের চেহারা দেখে তার জাত অনুমান করতে পারে। বস্তুত ভাষার ব্যাপারে যেখানে তিনি বেছে নিয়েছিলেন জ্ঞানের পথ, অনুসন্ধানের পথ, বিজ্ঞানের পথ, ধর্মের ব্যাপারে তেমনি যুক্তি-শাস্ত্রের পথকে তিনি মানতে পারেননি। আদর্শ জীবনের জন্য দার্শনিকের বাছাই করা কথা তিনি মেনে নিলেও ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন যুক্তিবিদ্যার বামে। বলা বাহুল্য ব্যবহারিক জীবনে নিয়মিত অবস্থাকে মানলেও এবং বাস্তবের সংগে তাল মিলিয়ে পা ফেললেও মনে-প্রাণে তিনি ভাবুক ছিলেন। ভাববাদী ছিলেন তিনি এবং ধর্মের ব্যাপারে তিনি তাঁর সেই আবেগকে উন্মুক্ত করে দেখাতে কোন দিন সঙ্কোচ বোধ করেননি। এই জন্যে এই আলোচনায় আমি তাঁকে পূর্বে কবি বলিনি সত্য কিন্তু কাব্যের শিল্পগত সংজ্ঞাকে একটু শিথিল করে নিলে তাঁকেও এক ধরনের কবি-প্রাণ ভাবুক বলা যায়। প্রসগংত কাব্য তাঁকে নিরন্তন আকর্ষণ করত বলেই তিনি কালিদাস থেকে শুরু করে ইকবাল, হাফেজ এবং ওমর খৈয়ামের সংগে অনুক্ষণ চলতে ফিরতে ভালবাসতেন, বোধ হয় ঐ

কজন পণ্ডিত কবির লেখা তাঁর ভাল লাগত বলে তাঁদের কবিতার অজস্র পংক্তি তো তিনি মুখস্থ করেছিলেনই উপরন্তু অনেক কষ্ট করে কয়েকজনের কবিতার আক্ষরিক অনুবাদও করেছিলেন। অনেকের মতে সেটা তাঁর সঠিক পথ ছিল না। সেটা সত্য ; কিন্তু নীরস বিষয়ের সাধক হলেও আসলে মানুষ তিনি রসিকই ছিলেন, এবং সেজন্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিমাণ দেখে বুক কাঁপলেও তাঁকে দেখে ভয় লাগত না। বলা বাহুল্য দেখতে তিনি মধ্যমাকৃতির বাঙালীর চেয়েও ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও দেহ ছিল তাঁর নীরোগ, এবং তাঁর কথানুযায়ী বিশ্বাসানুযায়ী নিয়মিত নামাজের ব্যায়ামে তিনি আশিবছরেও অমন ঋজু ছিলেন। অন্তত একবার বাংলা একাডেমীতে একদল চীনা হজযাত্রীর সঙ্গে করমর্দনের জন্য কয়েকটা ধাপ তিনি ঐ বয়সে এমন দৃপ্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে আমি সেদিন যুবক সৈনিক না ভেবে পারিনি। এবং আমার বিশ্বাস তাঁর অমনি সৈনিকোচিত মনোবল ছিল বলেই জ্ঞান-রাজ্যের কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরকে ডিঙোবার অধ্যবসায়ে তিনি ক্লান্তি বোধ করেননি। বস্তুত প্রতি রাত্রি বারোটা একটা পর্যন্ত তাঁর লেখাপড়া করার সংবাদটা গাল-গল্প ছিল না এবং এই সঙ্গে বলে নিতে হয় যে, ঘড়ির কাঁটাকে দম দিয়ে যাঁরা জ্ঞানের শীর্ষতম স্থানে পৌঁছবার যাত্রী তিনি তাঁদের দলের প্রথম সারির একজন। কিন্তু সূচনা করেছিলাম যে কথা বলে তার বুঝি আর একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন। জ্ঞানের পথে যেমন তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন, প্রায় ধর্মবিশ্বাসের পথেও তেমনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। একই সঙ্গে জ্ঞান-পাগল এবং ধর্ম-পাগল এমন লোক আজকের দুনিয়ায় দুর্লভ। এবং আরও দুর্লভ এইজন্যে ধর্মটাকে তিনি বাহ্যিক পোশাক হিসেবে ব্যবসায়িক কাজে লাগাননি। কিন্তু যেহেতু তিনি বিশুদ্ধ অর্থে মুসলমান ছিলেন, তাই ভীরুর দোদুল্যমান চিত্ত তাঁকে কক্ষচ্যুত করেনি শেষ পর্যন্ত এবং এ-রকমের চরিত্র বিংশ শতাব্দীতে এ-দেশে যে আর একটি জন্মাবে তা বিশ্বাস করতেও দ্বিধা জাগে।

দৈনিক পাকিস্তান
১৯৬৯

কবি গোলাম মোস্তফা

১৯৫৮র অক্টোবরের এক বর্ষার সন্ধ্যায় 'মোস্তফা মঞ্জিলে' তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বাইরের বিজলী বাতিতে তাঁর সখের ফুল বাগানের সুন্দর গোলাপগুলোর মত সেদিন তাঁকে ভালো লেগেছিল। বয়সে বৃদ্ধ অথচ প্রাণে তরুণ সেদিনকার গোলাম মোস্তফা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমান উৎসাহী ছিলেন। মাস ছয়েক পূর্বে প্রথম থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হওয়ার পরও পিয়ানো বাজিয়ে গান শোনাতেন তিনি। কখনও উদ্দীপনা হারিয়ে নির্জীব হয়ে থাকা বোধ হয় তাঁর প্রকৃতিতে ছিল না। কি রুচিতে, কি ভদ্রতায়, কি সামাজিক আচারে, কি অতিথি আপ্যায়নে সেই উদ্যম কোনদিন ত্রুটি হয়ে দেখা দেয়নি তাঁর জীবনে। সযত্নে ছাটিয়ে রাখা কাঁটামুন্দীর বেড়া, গোলাপের গাছ, বাড়ীর দেয়ালে রঙের পালিশ, ড্রয়িংরুমে সাজানো বিরাট পেণ্ডুলামের ঘড়ি, পিয়ানো, অর্গান এ সবের আভিজাত্য তাঁর ব্যবহারেও ছিল সপ্রাণ।

একেবারে শেষের কয়েক বছর তাঁর মনের কোথাও বোধ হয় ছন্দপতন হয়েছিল ; আঙিনা থেকে অদৃশ্য হয়েছিল গোলাপের গাছ, বাড়ীর রঙ ম্লান হয়ে এসেছিল কিন্তু আগন্তুককে অভ্যর্থনা করতে তাঁর হাসিটি প্রভা হারায়নি। বিরুদ্ধ আদর্শের লোকের সঙ্গে তখনও তিনি হাত মিলিয়েছেন ঐ একই হাসি দিয়ে।

চরিত্রে তাঁর কবির ঔদাসীন্য ছিল না। বরং একজন সামাজিক এবং কর্মী মানুষের মত তিনি ছিলেন হিসাবী। জীবনে যতটুকু সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন এবং প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন তার সবটুকুই বোধ হয় তাঁর অক্লান্ত চেষ্টার প্রতিদান। কিছুরই অপব্যয় তিনি করেননি ; না শিক্ষার, না জ্ঞানের, না প্রতিভার। তাঁর বাড়ীতে সুরক্ষিত গ্রন্থাদি অপঠিত হয়ে পড়ে থাকত না এবং তাঁর মনের কোন

ভাবনা অপ্রকাশিত অবস্থায় আয়ু হারাত না। তরুণদের লেখার প্রতি তিনি কৌতূহলী ছিলেন। প্রতিভাবান তরুণদের উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত হননি। হলে তিনি একথা বলতেন না, 'এখানে একাধিক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ কবির আবির্ভাব হয়েছে।' লেখক সংঘ পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তরুণ লেখকদের বেশী লেখা যে তাতে ছাপা হয়নি সেজন্যে তিনি দায়ী ছিলেন না, দায়ী ছিল তাঁর দূরদৃষ্ট। তরুণেরা আদর্শগত কারণে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি নজরুলের বিরুদ্ধে আলোচনা করেছেন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় তিনি বাংলার প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় দেননি, তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় দেখেছেন ইকবালকে। এসব কখনো কখনো হয়তো সত্য, কিন্তু তাঁর একটি বিশেষ বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে দেখলে আমরা দেখব যে, তিনিও তরুণ প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কারণ সাহিত্য একই রীতিতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে এ তিনি আশা করতেন না।

বড় কবি হয়তো তিনি ছিলেন না কিন্তু কবির অনুভূতি তাঁর ছিল। তাঁর সৌন্দর্যচেতনা এবং সৌন্দর্য-বোধ যথার্থ কবিপ্রকৃতির। তাঁর হাতের লেখা যেমন সুন্দর ছিল, তাঁর কণ্ঠ যেমন সুন্দর ছিল, তাঁর সাহিত্যের অনেক অংশও তেমনি সুন্দর। তাঁর ত্রুটিহীন গদ্য লেখা এবং বলবার সহজ ভঙ্গীতে যে ছন্দ লক্ষ্য করি তা কবি-প্রাণের উৎসার :

> জলকল্লোলে, চন্দ্র-সূর্যের আলোকপাতে, ফুলে-ফলে, বর্ণে-গন্ধে,—সর্ব্বত্রই কার যেন মঙ্গল হস্তের সুখস্পর্শ অনুভব করি। প্রভাতে অরুণকিরণ বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় কি অপরূপ শোভাই না ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু সেই শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বের সুপ্ত প্রাণে যে নবজীবনের পুলকস্পন্দনও আনিয়া দেয়। ফুল-শাখায় দোলা দিয়া, কচি ধানের উপর ঢেউ খেলাইয়া বাতাস বহিয়া যায়, কিন্তু তার মধ্য দিয়া সে মানুষের ঘরে-ঘরে সঞ্জীবনী সুধাও দান করিয়া চলে।

[আর্টের স্বরূপ : আমার চিন্তাধারা]

এই আবেগময় সাধুভাষার সঙ্গে তাঁর চলিত ভাষায় লিখবার ভঙ্গিটিও উপভোগ্য :

> কথা দিয়ে যারা মালা গাঁথে তারাই শুধু কবি নয়, রঙের তুলি দিয়ে যে ছবি আঁকলো, কণ্ঠ দিয়ে যে সুর করলো, শ্বেত-মর্ম্মরে যে 'তাজমহল' গড়লো—সেও কবি। এই হিসাবে আমাদের কৃষক ভায়েরাও কবি। তারা সৃষ্টি করে ধানের মঞ্জরী, মাঠে মাঠে ফলায় সোনার ফসল, ফুটায় তারা ফুল ও ফল। এক একখানি আলবাঁধা ক্ষেত যেন তাদের বিরাট কাজের এক একখানি পৃষ্ঠা ; অথবা একখানি ফ্রেমে আঁটা ছবি। ওদের লাঙল, কাস্তে, নিড়ানী, এগুলো সব তুলি। এক এক সময় এক একটা দিয়ে সরু মোটা কাজ করতে হয়। এমনি করে দিনে দিনে ফুটে ওঠে ওদের মনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়ে, ওদের সোনার তুলির ছোঁয়া লেগে জেগে ওঠে কত বর্ণ, কত গন্ধ, কত গান, কত ছন্দ। বর্ষা-শরতে, শীত-বসন্তে, ওদের মাঠে মাঠে বসে ফসলের উৎসব।
>
> [মাঠের কবি : আমার চিন্তাধারা]

কবি হিসাবে তিনি আবেগপ্রধান। তাই গদ্যের প্রকৃতিকে একেবারে নির্দোষ করে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। হয়তো সম্ভব হত যদি তাঁর আবেগ-আন্দোলিত মনের পাশে আর একটি বিশ্লেষণধর্মী মন একই সময়ে বিচলিত না হত। গদ্যের শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি পেশীকে সমান তালে আন্দোলিত করার দিকটিতে তিনি খুব বেশী মনোযোগ দেননি। যেখানে তিনি আবেগ-অধীর সেখানে এই ত্রুটি কোন কোন সময় প্রধান হলেও তাঁর ভাবনাসমৃদ্ধ গদ্যে তা অপ্রধান। যেমন :

> এ গেল এক পক্ষের কথা। অন্য পক্ষের যুক্তিও তুল্য রূপে বিবেচ্য। জগতের অন্যতম মহাকাব্য Paradise Lost-এর কবি মিলটন বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন : খণ্ড-কাব্যের জন্য ছন্দের প্রয়োজন হইলেও, মহাকাব্যের জন্য উহা অপরিহার্য নয়। মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবগাম্ভীর্য, রস-মাধুর্য এবং মৌলিকত্বের ঐশ্বর্যের পাশে ছন্দের নূপুরনিক্কন

ম্লান হইয়া যায়। ছন্দের বন্ধন মহাকাব্যের বিরাটত্বকে ধারণ করিতে পারে না; বরং ছন্দ একটা অহেতুক বাধার সৃষ্টি করে। নদীর কুল কুল ধ্বনি সাগর-গর্জ্জনের কাছে যেমন ম্লান হইয়া যায়, মহাকাব্যের ভাব-তরংগের কাছে খণ্ডকাব্যের ছন্দনৃত্য ও শব্দসংগীত তেমনি ম্লান হইয়া যায়।

[ভূমিকা : বনি আদম]

অথবা—

এ যুগের পাঠককে তাই প্রস্তুত হ'য়ে আসতে হবে। অলস নিষ্ক্রিয় পাঠকের স্থান আর নেই। শুধু যে লেখকই বিনিয়ে বিনিয়ে সব কথার মালা গেঁথে দেবেন, আর অবসর মুহূর্তে পাঠক তা শুয়ে বসে উপভোগ করবেন, তা হবে না। পাঠককেও এখন মেহনত করতে হবে।

[আধুনিক কবিতা : আমার চিন্তাধারা]

উপরোদ্ধৃত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় 'বিনিয়ে বিনিয়ে' 'শুয়ে বসে' ইত্যাদি শব্দগুলো সুপ্রযুক্ত নয়।

তাঁর লেখার এই গুণ এবং দোষ তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রের প্রভাবের ফল। কখনও কখনও যেমন তাঁকে কবি বলে মনে হত, কখনও যেমন যুক্তিবাদী সুধী, তেমনি কখনও ছিল সেই চরিত্রে শিশুর মত ব্যস্ত আচরণ।

অনেকেই জানেন তিনি বাংলায় নাম লিখতেন 'গোলাম মোস্তফা', ইংরেজীতে লিখতেন Ghulam Mustafa (ঘুলাম মুস্তফা)। তাঁর চরিত্রের পাশাপাশি এই দ্বিধারা সত্তা বৃত্তের বিপরীত বিন্দুতে মিলবার চেষ্টা করত। তাই জীবনভর ইসলাম আর মুসলমানের অধঃপতন নিয়ে দুঃখবোধ করলেও নগর-সভ্যতার আধুনিক মানুষের থেকে তিনি পিঠ ফিরিয়ে থাকতে পারতেন না। হয়ত এইজন্যই তিনি এমন এক ইসলাম চেয়েছিলেন যা আধুনিকের উৎকণ্ঠা নয় এবং একই সঙ্গে এমন আধুনিককে চেয়েছিলেন যা ইসলাম-শঙ্কিত নয়।

আমি তাঁকে শেরওয়ানীর চেয়ে কোট-প্যান্ট পরতে দেখেছি বেশী, নামাজের চেয়ে বেশী দেখেছি গান গাইতে। মৌলভীদের দেখলে যেমন তাঁদের

তিনি মুসলমানি কায়দায় অভ্যর্থনা করতেন আলাপ করতেন ইসলামের আদর্শ নিয়ে, আধুনিককে পেলে তেমনি তাদের মনের তালে তাল মিলিয়ে চলতেন, পিয়ানো বাজিয়ে গাইতেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের গান। এবং এই একটি সময়ে তাঁর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন কথা ছিল না। আমি ব্যক্তিগত জীবনে কোন হিন্দুর সংগে তাঁর অসুন্দর ব্যবহার দেখিনি। বরং তাঁর সামাজিক জীবনে তিনি আদর্শ হিন্দুদের অনুসরণ করতেন, আমি অনেকবার তাঁকে আশুতোষ মুখাজীর কথা বলতে শুনেছি। বলতে শুনেছি, 'দেখ, হিন্দু জওহারলাল শুধু মন্ত্রীই নন সাহিত্যিক, কিন্তু ফজলুল হক, অথবা জিন্নাহ কিংবা সারওয়ান্দী একটা বই লিখে গেলেন না।'

তাঁর ব্যক্তিজীবন আর তাঁর বহিজীবনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। যেখানে তিনি দশের মধ্যকার মানুষ সেখানে রবীন্দ্রনাথের দর্শনের চেয়ে ইকবালের দর্শনকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বেশী এবং বলতে পেরেছেন :

> অতএব বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র-কাব্যের যে প্রেরণা ও দর্শন, তা মধ্যযুগীয় ; প্রগতীশীল বিশ্বমানুষের কাছে তার বিশেষ কোন আবেদন নেই। আমরা অমন করে মরে যেতে চাই না, ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই ; গ্রহে-গ্রহে, লোক-লোকে প্রভুত্ব করতে চাই, আল্লার খলিফা হয়ে আল্লার রাজ্য শাসন করতে চাই! যে-কারণে ইকবাল প্লেটো ও হাফিজকে আমল দেন নাই, ঠিক সেই কারণে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যকেও আমল দিতে পারি না। রবীন্দ্র-কাব্য আমাদের মনে এনে দেয় প্রশান্তির মনোভাব। যে নূতন ভ্রমণের যুগ এল, নব-সৃষ্টির ও নব-সম্ভাবনার যুগ এল, সে যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ নন, সে যুগের কবি ইকবাল।
>
> [ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ : আমার চিন্তাধারা]

কিন্তু ব্যক্তি গোলাম মোস্তফা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গান গাইলে অধিকাংশ সময় রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন। বলতেন, 'ভাষায় বুড়ো যেন ঐন্দ্রজালিক। কারও সাধ্য নেই তাঁকে ডিঙিয়ে যায়। আর মানবজীবনের এমন কোন ক্ষুদ্রতম অনুভূতি নেই যা তাঁর চোখ এড়িয়েছে। ফলত রবীন্দ্র-কাব্যকে ভাল না বাসলে এক কালে তিনি এ কথা বলতেন না :

অসীমের স্পর্শ দিয়ে ইংগিত দিয়ে সংগীত দিয়ে—মনকে সে ঊর্ধ্ব-লোকে টেনে নেয়। ফলে মানুষ জড়-জীবনের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হ'য়ে এক উদার দ্বন্দ্বাতীত সাম্যলোকে উন্নীত হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ছোট বড়'র প্রভেদ তখন সে ভুলে যায়। তার চোখে ঘনায় মহামানবতার স্বপ্ন, অন্তরে জাগে বিশ্বনিখিলের প্রতি আত্মীয়তার মনোভাব। কাজেই আজকের যুগে রবীন্দ্র-কাব্য মানবকল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে।

[রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ : আমার চিন্তাধারা]

স্পষ্টতঃই তাঁর বক্তব্যে আত্মবিরোধিতা ধরা পড়ে। অবশ্য এ দ্বন্দ্ব ঐশ্বর্যবান চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। যে জীবনে দ্বন্দ্ব কম সে জীবনে জিজ্ঞাসাও কম। আর যার জিজ্ঞাসা নেই তার জানার পরিধি বিস্তীর্ণ হবে কি করে ? বলেছি তিনি জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, ছিলেন একটি পার্থিব আত্মা যেখানে একই সঙ্গে প্রেম আর প্রেমের প্রতি সন্দেহ সমানভাবে বিরাজমান, যা অসন্তুষ্ট তাই অশান্ত এবং তাই জাগতিক। তাই কবিখ্যাতির প্রতি লোভ থাকলেও বিষয়ী মানুষের মনোভাব তিনি ছাড়তে পারতেন না।

কিন্তু শিল্প শিল্পীর কাছ থেকে অন্য কিছু প্রত্যাশা করে। ব্যক্তি-জীবনের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটাতে না পারলে শিল্পীর জীবনে সার্থকতা প্রচুর পরিমাণে আসে না। 'পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নী কিছুই নেই' আমরা জানি আত্মমগ্ন শিল্পীর এই ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেননি বলে তাঁর কাব্যকেও সেই সৌন্দর্যের সোনার শিকলে বাঁধতে পারেননি। তাই তিনি 'বুলবুলিস্তানে'র কবির চেয়ে 'বিশ্বনবী'র লেখক হিসেবে নাম করলেন বেশী। কবি হিসেবে তাই তাঁর খ্যাতিকে ম্লান করল সমাজসেবকের ভূমিকা।

আমরা জানি আত্মকেন্দ্রিক শিল্পীর ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর 'আর্টের স্বরূপ' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন : "আর্টের চরম সার্থকতা মানুষের আপন জীবনে। আর্টের ক্ষেত্র শুধু কাব্য-উপ-ন্যাসই নয়, আর্টের ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ মানবজীবন।" এবং এরই ব্যাখ্যা

করতে যেয়ে তাঁকে বলতে শুনি : 'জীবনের মাঝে আর্টকে এইভাবে গ্রহণ করিলে তখন আর 'Art for Art's sake থাকে না, তখন হয় Art for man's sake। বোধ হয় এই বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শিল্প অপেক্ষা মানুষের জীবনের অভিব্যক্তিকে বিশেষ করে মুসলমানদের জীবনকে সুন্দর করে দেখতে চেয়েছিলেন ; তাই শিল্প-সৌন্দর্যের চারু দিকটির প্রতি তিনি ততখানি নজর দিতে পারেননি যতখানি শিল্প একজন শিল্পীর কাছে প্রত্যাশা করে। আমরা বলব শিল্পের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা মনে হয় ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগের কাছে অল্পপ্রাণ। কি কবিতায়, কি গানে, কি গদ্য লেখায়, কি বক্তৃতায় বারংবার মুসলমানের নাম উচ্চারণ করেছেন তিনি। মুসলমান জাগুক, মুসলমান সুন্দর হোক, শ্রেষ্ঠ হোক, সে তার অতীত গৌরবদীপ্ত ইতিহাসকে আর একবার উদ্ভাসিত করে তুলুক, সর্বোপরি মুসলমান মানুষ হোক যে মানুষ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র।

এরই ফলে কাব্যের একটি বিরাট অংশ তিনি প্রচারের অস্ত্রনির্মাণে ব্যয় করে গেছেন। 'বুলবুলিস্তানে' সংকলিত 'রক্তরাগে'র পনেরটি কবিতার মধ্যে পাঁচটি, 'খোশরোজে'র সাতটি কবিতার মধ্যে ছয়টি, 'কাব্য কাহিনী'র বারটি কবিতার মধ্যে দশটি, 'মোসাদ্দাস-ই-হালী', 'তারানা-ই-পাকিস্তান', বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 'লীগ বিজয়', 'আমানুল্লাহ', 'বাচচা সাক্কা', 'নাদির খান', 'মোহসীন স্মরণে', 'বিশ্বনবী', 'জিন্নাহ জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ', 'বনি আদম', 'ইকবালের কবিতার অনুবাদ', 'শিকোয়া-জবাবে শিকোয়ার অনুবাদ', সবই মুসলমানের জন্য লেখা। অবশ্য মুসলমানের জন্য বলে যে এসব কবিতার সবটাই ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়। তাঁর 'মানুষ', 'ঈদ উৎসব', 'শবেবরাত' ছন্দে শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যে, উপমায় এবং আঙ্গিকে সার্থক কবিতা বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য তাঁর ব্যক্তি-জীবনের একটি নিভৃত দিক ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আনোয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর বাসায় গেলে প্রায়ই তাঁকে রবীন্দ্র-নাথের একটি গান গাইতে শুনতাম :

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু আমার জীবনে

তোমার পরশ রতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
গভীর গোপনে
দিনের আলোর আড়াল টানি
কোথায় গেলে নাহি জানি
অন্তরবির তোরণ পরে, চরণ বাড়ালে
আমার রাতের স্বপনে।

এই সেই গোলাম মোস্তফা যাঁর নিভৃত জীবনের অবদান 'সাহারা', 'হাস্নাহেনা'র মত কাব্যগ্রন্থ, 'বিশ্বসুন্দরী', 'কবি', 'মানসী' 'মৃত্যু উৎসব', 'ক্রন্দসী, 'ভূষণ', 'সন্ধ্যারাণী' 'কুড়ানো মানিকে'র মত কবিতা। এই সেই কবি সন্ধ্যার সঙ্গে যাঁর মিলনক্ষণের দ্বিতীয় দর্শক নেই। 'সন্ধ্যারাণি! সন্ধ্যারাণি! এই যে মোদের গোপন-মিলন,—কেউ জানে না/ আমরা জানি।' এই সেই কবি যিনি অন্তরের নিভৃত কক্ষে বসে আমাদের জন্য অনুপম কয়েকটি কবিতা স্তবক উপহার দিয়ে গেছেন:

রক্ত-রাঙা মুখের পরে অসীম-ছাওয়া ওই নীলা
ও ত তোমার এলিয়ে দেওয়া মুক্ত কেশের সহজ লীলা,
শান্ত নদীর মুকুর তলে
দেখছ কি মুখ কৌতূহলে?
সীমন্তে কে পরিয়ে দিল হীরক-টিপ ওই কখন আনি।'

এই কটি লাইন যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তিনি কি কাব্য-সাধনায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করলে আরও সুন্দর কবিতা লিখে যেতে পারতেন না? কিন্তু বলেছি চরিত্রে ছিল তাঁর কেন্দ্র-বিপরীত গতি, তিনি ছিলেন সামাজিক, আর মন ছিল তাঁর স্বজাতি চিন্তায় আক্রান্ত।* এই দ্বিমুখী সত্তার জন্য বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তিনি

* যে-কোন কবির কবিতায় জাতিপ্রেমের উদ্দীপনার প্রকাশ কোন নতুন কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, নজরুল ইসলামে আমরা এই স্বজাতিপ্রেমের আগুন উদ্দীপ্ত লালিমায় জ্বলতে দেখেছি। সুতরাং কবির মন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ভাবনারই একমাত্র অনুসারী হবে এ-কথা ঠিক নয়। তা'ছাড়া গোলাম মোস্তফা বলেছেন: শিল্পের জন্যে শিল্পে তিনি বিশ্বাসী নন, মানুষের জন্যে শিল্পে তিনি বিশ্বাসী। এবং জগতের মানব-সমাজের জন্য দায়িত্বশীল সব লেখকই সে-কথা স্বীকার করেন।

সমান তালে চলতে না পারায় একটি অপরিসীম ক্ষতিকে সংগে নিয়ে মারা গেছেন। কবিতা সম্বন্ধে সজাগ হয়েও মনের সাধ তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল। তাঁর কবি-প্রতিভা প্রস্ফুটিত হয়ে পাঠকের প্রেমঘন দৃষ্টি আকর্ষণ করল না।

একনিষ্ঠভাবে সাধনা করলে এবং সমসাময়িক কাব্যের সংগে সংযোগ রক্ষা করলে গোলাম মোস্তফার পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ কবিতা রচনা করা হয়ত সম্ভব হত। কেননা কবির প্রাণ এবং কবির কান তাঁর ছিল। তাঁর কবিতায় ছন্দপতন হয়নি বললে ভুল হবে না। মনে হয় নির্ভুল ছন্দ সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁর সঙ্গীতজ্ঞান থেকে জন্মেছিল। উচ্চস্তরের সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও তাঁর নীরব সঙ্গীতশিক্ষার সীমাটি একেবারে অল্প ছিল না। গানের সূক্ষ্ম ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় শিক্ষিত মনের পক্ষে কবিতায় তাই কিছুটা গানের আমেজ তিনি আনতে পেরেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ প্রেমের কবিতা তাই গীতিকবিতা এবং কোন কোন কবিতার স্তবক তাই গানের মত মধুর :

যে-কথা ফোটে নাকো ভাষার গুঞ্জনে
হৃদয়ে জাগে ভালবাসার মূঞ্জনে,
সেখানে কবি শুধু বারেক আঁখি ঠারে,
যা-কিছু বলিবার পারে তা বলিবারে,—

সে শুধু চোখে-চোখে কেবলি চেয়ে থাকা
হৃদয় টেনে আনি আঁখিতে পেতে রাখা,
না বলি কোন কথা বচনে বার বার
হিয়াটি তুলে ধরা নয়নে আপনার !

[কবির আঁখি : রক্তরাগ]

কিংবা

'—মনের কোণের আঙিনাতে ফুটেছে এই হাস্নাহেনা
পল্লীবধূর মতন মধুর, বাইরে এরে যায়না চেনা !
দিনের আলোয় রয় সে গোপন, মুখ তুলে সে কয় না কথা,
সবুজ পাতার ওড়ানা ঢাকা লজ্জাবতী এ কোন্ লতা !

শুভ্র শুচি মনটি তাহার, প্রেম করে না সবার সনে,
হৃদয় দুয়ার দেয় না খুলে প্রভাত অলীর গুঞ্জরণে।
আলোক যখন বিদায় মাগে অস্তরবির রক্ত-রথে
সন্ধ্যারাণী আঁচলখানি উড়িয়ে চলে পল্লীপথে,
মুখর ধরা স্তব্ধ যখন, কুঞ্জ ঘেরা আঁধার-জালে,
হাস্নাহেনার প্রেম-অভিসার সেই আঁধারের অন্তরালে।'

উদ্ধৃত কবিতা দুটি ছন্দে রূপে মনোহর। এদের মাত্রা মিল, শব্দধ্বনি, রূপকল্প পাঠকের চোখ মন দুটোকেই সমানভাবে তৃপ্তি দেবে।

চমকপ্রদ সুন্দর উপমা অথবা রূপের প্রগাঢ় ব্যঞ্জনা, শিল্পীর সূক্ষ্ম-চেতনা কিংবা প্রজ্ঞালব্ধ ভাবনা এসবের অভাবে তাঁর কবিতা গভীর হতে পারেনি এবং মননের অভাবে আধুনিক মনের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয়েছে সত্য কিন্তু তাঁর কবিতায় সুরের অভাব ঘটেনি।

একজন কবির কাছে আমরা শুধু সৌন্দর্যই আশা করি, সন্ধান করি রূপের এবং শিল্প-দৃষ্টির। আমরা আশা করি একজন কবি যাই প্রচার করুন না কেন, তা সে রাজনীতি হোক, দর্শন হোক, ধর্ম হোক শেষ পর্যন্ত তাকে কবিতা হতে হবে, যা আমাদের প্রতিদিনের বাক্যালাপের কথোপকথনের থেকে পৃথক, যে অনুভূতি যথার্থই গদ্যের বাঁধনে অধরা। এ জন্য কবিকে দৃষ্টির মধ্যে নিমগ্ন হতে হয়, ভাবনার মধ্যে আত্মস্থ হতে হয়, এক একটি শব্দের জন্যে, এক একটি উপমার জন্যে, চিন্তার অনুকূল আঙ্গিকের জন্য, পরশপাথরলোভী খ্যাপা সাজতে হয়। শুধু স্বভাবজাত কবিত্বশক্তি থাকলে, ভাগ্যদত্ত প্রতিভা থাকলেই হবে না, অনুশীলন আর অবিচল লক্ষ্যের সংগে একটি অবিক্ষিপ্ত প্রকৃতিস্থ মনও থাকতে হবে। যদিও গোলাম মোস্তফার মধ্যে সেই এককেন্দ্রিক অভঙ্গুর মন ছিল না বলে কাব্যরচনায় সিদ্ধি এবং সাফল্য তাঁর জীবনে দুর্লভ হয়ে উঠেছিল, তবু প্রেরণার অপরিণত সিদ্ধিতেও ইতিহাসে তিনি নমস্য।

গোলাম মোস্তফা শুধু কবিতা লেখেননি। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, নবীর জীবনী লিখেছেন, কয়েকটি ছোটগল্পও নাকি তিনি লিখেছেন, আমি তাঁকে একটি নাটকও লিখতে দেখেছিলাম।

এমনিভাবে তাঁর কবি-সত্তা খণ্ডিত হয়েছে। বলা বাহুল্য বিবিধ রকমের শিল্পে সিদ্ধিলাভের প্রলোভন একটি চরম পরিণতিকে ব্যাহত করে।

শেষের দিকে গোলাম মোস্তফার কাব্যরচনা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রায়। মহাকাব্য রচনার অভিপ্রায়ে লেখা 'বনি আদম' এবং 'শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া'র অনুবাদই তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ। একটি বিরাট ভরসা নিয়ে তিনি 'বনি আদম' রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সে এক দুরূহ ব্যাপার। সে শক্তি ছিল তাঁর অনায়ত্ত। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং কখনও কখনও নজরুলের প্রতিভায় আক্রান্ত। এই তিনটি প্রতিভার কোনটিই মহাকাব্যের বলীয়ান অটুটত্বে স্থিত নয়, নয় ততখানি ব্যাপ্ত গম্ভীর। সুতরাং তাঁদের নির্মিত পথে নেমে, হালকা আবহাওয়ায় শ্বাস টেনে একই সঙ্গে ব্লিজার্ড এবং উষ্ণমণ্ডলীর হাওয়ায় ভ্রমণ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদিও অক্ষরবৃত্তে রচিত দু'একটি ভাল কবিতা তাঁর আছে কিন্তু তাও রবীন্দ্রবৃত্তের অন্তস্থ। তাতে মাইকেলের 'মেঘনাদে'র মেঘনিনাদ নেই। এ ছাড়াও মহাকাব্যে একই সঙ্গে যে নয়টি রসের তরঙ্গ বইতে দেখি তাও 'বনি আদমে' অনুপস্থিত। এ গ্রন্থটির কোন কোন অংশকে সাধারণ কাব্য হিসাবে প্রশংসা করা যায়।

কিন্তু বলছিলাম যে গোলাম মোস্তফার কাব্য-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কোনক্রমে ছেঁড়া পাল খাটিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস করতেন তিনি। অথচ মনে মনে বুঝেছিলেন যে সময় তাঁর কাছ থেকে অনেক পূর্বে বিদায় নিয়ে গেছে। বছর পাঁচেক আগে যেমন তিনি সৃষ্টিশীল কবিতা রচনা ছেড়ে কবিতার অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন তেমনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ সংস্করণ বিশ্বনবীর পরিমার্জনায় আত্মমগ্ন হয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়ান প্রবন্ধ সংগ্রহ করে ছাপিয়েছিলেন 'আমার চিন্তাধারা', বুঝেছিলেন তাঁর যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, এদিকে সময়ও অস্তবেলার ডাক শুনেছে, অতএব সম-সাময়িক বিষয় সম্বন্ধে দু'একটি ভাবনার গদ্যপ্রকাশই অবশিষ্ট কাজ। বলেছি নিরলস ছিলেন তিনি—শেষবার অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব মুহূর্তটিতে তিনি আবুবকর সিদ্দিকীর জীবনী রচনায় নিবিষ্ট ছিলেন।

বর্তমান প্রবন্ধে কবি গোলাম মোস্তফা সম্বন্ধে আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি। কিন্তু তার আগে আর একটি কথা বলব : আমাদের

সাহিত্যে তিনি বড় বেশী পরিত্যক্ত। অথচ তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং সর্বোপরি বিশ্বনবী বোধ হয় পাঠক সমালোচকের কাছে আরও কিছু আলোচনা দাবি করতে পারে ; যাতে শুধু থাকবে তাঁর ব্যক্তি-প্রশংসা নয়, নিন্দা নয়, তাঁর রচিত সাহিত্যের সত্য বিশ্লেষণ। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল বলে এ বিষয় নিয়ে তাঁকে অনেকবার আক্ষেপ করতে শুনেছি। হয়ত একটু প্রশংসা তিনি চাইতেন, একটু বেশী রকম খ্যাতি, কিন্তু তার কিছুটা পাওয়ার যোগ্য বোধ হয় তিনি অর্জন করে গেছেন।

নাগরিক
অগ্রাহায়ণ: ১৩৭১

গোলাম মোস্তফা : কবি : কবি-মানুষ

[পূর্বের প্রবন্ধটিতে ব্যক্তি গোলাম মোস্তফার পরিচয় সম্পূর্ণ ছিল না। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই অপূর্ণতাকে কিছুটা দূর করার চেষ্টা করেছিলাম। ভিন্নভিন্ন সময়ে একই বিষয়ে লেখা বলে প্রথম দিকটাতে আকৃতিগত কিছুটা সাদৃশ্য ধরা পড়বে। এখানে তার পরিমার্জনার অবসর নেই। দুটি প্রবন্ধ মিলে একটি প্রবন্ধ হলে ভাল হত। প্রবন্ধ দুটি পরস্পরের পরিপূরক।]

গোলাম মোস্তফা সাহেবের সংগে আমার প্রথম দেখা হয় তাঁর বাড়ীতে, শান্তিনগরে। সেদিন তাঁর উৎসাহ দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বোধ করি তখন সন্ধ্যা ৭টা হবে, আমি আর আমার বন্ধু শেখ নেসারউদ্দীন তাঁর বাড়ীতে যাই। নেসারের সংগে তাঁর পূর্বে পরিচয় ছিল, আমার সংগে এই প্রথম। নেসার মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়ে কিন্তু কবিতার জন্যে তাঁর উৎসাহে তখনও ভাটা পড়েনি। তিনজনে মিলে কবিতা পড়া শুরু হ'ল। আমাদের তিনগুণ বয়স তাঁর কিন্তু ক্লান্তিতে আমাদের সমান। রাত দশটায় আমরা ফিরতে গিয়ে ফিরতে পারলাম না। অক্টোবরের বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বাইরে অন্ধকার। বিদায় দিতে গিয়ে কবি থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, আর যেতে হবে না। আজ রাতে আমার অতিথি হও। খাওয়া হল পাউরুটি, গোস, ডাল আর তারপরে রসগোল্লা। কোত্থেকে এল ভেবেছিলাম। ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরে জানলাম ওটা তাঁর বাড়ীর রেওয়াজ। অতিথি এলে তাকে কিছু না খেয়ে যেতে দেবেন না। তারপর খাওয়াদাওয়ার পরে আবার কবিতা—তাঁর পিয়ানো বাজিয়ে গান গাওয়া; আমাদের দিকে ফিরে বললেন : আমি বুড়ো হইনি।

রাত দুটোর সময় শুয়েছিলাম মনে পড়ে। সোফা নাড়িয়ে, ঘরের কার্পেট গুছিয়ে আমাদের বিছানা করা হয়েছিল। কিন্তু উত্তেজনায় আমাদের আর ঘুম হয়নি। ভোরে আবার আর এক প্রস্থ কবিতা পাঠ, নাশতা হল। তারপর বিদায় নিলাম। তাঁর বাগানে লাল গোলাপ

ফ্রটেছিল—ঘনঘন আমরা সেই দিকে চাচ্ছিলাম। শোনা গেল : নাও নাও দু'জনই দুটো নাও, আমাদের প্রীতির স্বাক্ষর।

তাঁর ওখানে আসার আগে নেসার আমাকে বলেছিল : অনেক সাহিত্যিকের বাসায় গিয়েছি, এমন সহৃদয়তা আর এমন সৌজন্য কখনো দেখিনি। আমরা চিন্তাধারায় বিপরীত মেরুতে বাস করলেও এই সৌজন্যের টানে বারবার তাঁর কাছে যেতাম এবং অভ্যর্থনা পেতাম একই রকম, বস, বস, চা খাবে না। রুস্তম ! ভৃত্যটির সহজে সাড়া না পেলে কখনো কখনো উঠে যেতেন, উষ্ণ মেজাজে বলতেন : একটাকেও কাছে পাওয়া যায় না। কি করছিলি, যা দু'কাপ চা নিয়ে আয়।

শুধু চা আসত না। ডালমুট, চানাচুর, বিস্কুট—কখনো কখনো জেলি মাখানো পাউরুটি, কলা, কালাচাঁদের দোকানের কালজাম। মিষ্টি খাওয়ায় নিজেও ছিলেন শিশুর মত অশ্রান্ত। যেদিনই আসতাম সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত। শেষের দিকে আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে বড় উৎসাহী হয়ে পড়েন। আলোচনা করতে করতে এমনি উত্তেজিত হয়ে একদিন আমাকে সংগে নিয়ে নিউ মার্কেট থেকে দুশো টাকার আধুনিক লেখকদের বই কেনেন। তাদের মধ্যে এলিয়ট, এজরা পাউন্ডের কবিতার এবং আলোচনারই বই বেশী ছিল। আগেও তিনি কিছু কিছু এদের সম্বন্ধে পড়েছিলেন, এবার উঠে পড়ে লাগলেন। নতুন করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে পড়তে শুরু করলেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব বসুর গদ্য লেখাকে পছন্দ করতেন, তাঁর প্রবন্ধের প্রশংসা করতেন।

আর আলোচনা হত রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে নিয়ে। ওঁদের সম্বন্ধে আলোচনা হলেই গানের কথা উঠত। আর প্রায় সংগে সংগে, পিয়ানোর চেয়ারটিতে যেয়ে বসে পড়তেন। নজরুলের "কুহু কুহু কুহু বোলে কোয়েলিয়া মহুয়াবনে/মাধবী চাঁদ এলে পূব গগনে।" এই গানটিকে তাঁকে বহুবার গাইতে শুনেছি। গানের সব লাইন মনে থাকত না। গুন গুন ক'রে রেশ টানতেন তারপর অর্গান কিংবা পিয়ানো ছেড়ে দিয়ে আমাদের দিকে ফিরে হাসতেন : মনে থাকে না। কেমন লাগল ? বলতাম, খুব ভাল।

উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে হাসতেন, ধীরে ধীরে সোফায় এসে বসতেন। বলতেন :কিছুই হল না। কোন কিছুই সম্পূর্ণ হল না। গানটাও ভাল করে শিখতে পারলাম না। এত স্ট্রাগল করতে হয়েছে, সাধনা করব কখন। হেসে ফেলতেন : কবিকে যদি ইট আর সিমেণ্ট কিনতে যেতে হয় তাহ'লে সুর কি করে থাকে! বলতে বলতে গলার সুর তাঁর বদলে যেত, বলতেন তবু আমরা ত কিছু করেছি কিন্তু এরা কি করল, যারা আমাদের পরে এসেছে? ১৯৫৮ সালে আমার সংগে পরিচয় হয়। সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। আমি প্রায় তাঁর বাড়ীর ছেলের মত হয়ে উঠলাম। এমনি এক সময় বছর খানেক পরে তাঁর বড় ছেলে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। একটুখানি ভেঙে গেলেন যেন কবি। তাঁর সখের ফুলবাগানের স্বাস্থ্য শীর্ণ হয়ে এল। গেট খুলে ঢুকেই যে সবুজ কাঁটামুদীর বেড়া চোখে পড়ত তা আর নেই আর ফুলের গাছগুলো বিমর্ষ রোগা কুঁড়িগুলো নিয়ে অন্ধকারে পা বাড়িয়েছে মনে হত।

কিন্তু খুব বেশী দিন গেল না। দেখলাম আবার তাঁর চুল কালো হয়ে উঠছে। ধবধবে পাঞ্জাবী পরে, মসলাযুক্ত সুগন্ধী পান মুখে দিয়ে কলপ লাগানো চুল সযত্নে আঁচড়ে বেরিয়ে আসতেন, বলতেন : চল বেড়িয়ে আসি। তাঁর এই পরিপাটি সাজসজ্জা তাঁর আচরণেও ছিল। আমি ফোন করতে গেলে সাবধান করে দিতেন, জনাব অমুক—এমনি সম্বোধন কর। মোটকথা অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি ভদ্র ছিলেন। কারও মনে কোনক্রমে আঘাত লাগলে তিনি নিজে ব্যথা পেতেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে—'লেখক সংঘ পত্রিকা'র তিনি সম্পাদক। আমি সম্পাদনার কাজে তাঁকে সাহায্য করি। প্রচ্ছদে কবির নাম থাকলে সমালোচনা হবে বলে টাইটেল পেজে তাঁর নাম ছাপা হত। আর পিছনের কভারের নীচে লেখা হত Ghulam Mustafa। একবার এই Mustafa Mostofa হয়ে যায়। প্রুফটা আমি দেখেছি বলে তিনি আমাকে মৃদু তিরস্কার করেন। পরে একদিন আমার এক বন্ধুর সংগে আমার আড়ালে বলেছিলেন : শাহাবুদ্দীনকে সেদিন অমন করে বললাম, আমার উচিত হয়নি কি বল, ও হয়ত দুঃখ পেয়েছে! অথচ আমি মোটেই ব্যথা পাইনি। কবিকে আমি 'দাদু বলে ডাকতাম।' হৃদ্যতাটা ওই ধরনের ছিল। তিনি শ্রদ্ধেয় সুতরাং দুঃখ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর অন্তরে এই কোমল দুর্বলতাটুকু ছিল বলে বোধ হয় কারও প্রতি চির-

শত্রুতার ভাব তিনি বজায় রাখতে পারতেন না। তাঁর পিছনে যাঁরা তাঁর বদনাম করতেন তা তিনি শুনতেন, রুষ্ট হতেন তাঁদের প্রতি, সংগে সংগে তাদের সর্বনাশ করার কল্পনা করতেন, আবার তাঁরা সামনে এলে ভুলে যেতেন, গায়ে হাত দিয়ে কোলে টানতেন, কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। কোন বিষয়ে শেষ পর্যন্ত সিরিয়াস হয়ে উঠতে পারতেন না। তাঁর সাহিত্য-সাধনার সাফল্য এবং বৈফল্যের পিছনে এই দুর্বলতা এবং আন্তরিকতা কাজ করেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি। স্কুল থেকে আমি নজরুলের ভক্ত ছিলাম। তাঁর অগ্নি-উদ্দীপক শব্দগুলো আমাদের রক্তে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করত। তখন সাহিত্যের বিচার ছিল না। আমরা তাঁকে ভীষণ শক্তিমান লেখক বলে ভাবতাম এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব বজায় রাখতে পারতাম না। গোলাম মোস্তফা সাহেবকে তাই ঐ একই কারণে আমাদের প্রিয় লেখকদের তালিকা থেকে পৃথক করে রেখেছিলাম। কোন-দিন খোঁজ রাখতাম না কি কি বই লিখেছেন তিনি এবং তাঁর লেখা কেমন। বলা বাহুল্য তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে পর্যন্ত সেই ভাবটা আমার মধ্যে পুরোপুরি ছিল। মনে আছে প্রথম দিনেই কথাপ্রসঙ্গে তিনি কথাটা তুলেছিলেন : আমাকে সবাই নজরুলের শত্রু বলে কিন্তু বাস্তবিক আমি শত্রুতা করিনি। আমার নজরুলের মতের সংগে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও কখনো সেই মনোভাব কোনদিন পোষণ করিনি। কথাটা বলে তিনি ঘরের ভিতর গিয়ে গোটা দুয়েক ছবি সংগে নিয়ে বেরুলেন। একটিতে তিনি রুগ্ন নজরুলকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন।

পরে ভেবেছি ব্যাপার কি? একথা মিথ্যা নয় যে তাঁর 'নও-বাহার' নজরুলকে যথারীতি আক্রমণ করতে কোনদিন শৈথিল্য দেখায়নি অথচ আবার এই দুর্বলতা কেন? এ কি সংগ্রামে পরাজিত শত্রুর সন্ধি?

আসল কথা শিশুর মত ছিল তাঁর মন—তাদেরই মত কখনো কখনো অবুঝ, নামলোভী এবং ঈর্ষাপরায়ণ এবং তাদেরই মত সরল সহজ আবেগমত্ত এবং বন্ধুপ্রাণ। যখন তিনি লিখেছেন :

> কাজী নজরুল ইসলাম
> বাসায় একদিন গিছলাম

ভায়া লাফ দেয় তিন হাত
হেসে গান গায় দিন রাত
প্রাণে স্ফূর্তির ঢেউ বয়
ধরায় পর তার কেউ নয়।

তখন ছড়াটার মধ্যে আমরা কোন মিথ্যা অনুভূতি অথবা অনর্থক বাকচাতুর্য লক্ষ্য করি না। তেমনি 'নিমন্ত্রিত' কবিতায় 'বিদ্রোহী'কে লক্ষ্য করে তিনি যে বলেছেন :

সেই বাঁধন কারার মাঝারে দাঁড়ায়ে
খালি দুটি হাত উর্ধ্বে বাড়ায়ে
তুই যদি ভাই বলিস চেঁচিয়ে
"উন্নত মম শির
আমি বিদ্রোহী বীর"
সে যে শুধুই প্রলাপ শুধুই খেয়াল
নাই নাই তার কোন গুণ!

সে কথাও মিথ্যা ইচ্ছাপ্রসূত নয়। সাহিত্যে এই ধরনের ব্যাপার অনেক আছে কিন্তু তাঁর ভাগ্য এই ব্যাপারে যে-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমনটি বিরলদৃষ্ট। তিনি অসাধারণভাবে যে উপেক্ষিত ছিলেন তার একটা বিশেষ কারণও তাই। আর তিনি ছেলেমানুষের মত সেই ত্রুটি ঢাকার চেষ্টা করতেন। অন্তরংগ বলে মনে করলেই তাকে বলতেন : দেখ অথবা দেখেন নজরুলের প্রতি আমার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। নজরুল বড় প্রতিভা তাত আমি অস্বীকার করি না। আমি বলেছি নজরুল যত বেশী কবি তার চেয়ে বড় গীতিকার। আমি আগে বলেই অন্যায় করেছি। এখন ত সবাই তাই বলেন।

আর এই সব বলার পর, তাঁর বাড়ীতে হলে তিনি তাঁর পিয়ানোর কাছে যেয়ে বসতেন, প্রায় মেয়েলী কণ্ঠে নজরুলের গান গাইতেন—নজরুল-ভক্তদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য। ক'জন তাঁর আবেদন গ্রাহ্য করেছেন জানি না তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় নজরুলের প্রতি তাঁর একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ ছিল। তা না হলে নজরুলকে তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতেন।

কিন্তু তাঁর কবিতা পড়লে আমরা কি মনে করতে পারি যে, তিনি নজরুলকে অগ্রাহ্য করেছেন ? নজরুলের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে ভিতর-বাহিরের এমনি দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সাহিত্যিকদের মধ্যে এসব নিত্য-নৈমিত্তিক।*

আমাদের দেশে গোলাম মোস্তফা জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে একজন। রচনার শিল্পবিচারে তিনি সমালোচকদের কাছে যে মূল্যই পান জনসাধারণের কাছে তিনি ভাল লেখকদের সম্মান পেয়ে গেছেন। অন্তত 'বিশ্বনবী' লিখে তিনি গর্বসহকারে উচ্চারণ করার মত ভক্তসংখ্যা বাড়িয়েছিলেন। তবু বলতে হয়, যে-নামের সংগে 'কবি' শব্দ সংযুক্ত হয়েছে সেই তিনি কতখানি সমাদৃত ? ঐ শব্দটিকে স্মরণ করবার জন্য তিনি আমাদের কি দিয়ে গেলেন ? তাঁর 'বুলবুলিস্তান' তাঁর 'বনি আদম' তাঁর কিছুসংখ্যক গান আর শিশুদের জন্য কিছু কবিতা এর মধ্যে আমরা এমন কিছু কি আবিষ্কার করতে পারি যা আমাদের কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সুদূরতম নক্ষত্রের দীপ্তি বিলাবে ?

কয়েকটি গীতি-কবিতায় অন্তত সেই লক্ষণ আমরা দেখি যাতে আশ্বাস আছে ; রূপ প্রকাশ করার যে তাগিদ তাঁর ভালো লাগায়, ভালোবাসায়, আশায় এবং স্বপ্নে, অনুমানে এবং কল্পনায় ছিল কবিতা রচনার ব্যাপারে সে অনুভূতিও তাগিদ দিয়েছে ; হয়ত সময় চিনবার, বিষয় নির্বাচন করবার এবং লক্ষ্যকেন্দ্র বেছে নেবার কৌশলে অস্থিরতা দেখিয়েছেন তিনি আর সেইখানেই তাঁর দুর্বলতার দিক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যে-কোন লেখকের রচনায় অগ্রগতির একটা মাপ আছে। রচনার ঔৎকর্ষের বিচার হয় সেই সোপান দেখে। কবিতার ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফা সেই সোপান শ্রেণীর উর্ধ্বতম স্থানে উঠবার পরিশ্রম করেননি। তাঁর কবিতাগুলো লক্ষ্য করলে আমরা একথা বলতে পারি যে, তাঁর রচনাকাল বয়স্ক হলেও

* এই প্রবন্ধটি লেখার সময় গোলাম মোস্তফা লিখিত "নজরুল-কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ" আমি পড়িনি ! হিন্দু-পুরাণ ব্যবহার নিয়ে এই বিতর্কিত আলোচনাটি তিনি লেখেন। সাহিত্যিক হিসেবে এই প্রবন্ধটি লেখা তাঁর উচিত হয়নি। তিনি এই প্রবন্ধে নিম্ন-মানের কাব্যরসবোদ্ধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সাহিত্যে ও শিল্পে থাকতে পারে তবু ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি কিংবা দর্শনের আদর্শ আর শিল্পের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। শিল্পের এই সত্য আদর্শটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর রচনায় সেই পক্বতার রং ফেটেনি। তাঁর প্রথম রচনা আর তাঁর শেষ রচনার মধ্যে আঙ্গিকের বিষয়ের এবং ভাবনার একটা সমান্তরাল মিল আছে। কোনটাই কাউকে ছাড়ায়নি এবং তিনটিই একই পরিমাপে সীমাবদ্ধ।

ভাল কবিতা কিংবা শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্বন্ধে তিনি যে অজ্ঞাত ছিলেন তা নয়। অপরের কবিতা সম্বন্ধে কিংবা সাধারণভাবে কবিতা সম্বন্ধে লিখতে যেয়ে কখনো কখনো তিনি নিজের বিজ্ঞ উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর একটি প্রবন্ধে সমালোচক Landor -এর একটি উদ্ধৃতি আছে :

> We may write little things well and accumulate one upon another, but never will any be justly called a great poet, unless he has treated a great subject worthily.

[ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ : আমার চিন্তাধারা]

যা হোক, ঐ Great subject -ও তাঁর স্বপ্নে ছিল। পরিকল্পনাও ছিল তাঁর বড় কিছু একটা করার কিন্তু সম্ভবপর সহিষ্ণুতা তাঁর ছিল না অথবা তাঁর মানসিক প্রবণতা ছিল নির্ভার সরলতার প্রতি। বিষয় যেখানে সহজ, সরস, সাধারণ এবং আভরণহীন সেখানে তাঁর চরণ কিছুটা দৃঢ় কিন্তু গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে সেখানে তিনি স্খলিতচরণ নিঃসন্দেহে। সহজতার প্রতি আন্তরিকতা চেতনায় সংঘাত ঘটায়, সুতরাং কবিতায় ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্র্য অর্জন অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেই অসম্ভবকে তিনি অর্জন করতে পারেননি। তাঁর স্বভাবের অনুকূল বিষয়টিকে বেছে নিতে পারলে নিজের সীমার মধ্যে তিনি আশ্চর্য কিছু করতে পারতেন হয়ত কিন্তু এমন দূরায়ত পরিধিকে তিন আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন যা তাঁর শক্তির পক্ষে ছিল কঠিনতম অধ্যায়।

বলা বাহুল্য তাঁর কবিতায় তিনজন কবির প্রভাব বর্তমান এবং সে তিনজন হলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ। পৃথকভাবে পথ সৃষ্টি করবার মত প্রবল ক্ষমতা তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছিল না এবং তিনি যে যুগের কবি তাতে স্বাভাবিকভাবে ঐ তিনজন শক্তিমান কবিকে না ছুঁয়ে বেরিয়ে আসাও অসম্ভব ছিল। এই সংগে আরও একজন কবির নাম বোধ

হয় উল্লেখ করা যেতে পারে, মাঝে মাঝে যাঁর কথা তাঁর মুখে শুনতাম—তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল। একদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, অনেকে বলে আমার 'স্বাধীন মিশর' কবিতাটি নজরুলের 'শাতিল আরবে'র অনুকরণে লেখা। ('স্বাধীন মিশর! স্বাধীর মিশর! রক্ত-পতাকা উচ্চশির/শৃঙ্খল-চ্যুত মুক্ত-মধুর দীপ্ত মূর্তি বীর-নারীর!' নজরুলের 'শাতিল আরব! শাতিল আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর/শহীদের লহু দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর'-এর অনুরূপ বলে মনে হয়) তাহলে, তিনি বলতেন, ঐ ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা কবিতার—'ভারত আমার। জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ/কেন গো মা তোর ছিন্ন বসন? কেন গো মা তোর মলিন বেশ?'—নজরুল অনুকরণ করেছে। 'আসলে, তিনি বলতেন, 'দেখ, শাহাবুদ্দীন, সব কবিই কিছু না কিছু অনুকরণ অথবা অনুসরণ করে।'

যা হোক, তাঁর সময়ে বিগত এবং বর্তমান সব কবিকেই তিনি উপভোগ করেছিলেন এবং ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়ও তাঁদের স্বভাব তিনি এড়াতে পারেননি। সেইজন্য একেবারে প্রথমেই তাঁর মধ্যে একটি খাঁটি স্বভাব-কবির চরিত্র লক্ষ্য করি। আমাদের চোখে চিন্তার চেয়ে আবেগের প্রতি, পরিবর্জন এবং পরিমার্জনার চেয়ে অকৃত্রিম গতানুগতিক স্বতোৎসারিত সৃষ্টির প্রতি যাঁদের টানটা বেশী তাঁদেরই উত্তরপুরুষ তিনি। তাই হয়ত একই বিষয়ের উপর লেখা একজন অধিকতর শক্তিমান কবিকে তিনি নিশ্চিতভাবে অনুসরণ করে গেছেন, কোন দিন সে কবিতার জীবনীশক্তি সম্বন্ধে ভাববার অবসর পাননি। তাঁর 'বাচ্চা সাক্কা' 'আমানুল্লাহ' 'গান্ধী শোকে' 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ' 'মোহসীন স্মরণে' ইত্যাদি ব্যক্তিস্তুতিমূলক কবিতা, 'রাখী ভাই', 'মোগল প্রহরী', 'জীবন বিনিময়', 'প্রতিশোধ' প্রভৃতি কাহিনীধর্মী কবিতা, 'মুসলিম' 'শবেবরাতে' 'কোরবানী', 'স্বাধীন মিশর' প্রভৃতি জাগরণীমূলক কবিতা আমাদেরকে যে সত্যি সত্যি আর তেমন আকর্ষণ করতে পারে না তাঁর কারণ ঐ একটা। তাতে কথা আছে কিন্তু কাব্য নেই, একজন সামাজিক মানুষের ভাবনা আছে কিন্তু কবির ভাবনা নেই। এর মধ্যে হয়ত কোথাও কোথাও কবিত্ব

আছে। যেমন :

> আকাশ-তোরণে রশন-চৌকি উৎসব-নিশি আলো জ্বালা,
> ঝালর-ঝুলানো ঝাড় লণ্ঠন পূর্ণিমা চাঁদ সুধা-ঢালা!
> নীল ফিরোজার গালিচা গায়
> কারু-কলা-আঁকা কোটি তারায়
> আসন বিছানো সে মহাসভায় বসিয়াছে খোদ খোদাতালা!
>
> [শবেবরাত : বুলবুলিস্তান]

এই সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা তোলা যেতে পারে। কোন কিছু করে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না তিনি, আবার নিজের তুচ্ছ রচনা নিয়ে খুশিতে মেতে উঠতেন। দেখতাম একবারেই হয়ত তিন চারটে পেন কিনলেন। বাড়ীতে এসে সাদা কাগজের উপর তাদের নিয়ে আজে বাজে লেখার কসরৎ করলেন কোন্‌টার নিব ভাল তাই পরীক্ষা করবার জন্য : মনঃপূত না হলে ফেরৎ দিতেন, ভাল না হলে আবার আর একটা কিনতেন যতক্ষণ না মন মানত। অনেকদিন দেখতাম তাঁকে চিঠি লিখতে আর ক্রমাগত ছিঁড়তে। হাতের লেখা ছিল তাঁর খুবই সুন্দর—আরও সুন্দর করে লিখতে চাইতেন। মার্জিন স্পেস এসব মনোমত হওয়া চাই। তারপর খামের উপর চমৎকার করে ঠিকানা লিখতে হবে। সেটা লিখে ভালো করে দেখবেন সেটা ভালো হয়েছে কিনা। তাঁর চোখের মাপে সেটা যখন যথেষ্ট ভালো বলে মনে হত তখনই সেটা পোস্ট-বক্সে ফেলবার হত উপযুক্ত।

তাঁর পুস্তকের প্রচ্ছদের ব্যাপারে শিল্পীদের তিনি অনেক সময় তিক্ত করে তুলতেন, প্রুফ দেখতে গিয়ে কম্পোজিটারদের প্রায় বিরক্ত করে ফেলতেন, তারপর ছাপা নিয়ে মেশিনম্যানকে। মনে না লাগলে সেটা নেওয়া হবে না, এই খুঁতখুঁতে মনোভাব থেকে সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর সজাগ মনটিকে বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু কবিতা লেখায় তিনি বোধ হয় তাঁর এই মনটির পুরোপুরি ব্যবহার করে যেতে পারেননি। শব্দ-সচেতনতা লেখকদের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ কিন্তু তাঁর কবিতায় এর অভাব আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। এর কারণ কি? ঐ যে তিনি আমাকে এক সময় রহস্য করে বলেছিলেন, "কবিকে যদি ইঁট কিনতে, সিমেন্ট কিনতে হয় তাহলে সে ভাল করে কবিতা লিখবে কখন।"

এটাই কি এর জন্যে দায়ী? ফলত কোলাহল এবং কর্মব্যস্ততা লেখকের নিবিষ্ট মনকে বিচলিত করে, চঞ্চল করে এবং অভিনিবেশের অন্তরে ফাটল ধরায়। গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক জীবনের অর্ধেকের বেশী সময় হেড মাস্টারীতে কেটেছে চিন্তার একটি দীর্ঘ অংশকে তাঁর স্কুলের উন্নতি এবং শাসনের ব্যাপারে নিয়োগ রাখতে হত এবং এরই সঙ্গে তাঁর আর একটি ভূমিকা ছিল কর্তব্যপরায়ণ সামাজিক মানুষের। অবশ্য কবিরাও ত সামাজিক মানুষ এবং সমাজ-সংসার দেখেই ত তাঁরা কবিতা লেখেন। আমরা জবাবটা মেনে নিই, কিন্তু নেশাটা ভাল কবিদের বেলায় খণ্ডিত হয় না। তাঁদের বিশেষ লক্ষ্যটা একটি চক্রকেই অনুসরণ করে ঘোরে। জীবনের সমস্ত উল্লেখ্য অনুল্লেখ্য ঘটনা তাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, সমস্ত উদ্দেশ্য নিয়োজিত হবে তারই পিছনে। এই এতখানি ঐকান্তিকতা সত্যি সত্যি তাঁর ছিল না। জীবনের ভোগকে সীমিত করে শিল্পের পিছনে আত্মোৎসর্গ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই কারণেই ত্রুটি-বর্জিত হয়ে তাঁর কোন কবিতাই সুন্দর হয়ে ওঠেনি। তাঁর একটি অন্যতম ভাল কবিতা 'পাষাণী'। কবির অন্তর এখানে আবেগের স্রোত-ধারায় তরঙ্গসুন্দর অথচ এর প্রথম লাইনের 'পাষাণী'! তোমাকে জানাব ব্যথা এর ভাষা নি।' অথবা 'স্বদেশ নেতার মৃত্যুসমাধির বিপুল মিছিল/ যোগ দিতে পারে নাক তবু তার কেঁদে যায় দিল্।' ইত্যাদি অন্ত্যমিল এবং 'যদি ভাগ্যক্রমে বিদায়বেলায় তুমি কোন মতিভ্রমে'র 'ভাগ্যক্রমে' ও 'মতিভ্রমে'র মত অনুপযোগী অনুপ্রাসিত শব্দ কবিতার স্বাদটিকে পুরো-পুরি গ্রহণ করতে বাধা দেয়। বিষয়ের এই সব ত্রুটির সঙ্গে আছে প্রয়োজন-হীন কথার দীর্ঘ আয়তন যা কবিতার পক্ষে ভয়ংকর সর্বনাশ বললে ভুল হয় না। অথচ এরই মধ্যে দু' চারটি লাইন কবিতার শব্দে গাঁথা হয়ে জীবন-স্পন্দিত হয়েছে। যেমন :

> আশ্বিনের মেঘমুক্ত স্নিগ্ধ স্মিত অরুণ-উষায়
> দাঁড়াইয়া ছিলে তুমি বনপথে বিচিত্র ভূষায়।
> এলাইয়া দিয়াছিলে পৃষ্ঠোপরি ঘনকৃষ্ণ চুল
> দোদুল দুলিতেছিল কর্ণমূলে দুটি স্বর্ণ দুল!
> দূরে ওই পরপারে প্রভাতের নবারুণ রাগে
> গগনের একপ্রান্ত ছেয়ে ছিল গাঢ় অনুরাগে ;

প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতায় আকর্ষণীয় অসাধারণ কোন স্বাতন্ত্র্য আমরা কোনদিন খুঁজে পাইনি। আর কবি বলে তিনি আমাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিলেন না। যে আকর্ষণে আমরা তাঁর কাছে না গিয়ে পারতাম না সেটা ছিল তাঁর শিষ্টাচার, সদালাপ, সুমধুর আন্তরিকতা এবং সাড়া দেবার মত একটা জীবন্ত প্রাণ ; একটা সুহৃদ-হৃদয়। এক নিমেষে তাঁর মত মনের মানুষ হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এ যুগে অল্প মানুষের আছে। সবচেয়ে লক্ষ্য করবার মত ব্যাপার ছিল এই যে, তিনি বয়সের অথবা শ্রেণীর বিভেদটাকে সহসা ডিঙিয়ে যেতে পারতেন।

অসাধারণ সংগীত-ভক্ত ছিলেন তিনি। বাড়ীতে দামী দামী দু'চারটা সংগীতযন্ত্র তাঁর ছিল। প্রায়ই একটা কিছু উপলক্ষ করে গানের জলসা বসাতেন। নাম করা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে দাওয়াত দিয়ে আনলে এই গানের জলসা বসাতে তিনি কোনদিন ভুল করতেন না। তাঁর মৃত্যুতে এই শহরে সেই রকম জলসার বোধ হয় মৃত্যু হয়েছে। এখানে বাঙালী মুসল-মান পরিবারে জলসার ঐ রেওয়াজ আর ত দেখি না।

আপনার মনে করে অনেক সময় নিজের ব্যক্তি-জীবনের অনেক কথা বলতেন তিনি। একদিন তিনি তাঁর আব্বার একটি চিঠি দেখান। দৌলত-পুর কলেজে পড়ার সময় তাঁর আব্বা এই চিঠিটা লিখেছিলেন। সেই চিঠিটা তিনি আমাকে পড়ে শোনান। সব কথা মনে নেই, কিন্তু একটা কথা কোনদিন ভুলব না : বাবা, আমরা গরীব মানুষ অতএব সেই কথা মনে করে লেখাপড়া কর। পিতার ঐ একটি কথা তিনি নিষ্ঠার সংগে পালন করেছিলেন। দারিদ্র্যের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন অনলস চেষ্টায়।

যাকে রিজিড বলে সে ধরনের ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন না, তাঁকে নোয়ানো যেত। নিজের যুক্তিতে সংবদ্ধ হয়ে থাকতেন না। তিনি, নিজের ভুল হলে তিনি মেনে নিতেন মুখ কালো না করে। দেখেছি অনেকে তাঁর এই নরম মনের সুযোগ নিয়ে তাঁকি ঠকিয়েছেন কম না। সহসা বিশ্বাস করে এই মুস্কিলে পড়েছেন তিনি অনেকবার, বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু পুনরায় সেই ফাঁদে পড়তে তাঁর দেরি হয়নি।

আর মুসলমানদের কথা শুনলে তিনি মেতে উঠতেন—নেশার মত কি যেন তাঁকে পেয়ে বসত। খাওয়া-দাওয়ার কথাও হয়ত ভুলে যেতেন।

ইসলামিক হিস্ট্রির অনেক বই ছিল তাঁর বাড়ীতে। তাঁর পড়াশুনার বেশী সময়টা তিনি ঐ দিকে ব্যয় করেছেন। গতানুগতিকভাবে তাঁর কবিতা লেখার জন্যে ঐ বিশেষ দিকটায় তাঁর যথোচিত মনোনিবেশকেও কিছুটা দায়ী করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্বে তাঁর উপর লেখা একটি প্রবন্ধে সে-রকম একটি আলোচনা আমি করেছি। সেখানে বলেছি : গোলাম মোস্তফা খুব ঝরঝরে গদ্য লিখতেন। তাঁর 'বিশ্বনবী', 'আবুবকর' ও 'আমার চিন্তাধারা' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থে সেই প্রসাদগুণযুক্ত গদ্যের আমরা সাক্ষাৎ পাই যা খুব সামান্য বাঙালী মুসলিম লেখকের হাতে রূপ পেয়েছে। আমার মনে হয় গদ্য লেখক হিসেবে তাঁর সার্থকতা তাঁর কবিতা রচনার সার্থকতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

প্রসংগত তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা বলার আছে।

আমরা চরিত্রবান মানুষদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে গণ্য করতে পারি। অন্তত তাঁর আদর্শ থেকে তিনি কোন দিন অন্যপথে পা বাড়াননি ; নিজের মত ও পথকে ভ্রান্তলক্ষ্যে কখনো আকর্ষণ করেননি ; পরাজয়ের মুহূর্তেও বিশ্বাস হারাননি, চঞ্চল হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বাসে অন্তরিত হননি। উদাহরণ স্বরূপ আমি এইটুকু বলতে পারি যে শেষের বয়সের দিকে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে খাটলেও তাঁর অন্তরকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় তাঁর হৃদয় কখনো উদ্বোধিত হয়নি। হয়ত তাঁর স্বরাজ্য থেকে একটু বাইরে আসতে পারলে তিনি নিজেরই কিছু উপকার করতে পারতেন। কিন্তু নিজেকে ভণ্ড বানিয়ে তিনি আর বাহবা পেতে চাইলেন না। তাঁর সেই পুরনো বিশ্বাসকেই যুক্তি দিয়ে অবিচল রাখতে চাইলেন। তিনি মুসলিম ঐতিহ্যে, মুসলিম সংস্কৃতিতে আজীবন বিশ্বাস করেছেন, নিজের সমাজের দুর্বলতায়, হীনমন্যতায় আঘাতে অবিশ্বাসে তাঁর বিপুল আস্থা তিলমাত্র বিনষ্ট হয়নি ; অথচ তাঁর সময়ে তাঁর বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের সমাজে তখন শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প, প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানাবার লোকের সংখ্যা কম ; সুতরাং তাদের কাছ থেকে গুণীর সম্মান পাওয়ার আশা ছিল অল্প। এ জন্য আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা নিজের সমাজের প্রতি বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ ; সমাজের

প্রতি এই বিদ্রোহের ভাবের প্রকাশ গোলাম মোস্তফার লেখায় কোথাও নেই। কিন্তু এ-কথা সত্য গোলাম মোস্তফা মোল্লাতন্ত্রকে পছন্দ করতেন না। তা করলে নিশ্চয়ই তিনি সংগীত-চর্চা থেকে বিরত থাকতেন। এর থেকে তাঁর সত্যিকার মনটিকে বুঝে নেয়া বোধ হয় কঠিন নয়।

নজরুল একাডেমী পত্রিকা
শীত-বসন্ত : ১৩৭৭

আমীর হোসেন চৌধুরী

১৯৬৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে আমীর হোসেন চৌধুরী নিহত হন। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে একজন সুস্থ নীরোগ মানুষের এই ধরনের মর্মান্তিক মৃত্যু এ দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আহত করেছিল।

১৯৫৯ সালে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এরপরে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটে। দেখতাম স্বভাবে তাঁর কিছুটা বোহিসেবী ভাব আছে। হয়ত এই ধরনের চরিত্রের জন্যই তিনি নজরুলকে এত গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং তাঁর প্রকৃত মূল্য জানবার জন্য আকুলভাবে চেষ্টা করতেন। তাঁর আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরাম সেই আন্তরিক প্রচেষ্টারই নিদর্শন।

লক্ষ্য করতাম নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলোর প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। যেগুলোর মধ্যে বিদ্রোহ, অসাম্যের প্রতি প্রতিবাদ অথবা মানবতার জয়ধ্বনি আছে সেগুলোকে মহার্ঘ বস্তুর মত তিনি মাথায় তুলে নিতেন। তিনি এ পর্যন্ত নজরুলের যতগুলি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন তার মধ্যে একটিও প্রেমের কবিতা নেই এবং তাঁর লেখা Voice of Nazrul-এ প্রেমের কবিতার লেখক হিসেবে নজরুলকে কোথাও তিনি পরিচয় করাননি।

নিজে তিনি সাহসী ছিলেন, বাধার বিরুদ্ধে দুরন্ত প্রয়াসে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন ; আস্থা ছিল তাঁর মানুষিক এবং মানবিক শক্তির প্রতি আর দরদ ছিল তাঁর অসহায় ও বিপন্নের প্রতি। দুর্ঘটনার মত সেদিন যে মৃত্যু তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁর জন্যে দায়ী তাঁর ঐ সাহস, ঐ মানুষিকতা এবং বিপন্নের প্রতি দরদী হৃদয়ের অকৃপণতা।

ঠিক নজরুলের মত স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন বলে চাকরি করাটাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। একবার দায়ে পড়ে কিছুদিনের জন্যে তিনি সরকারী চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু কাজটাকে যেই মাত্র তিনি দুর্বলতা বলে ভাবলেন সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করলেন না। বেছে নিলেন ব্যবসায়। তাঁর পরিচিত বন্ধুরা জানেন আর্টসের গ্রাজুয়েট হলেও তিনি বিজ্ঞানের প্রতি অনীহ ছিলেন না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি রসায়নবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। এবং সেই হেতু রিসার্চের জন্য তিনি একটি ছোটখাট লেবরেটরীও বানিয়েছিলেন। এই লেবরে-টরী থেকে তিনি 'এলিওসিন' নামে একটি পেটেন্ট ওষুধ বের করেন। শুনেছি টাইফয়েডে এই ওষুধটি ভাল ফল দিত। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন রংয়ের ছাপার কালিও তৈরী করতেন। দেশী কালি বলে ছাপাখানায় এর কদর খুব বেশী ছিল না, তাই এর ব্যবসায়ও তিনি খুব একটা জোরেশোরে চালাতে পারেনি। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তাঁকে আরও একটি জিনিস তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। পাটের চটের উপর এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে তিনি রেক্সিনের মত কিছু একটা করেছিলেন। স্যুটকেস, পোর্টফলিও ব্যাগ, জুতো, পাটের আঁশ থেকে কম্বল, কোট, উল ইত্যাদি ধরনের জিনিসপত্রও তিনি ঐ জুট থেকে বানিয়েছেন। চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই বাংলাদেশে আসবেন বলে উপহার দেয়ার জন্য তিনি প্রায় ১৫০·০০ টাকার মত ব্যয় করে অপূর্ব দুটি স্যুটকেস তৈরী করেন। নিজের হাতে সে দুটিকে আর তিনি চীনের মন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পারেননি।

এই যে সব দেশী দ্রব্য তৈরী করে তার প্রচারের প্রচেষ্টা, তার পিছনে ছিল তাঁর দেশ-প্রেমিক মনটির প্রেরণা। তাঁর এই দেশপ্রীতি সম্বন্ধে ছোট্ট একটি কথা মনে পড়ে গেল। অনেক দিন পরে সেদিন অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দিনপনেরো পূর্বে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। বললেন, দেখ, শাহাবুদ্দীন আমি একটা দেশী কুকুরী পুষেছি। সবাই বিলিতী এ্যাল-সেসিয়ান পোষে আর বলে, সেগুলোই শিক্ষিত হয়। আমি প্রমাণ করব যে একথা মিথ্যা। উপযুক্ত শিক্ষা এবং যত্ন পেলে বিদেশী কুকুরের মত এদেশের কুকুরও শিক্ষিত হতে বাধ্য। আমার সে কুকুরকে একদিন দেখে এস। সেও ঐ বিলিতী এ্যালসেসিয়ানের চেয়ে কম হয়নি। তাঁর

কথা মিথ্যা নয়। তাঁর বাড়ীতে পোষা কুকুরটি দেখবার মত এটাকে হয়ত হাসির ব্যাপার মনে হতে পারে; কিন্তু আমি জানতাম যে, নিজের দেশকে তিনি অন্য দেশের চেয়ে কখনই ছোট মনে করতেন না। বরং এর যে-কোন বিষয়কে বড় মনে করে তুলে ধরতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও এবং বিলিতী কায়দায় চলাফেরা করলেও বিলিতী মানুষ আর বিলিতী দ্রব্যের প্রতি তাঁর বরাবরই একটি আশ্চর্য ঔদাসীন্য ছিল। তাঁর মানে তিনি ইংরেজদের যে ঘৃণা করতেন তা নয় বরং তাদের আচার-ব্যবহার ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসাই করতেন। কিন্তু তিনি চাইতেন ঠিক সেই জিনিসটি তাহল যে অন্ধের মত তাদের অনুকরণ না করে নিজেকে অপরের কাছে অনুকরণের বিষয় করে তোলা। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে আত্মশক্তি ফিরে আসুক এই ছিল তাঁর আন্তরিক বাসনা। আর এদিক দিয়ে তিনি নজরুলের মত আশ্চর্য আশাবাদী ছিলেন।

আমি জানি মাঝে মাঝে সংসারে তাঁর কী পরিমাণ অনটন নেমে আসত। কিন্তু তবুও তাঁর অমিতব্যয়ী হাত অকুণ্ঠভাবে ঋণ করে খরচ চালিয়ে যেত। একদিনের তরেও মুখের মধ্যে বিপদের সংকেত দেখা দিত না। তাঁর স্ত্রী প্রবল চেষ্টা করেও এই দুর্দান্ত বয়স্ক শিশুটিকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু কোন্ সাহসে তিনি এমন করতেন? সে তাঁর দুরন্ত আশা। ভবিষ্যতে নিশ্চয় সুদিন ফিরে আসবে, দুঃখের দিন চিরকাল থাকে না, অন্ধকার একদিন দূর হবেই, আমাদের রাত্রি নিশ্চয় স্হিত হয়ে থাকবে না—এই বিশ্বাস দুর্ভেদ্যভাবে তাঁর মনে ঠাঁই নিয়েছিল বলে নিশ্চিত পতনের মুখেও তাঁকে অবিচলিত স্তম্ভের মত সংসারটিকে মাথায় নিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। আমরা যখন ভয়ে কুঁচকে যাই, আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা দেখে পশ্চাৎমুখী হই, গভীর নৈরাশ্যে পৃথিবীর বৃত্তসীমার বাইরে আশ্রয় পাবার চেষ্টা করি তখনও এই লোকটি দিব্য হাসিমুখে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। ঠিক এই ধরনের বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে যেয়েই তাঁকে ঘাতকের ছুরির বুক পেতে নিতে হল। দাঙ্গা যে হচ্ছে তা তিনি জানতেন, দাঙ্গার মধ্যে তিনি যে এসে পড়েছেন তাও তিনি জানতেন, তবু বুদ্ধিমানের মত তিনি পালিয়ে এলেন না কেন? কেন তিনি শিশুর মত বোকামী করলেন

নিজের জীবননাশের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে? এঁরা সেই ধরনের পুরুষ যাদের পরিচয়ে 'কা' অক্ষরটি কোনদিনই আমল পায় না। এবং শুধু এই একটি কারণেই আমাদের ভীরু জীবনের পক্ষে এদেরকে শ্রদ্ধা জানান হয়ত কর্তব্যই।

আমি বলেছি তিনি অমিতব্যয়ী ছিলেন। এটি কি তাঁর দোষ না তাঁর অকৃপণ হৃদয়ের ঔদার্য! কাউকে তিনি খুশি করতে পারলে আনন্দে মেতে উঠতেন। ইনি সেই ধরনের বন্ধু ছিলেন যিনি বন্ধুত্রাণের জন্য নিজের হাতে কড়া পরতেও দ্বিধা করতেন না। যখন সংসার একেবারে অচল তখনও পকেটের শেষ কটি টাকা দিয়ে বন্ধুর হাতকড়া ছাড়াতেও দেখেছি তাঁকে; সে বন্ধু হয়ত প্রকৃত অন্যায় করে এমন শাস্তি পেয়েছে; তবু বন্ধু সে, তার ইজ্জত না রাখলে নিজের ইজ্জত থাকত কোথায়! আমার মনে হয় এইসব বন্ধুকে খুশি করার জন্যই তিনি সর্বাধিক ব্যয় করেছেন। কখনও ব্যবসায়িক লাভে তাঁর হাতে হাজার হাজার টাকা আসত। তখন বাড়ীতে প্রায় প্রতিদিনই বাদশাহী খাবারের আয়োজন হত। নিজের সংসারের গুটি কয়েক লোক নিয়ে এই খাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না, এতে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। সবাইকে খাওয়াতে হবে এবং নিজে খেতে হবে তবেই না আনন্দ। এই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবের জন্যেই তাঁর সম্ভ্রান্ত ধনী আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাঁর কিছু গরমিল ছিল। বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন লোককে আপ্রাণ ঘৃণা করতেন তিনি। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তাঁদের সাহচর্যও এড়িয়ে চলতে চাইতেন অথচ ভোজ্যদ্রব্যের বিলাসিতায় কিছুটা বুর্জোয়া চালকে তিনি ছাড়তে পারতেন না। এই ভোজনবিলাস তাঁকে বারংবার দুঃখের মধ্যে টেনে নিয়ে যেত। পয়সা তিনি অল্প আয় করেননি, শুধু জমিদারী খরচটুকুকে যদি তিনি সামলাতে পারতেন তাহলে তাঁর সন্তানহীনা স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় পড়তে হত না। হয়ত তিনি নিশ্চিন্তভাবে স্বামীর স্মৃতিটুকু নিয়ে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতেও পারতেন।

তবু বলব আমাদের এই অসংখ্য কুণ্ঠিত প্রাণের দেশে আমীর হোসেন চৌধুরী ঔদার্যে অপার ব্যতিক্রম। আমাদের মধ্যে অনেকের অনেক থাকলেও সে শুধু নিজের ভোগের জন্যেই থাকে। কিন্তু আমীর হোসেন সেই

ভোগবিলাসের পাপে অন্তত নিজেকে ডুবিয়ে দেননি। বরং বিপন্ন বন্ধু, অসহায় ছাত্র, আশ্রয়হীন অনিকেতকে সাধ্যাতীতভাবে সাহায্য করেছেন।

একজন লেখক কলম্বাসের মুখ দিয়ে বলেছিলেন : Danger is the breath of my life. আমীর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে থেকে দেখেছি তিনিও কেমনভাবে ঐ বিপদকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ভয়ংকর বিপদের মুহূর্তে তাঁর হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠেনি কোনদিন।

মৃত্যুর বছর খানেক আগে হয়ত মারাত্মক একটি বিপদের ইঙ্গিত সাক্ষাৎ টের পেয়েই তিনি রিভলবার কিনেছিলেন। মৃত্যুর ঠিক তিনদিন পূর্বে মতিঝিল বাস স্ট্যাণ্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় : রিভলবার দেখিয়ে বলেছিলেন : শাহাবুদ্দীন, দৌলতপুরে, তোমার দুলাভাইয়ের বাসা গুণ্ডায় লুঠ করেছে। আমার এখানে এলে হয়। গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। বুঝলে না শক্তের বিরুদ্ধে শক্তির প্রয়োজন। কঠিন শত্রুকে কঠিন আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শুনেছি মৃত্যুর আগে অন্তত একজন গুণ্ডাকে তিনি গুলি করতে পেরেছিলেন। আর সে গুলি ঠিক মাথার খুলিতেই করেছিলেন।

অসহায়কে বাঁচাবার প্রয়াস পেলেও ঠিক অহিংসানীতিকে তিনি পছন্দ করতেন না। যাকে বৌদ্ধপ্রেম বলে অথবা বৈষ্ণবসহিষ্ণুতা তা ছিল তাঁর মেজাজবিরুদ্ধ। এইজন্যে নজরুলের মেজাজ তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। তিনি নজরুলের মতই বিশ্বাস করতেন :

> বাবা ভূত ত ভূত ঐ মারের চোটে
> ভূতের বাবাও উধাও ছোটে।

তাঁর নিজস্ব একটি রাজনৈতিক মতবাদও ছিল এবং তাও কতকটা নজরুলের মত। ধর্মের চেয়ে মনুষ্যত্ব যে আরও বড় তার প্রচারে তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন। যাকে খাঁটি সাহিত্যিক বলে তা তিনি ছিলেন না। নজরুলকে প্রচার মানে তাঁর সাহিত্যের প্রচার ঠিক নয়। যে ভাবনার অনুকূলে রিক্ত অবহেলিত মানুষ মানুষের সমাজে মর্যাদা পেতে পারে তাকে অসম্মান করব কেন? যদি শুধু প্রেমের প্রচারণায় পৌরুষের বিনাশ ঘটে তবে সে প্রেম পরিত্যজ্য। তিনি মনে করতেন রবীন্দ্রনাথে সেই প্রেম আছে

যা পুং শক্তির ক্ষমতা নাশ করতে পারে। হয়ত এইজন্যে তিনি লিখেছেন :

> Rabindranath's most favourite BAUL songs are full with frustrations, renunciations, self-denials and full of idle thoughts—complete surrender to the whims of the creator.
>
> [Nazrul & Rabindranath]

শেষ লাইনটি লক্ষ্য করবার বিষয়। এই যে complete surrender এটাকে তিনি মনে করেছিলেন মানুষের আমিত্বের এবং আত্মশক্তির বিনাশ। চঞ্চল পৃথিবীতে কর্মী মানুষের সাধনা তবে কি হবে? তিনি বলছেন সকল বিঘ্নের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং তা অতিক্রমের মানসিক শক্তি। নজরুলের মধ্যে তা ছিল :

> Nazrul challenged God in every step wherever he found disparity, inequity, injustice and other unfair deals of the society.
>
> [Nazrul & Rabindranath]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন না করি আমি ভয়' কবিতাতে মানুষকে ঠিক নিয়তিনির্ভর হতে বলেননি। তবুও সেত ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থনা। একথা যেন কেউ না ভাবেন যে আমীর হোসেন চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে ছোট করার চেষ্টা করেছেন। না, তা নয়। যাকে কবিত্বশক্তির বিচার বলে তাঁর লেখায় তা নেই। তিনি শুধু মতের পার্থক্য দেখিয়েছেন। নইলে তাঁর 'Nazrul & Rabindranath' বইয়ের শেষ কটি লাইন এমন হত না :

> Both Rabindranath and Nazul condemned communalism religious bigotism and racial hatred. Both of them were of international outlook.

একটি কথা এইপ্রসঙ্গে বলি, নজরুলের কবিতায় শেষের দিকে যে একটি সুফীভাবের আবির্ভাব হয় আমীর হোসেন চৌধুরী সে দিকটায় ফিরেও চাননি। তিনি বোধ হয় বুঝেছিলেন ওটা তাঁর মস্তিস্কবিকৃতির পূর্ব-লক্ষণ। এদিক দিয়ে তিনি কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের মতই।

তাঁর Voice of Nazrul এর মধ্যে তাঁর এই নিজস্ব চিন্তা দেখতে পাব যদি তা প্রকাশিত হয়। অসাহিত্যিক অভিব্যক্তি বলে এই গ্রন্থখানির মূল্য যদি আমরা না দিই তবে সেটা আমাদের এক ধরনের সংকীর্ণতারই পরিচয় হবে।

আমীর হোসেন চৌধুরী সম্বন্ধে আর একটি প্রধান কথা ব'লে এ প্রবন্ধ শেষ করব আমি। তিনি বাংলার ভাল ইংরেজী অনুবাদ করতেন। নজরুলের কতকগুলি কবিতার অনুবাদের জন্য রাশান এমব্যাসি থেকে তাঁকে ৫00 টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু শুধু পুরস্কার পেয়েছিলেন বলেই তাঁর অনুবাদ যে ভাল তা নয়। আমাদের ধারণা তিনি বেশ ভালই অনুবাদ করতেন। অন্তত প্রাণশক্তির দিক থেকে তাঁরই অনুবাদ অধিকতর সজীব। নিজের মধ্যে বিদ্রোহ-চেতনা থাকাতেই সেই অনুভূতি হয়ত কিছু পরিমাণে তাঁর অনুবাদে ধরা পড়েছিল। আমি দু'চার লাইন স্মরণ করতে পারি। নীচে তারই দুটি উদাহরণ উদ্ধৃত করলাম :

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর

অনুবাদ :

The blazing godly light dazzles on my forehead
Like the sparkling crest of a triumphant head.

কিংবা

ওরে ও পাগলা ভোলা,
দেরে দে প্রলয়-দোলা
গারদগুলা জোরছে ধরে হেঁচকা টানে
মার হাঁক হায়দরী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভী ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে।

অনুবাদ :

O my carefree joyful comrade
give a powerful destructive swing
Pull down those prison walls
with a swift and sudden
jerk of your hand.
Carry the massive wardrum on your back
and rend the sky with your
thundering battle cry ;
Invite the gallant death to usher
in the dawn of a glorious life.

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তাঁর এই অনুবাদ শুধু শব্দানুবাদ নয় বরং প্রেরণার অনুকৃতি। তা নইলে 'ওরে ও পাগলা ভোলা'কে তিনি O my carefree joyful comrade করবেন কেন? কেনইবা নতুন শব্দ যোজনা করবেন? একে কি এক প্রকারের অনুবাদের দোষ বলব? তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, শব্দ রক্ষা করে অনুবাদ করলে নজরুলকে আর বাঁচান যেত না। তাঁর কথাটিকে ঠিক নির্ভাবনায় বাদ দেওয়া যায় কি?

যাই হোক, তাঁর এই অনুবাদগুলি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। এগুলির মধ্যে কখনও কখনও দু'একটির তর্জমা অমৃতবাজার, পাকিস্তান অবজার-ভার অথবা মর্নিং নিউজে ছাপা হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশই আজও ভালো চোখের আড়ালে পড়ে আছে। তার কারণ তিনি জাত সাহিত্যিকের পাঠ নিতে পারেননি বলে সাহিত্যিকেরা তাঁকে কোন দিন সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর এই পাণ্ডুলিপিটি কি কোন দয়ালু প্রতিষ্ঠান ছাপাতে স্বীকৃত হবেন? কোন একজন প্রকাশক তাঁর একটি ইংরেজী পাণ্ডুলিপি কিনে নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি কি সেটাকে ছাপিয়ে ঔদার্যের পরিচয় দেবেন না!

আমীর হোসেন চৌধুরী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ হল। আমরা যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছি তারা তাঁর কথা চিরদিন মনে রাখব এবং আমার দেশবাসীর কেউ যদি তাঁকে শ্রদ্ধা জানান তবে বলব তিনি যেন আমীর হোসেন চৌধুরীর সেই কথাই মনে রাখেন যে, আমাদের এই দেশে

যেখানে অন্ধকার আজও অপরাভূত সেখানে একদিন আলোর আবির্ভাব হবেই। আমীর হোসেন চৌধুরীর সেই বাসনা পূর্ণ হলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে—যদি আমরা আশাবাদী মন নিয়ে তাঁরই মত ভাবতে পারি যে, দুর্দিনের একদিন অবসান হবেই এবং নক্ষত্রবিহীন রাত্রির পরিসমাপ্তিতে সূর্য উঠবেই।

পরিক্রম
কার্তিক : ১৩৭০

শিল্পী আব্বাসউদ্দীন

গায়ক হিসাবে আব্বাসউদ্দীন আহমদের স্থান কোথায়? বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসে যে সব গায়ক অমরতার মালায় নিজেদের নাম গেঁথে গিয়েছেন সেখানে তাঁর স্থান হবে কি?

তাঁকেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা সম্ভব বাঁধা গতের মাঝখানে যিনি অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন। শ্রোতার কাছে একঘেঁয়ে বলে প্রতিভাত বিষয়কে পুনরাবিষ্কার বলে না যদি না তার মধ্যে অপরিচিতকে উপঢৌকন দেয়া যায়। শিল্পী হিসেবে সেই অজানিত নতুনের আস্বাদ কি দিতে পেরেছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ? এই সব প্রশ্ন জাগে মনে।

একজন চিত্রকর, একজন লেখকের বেলায় এইসব বিচার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় কিন্তু একজন গায়কের বেলায় ভবিষ্যৎ, তাঁর কণ্ঠবিচারের জন্য বিপজ্জনক। কি নিয়ে বিচার করব তাঁকে? কণ্ঠ ত মানুষের মৃত্যুর সংগে সংগে কালস্রোতে ভেসে যায়। আজ আর কানে শুনে বিচার করাবার মত নেই মিয়াঁ তানসেন, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, করিম খাঁ অথবা বড়ে গোলাম আলীর সমকক্ষ গায়ক অথবা তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন কিনা? অবশ্য বর্তমান যুগ পূর্বের সেই অমানিশার অন্ধকারকে কাটিয়ে উঠেছে। মানুষের কণ্ঠ ধরে রাখার জন্য গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডারের সৃষ্টি বিজ্ঞানের অপরূপ কীর্তি। সৌভাগ্যক্রমে আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠ হারাবার আর ভয় নেই কোন। তবু আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠ আব্বাসউদ্দীনের গানের রেকর্ডে অবিকৃত থাকবে কি না? নিখুঁতভাবে তা যদি সংরক্ষিত হয় তবে তাকে আগামী কালের কাছেও এগিয়ে দেওয়া যাবে। আর তা হলে রেকর্ড করে তাকে জীবন্ত করে রাখার চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

নতুন রেকর্ড পুরণো হয়ে গেলে আর নতুন গানের স্বাদ পাওয়া যায় না। পিনের চণ্ডুর অবিরাম আঘাতের ফলে অনেক মধু উবে গেছে ইতোমধ্যে আব্বাসউদ্দীনের গানের। কালের তৃষ্ণার্ত ঠোঁট ধাতুর মধ্যে

মিশ্রিত কণ্ঠসঙ্গীত সুধা কোন কোন রেকর্ড থেকে শুষে নিয়েছে অনেকখানি। আমাদের কৈশোরের রোমাঞ্চলুব্ধ মনটিকে যে কণ্ঠ একদিন সংগে নিয়ে হেঁটে বেড়াত দিকবিদিকে তার পদযুগলের সতেজ আহ্বানে সেই আগের মত তীব্রতা নেই যেন। আব্বাসউদ্দীনকে সঠিকভাবে তাঁর সমসাময়িককালের মানুষেরা যে-ভাবে পেয়েছিলেন, সেই যৌবনদীপ্ত কণ্ঠটিকে সঠিকভাবে রেকর্ড পেঁৗছে দিতে পারবে না ভবিষ্যৎ সংগীত-ভক্তদের কানে। তাহলে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে কিসে এবং কারা? ইতিহাস? উপকথা? লোকশ্রুতি? তাঁর ভক্তগণ কিংবা তাঁর শিষ্যসমূহ?

আব্বাসউদ্দীনের গানের শ্রোতা আছে, ভক্ত আছে। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের উৎকর্ষের বিচার কি সেই সমস্ত ভক্তশ্রোতারা করবেন? কারা সেই ভক্তবৃন্দ? যাঁরা গায়ক তাঁরা কি শুধু?

প্রশ্ন জাগে গানের বিষয়ে অভিজ্ঞ সংগীতশাস্ত্রবিদ্ই একমাত্র বিচারক, না যাঁরা গানের ভক্ত সেই রুচিশীল শ্রোতারাও সেই বিচারে শরীক হওয়ার যোগ্য?

কণ্ঠের যথার্থ বিচারক কান এবং শিক্ষিত কান। কারও কারও কান শিক্ষিত এবং পুরোপুরি সংগীতশাস্ত্রবিদ না হয়েও এমনি কিছু শিক্ষিত কান আপনা-আপনি জন্মে।

বলা বাহুল্য যে কবিকে ছন্দ-ব্যাকরণ শিখে ছন্দ শিখতে হয় তিনি আর কবি হন না কোন দিন। কবির মন অন্য কবির সাহচর্যের ফলে আপনা হতেই উদ্ভাবন করে ছন্দ; এবং গানের বেলায় এ জিনিসটাকে এক করে দেখা অন্যায় হবে না; যদিও চিত্রশিল্পের এবং নৃত্যশিল্পের মত সংগীতে শিক্ষণীয় কিছু আছে, কিন্তু তাও ভাষা শিক্ষার মত প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ মাত্র। বস্তুত শাস্ত্র শিখে বড় গায়ক হওয়া যায় না; সংগীত-প্রতিভা নিয়ে জন্মালে তবে বড় গায়ক হওয়া সম্ভব। বলা যেতে পারে আব্বাসউদ্দীন আহমদ সংগীত-প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। শাস্ত্রবিদের বিচার তাঁকে যে শ্রেণীতেই উত্তীর্ণ করুক, তিনি যে প্রকৃতির বরপুত্র ছিলেন একথা অনস্বীকার্য।

তিনি মুসলমান ছিলেন বলেই যে যুগের হাওয়া তাঁর সুনাম কীর্তনে ফেঁপে উঠেছিল তা নয়, সে-কালের পাখীগুলো পর্যন্ত যেন আব্বাস-

উদ্দীনের গান কণ্ঠে নিয়ে উড়ে বেড়াত চতুর্দিকে। এমন একটা বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিল তাঁর কণ্ঠ যে, অনেক বন্ধ ঘরের জানলা তাঁরই সুরের আঘাতে খুলে গেছে। যে-সব ঘরে কতদিন রৌদ্র উঁকি মারেনি, খড়খড়ি খুলে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে উদার রৌদ্রের। অনেক অন্ধকার ঘুচে গিয়েছিল সেই কণ্ঠরৌদ্রের দীপ্ততায়। এবং বাঙালী মুসলমানের ইতিহাসে সেটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু কেবল কি আব্বাস-উদ্দীনের কণ্ঠ? আব্বাসউদ্দীনের দীপ্তিমান কণ্ঠাঘাতে জেগে উঠেছিল নাকি তন্দ্রালীন বাঙালী মুসলমান, না জেগেছিল তাঁর কণ্ঠবাহিত বাণীর আঘাতে? ঐ বাণী কি অন্য কণ্ঠে সংস্থাপন করলে তার সাধ্যে কুলোত না ঐ অসাধ্য সাধন, ঐ সব সিমেন্ট করা কুসংস্কারের দেয়ালগুলোর বিচূর্ণায়ন?

রবীন্দ্রনাথের গান যিনিই গান না কেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের বাণীকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। যে-কোনো উত্তম কণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গান করুক তাকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে হয়। এবং পঙ্কজ মল্লিক রবীন্দ্র-নাথের গানের একজন বিশিষ্ট গায়ক মাত্র। ফলত রবীন্দ্র-সংগীতের সুর তন্দ্রালীন স্বপ্নজগতের বটে তবু সে সুর বাণীর সংযোগেই সমৃদ্ধ। জানি তারযন্ত্র যখন রবীন্দ্র-গীত পরিবেশন করে তখন ছন্দে মন দোলা দেয়, কিন্তু তার মধ্যে ঐ অতীন্দ্রিয় বাণীগুলো লুকানো থাকে বলেই যে তা যাদুর ফোয়ারা সৃষ্টি করে তাও জানি। বস্তুত যথার্থ সুরের সংগে বাণীর সম্পর্ক নেই কোন। এবং হিন্দুস্থানী অনেক খেয়াল গানের মধ্যেও আছে অতি সাধারণ কথা। সেখানে গায়ক তার কণ্ঠের অসাধারণ কলাকৌশলে সুরের দ্বারা সেই সামান্যকে অসামান্য করে তোলে। বাণী সেখানে অপ্রধান। একমাত্র সুরের উত্থান-পতন, কখনো ঋজু রেখায়, কখনো দ্রুত পলায়মান সর্পের বঙ্কিম গতিতে, কখনো মেঘবক্ষে সঞ্চারিত অপসৃয়মান বিদ্যুতের, দক্ষিণে বামে ত্রিভুজের কোণাকৃতি, কখনোও বা বৃত্তাকৃতি, কোণ সৃষ্টি করে, এবং কখনও বা কম্বুরেখায় তরঙ্গভঙ্গে আরোহণ-অবরোহণের মধ্য দিয়ে কোনো এক অসীম অন্তরালে প্রবেশ করা। বলা বাহুল্য পাখীর গানে পক্ষীভাষা থাকলেও মানুষের অবোধগম্য তা। অথচ কোকিল কবি-প্রিয় এবং মানুষের কান যেমন সমুদ্র-তরঙ্গে তেমনি বন-মর্মর, শিশিরপাত, ঝর্ণাধারা এবং দাদুরী কণ্ঠে সংগীত আবিষ্কার করে। এবং

যাঁরা চিত্রশিল্পী তাঁরা এমনকি উড়ন্ত পাখীর ডানায় গান খুঁজে পান এবং স্তব্ধরেখার মধ্যে গান ফুটে না উঠলে তা শেষ পর্যন্ত প্রাণহীন চিত্র বলে প্রমাণিত হয়। আব্বাসউদ্দীন আহমদ সেই শাখাহীন শূন্যতায় সুরের বৃন্তহীন ফুল ফোটাবার সাধনা করেননি, তাঁর কণ্ঠ চিরকাল বাণীর বীণায় বেজেছে।

কথাই সব কিছু হলে অভিনেতার কি কোন কৃতিত্ব থাকবে না ? কথার অসাধারণত্ব ত অভিনয়ের অসাধারণত্বে আরও অসাধারণ হয়ে ওঠে। অভিনয়ের তাৎপর্যে যেমন কথা প্রাণময় হয় তেমনি কণ্ঠের তাৎপর্যে গানের কথাও হয় জীবন্ত। বস্তুত বাণীর মধ্যেও যে-সব অকথিত বাণী থাকে গায়কের কণ্ঠ সেই অলক্ষ্য বাণীকেই টেনে তোলে এবং সেই অকথিত বাণীর একজন দক্ষ রূপকার আব্বাসউদ্দীন আহমদ।

গীতবাণীর সত্যিকার রূপকার ছিলেন তিনি। রূপার্চনার দক্ষ শিল্পী। তিনি জানতেন একটা শব্দকে কিভাবে সঞ্চারিত করা যায়। সেইজন্য বিশুদ্ধ উচ্চারণ যাকে বলা হয় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল শ্যেনের মত। তিনি জানতেন কেবল উচ্চারণদোষে গানের অনেক মধু উবে যায় ; জানতেন বাণীর মর্মকথাটা কি। সাধারণ চোখের অনধিগম্য অন্ধকারে সুরের মশাল জ্বালিয়ে শ্রোতাকে তিনি সংগে নিয়ে যেতে পারতেন কখনো কখনো।

আজও যে ইসলামী গানগুলো তাঁর কণ্ঠের মতো অন্যের কণ্ঠে তেমন রোমহর্ষকভাবে দুলে ওঠে না তার কারণ তাঁর মত বিশ্বাসের জীবন্ত আবেগ অন্যের গলায় অতটা শক্তিমান না।

প্রতিধ্বনির উৎসের সংগে, পরমের সংগে পরিচয় ছিল আব্বাস-উদ্দীনের। যে জন্যে তাঁকে অমরা একজন কবিও বলতে পারি। তাঁর পরে যে তাঁর মত আর একজন গায়ককে আমরা পেলাম না তার কারণ বোধ হয় এই যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জাগিয়ে রেখে বাণীর মধ্যে সুরের সন্ধান তাঁর মত আর কেউ করছেন না—অন্তত আমাদের এই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে। আমরা জানি না তিনি উচ্চাংগ সংগীত সেধেছিলেন কি না। কিন্তু তার সংস্পর্শ ব্যতীত যে তাঁর কণ্ঠের অতটা সুষ্ঠুতা আসেনি সেটাও না ভেবে পারি না। অভিনয়ের যে কথাসমূহকে ভেন্ট্রিলোকুইজম বলে,

অর্থাৎ অভিনেতা তাঁর বাক্‌ভঙ্গীর দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেন যে স্বরের মাধ্যমে, অপরিচিতের কণ্ঠ হিসাবে সেই ম্যাজিকাল স্বরভঙ্গির ব্যাপার আব্বাসউদ্দীন আহমদের গানে অলক্ষ্য নয়। যদিও, যেমন উচ্চাংগ সংগীতের কোন শিল্পী স্বর নিক্ষেপ করে নিস্তব্ধ হয়ে যান এবং যাদুকরের মত আধা অন্ধকারের মধ্যে ভূত নাচান অদৃশ্য তন্তুর লাটাইয়ে, তেমনি অবচেতনার রহস্যময় আলো-আঁধার নিয়ে, ধ্যানস্থ হননি তিনি। তবু সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্যে তাঁর দান অতি সামান্য বলে মনে হয় না। বস্তুত বাণীর মাধ্যমে যা তিনি রচনা করেননি সুরের মধ্যে তাই রচনা করে গিয়েছেন, বিশেষ বাক্‌ভঙ্গীতে বাক্যকে দিয়েছেন পরমের স্পর্শ।

এ-কথা বলার অর্থ হল এই যে, এমনি গ্রাম্যগীতি এবং আব্বাস-উদ্দীনের কণ্ঠের পল্লীগীতি কিছুটা পৃথক ব্যাপার। শব্দান্তরালের বাণীর গূঢ়ার্থ জানার জন্য প্রাচীন পদ্ধতি আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে আধুনিক হয়ে উঠল। গান সৃষ্টি করে নয়, গান গেয়ে মুসলিম সমাজে তিনি সঙ্গীতের রেনেসাঁর জন্ম দিলেন। বলাবাহুল্য নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, যে কাজ করেছিলেন তাঁদের লেখনীর সাহায্যে, আব্বাসউদ্দীন তা করলেন তাঁর কণ্ঠের সাহায্যে। এবং এ-কথাও যথার্থ যে, আব্বাসউদ্দীনকে ঐ সৌন্দর্যের ফুল ফোটানোতে সাহায্য করেছিলেন—বিশেষ করে নজরুল ইসলাম। তাঁর বাণীর আধুনিকতাই তাঁর সুরের আধুনিকতার মৌল কারণ। যদিও একথা বিশ্বাস করি নির্মলেন্দু লাহিড়ী যেমন শচীন সেনগুপ্তের সিরাজ-উদ্দৌলা নাটকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক তেমনি ইসলামী গান এবং পল্লীগীতির অদ্বিতীয় গায়ক আব্বাসউদ্দীন।

বাউল গান রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন ; কিন্তু বাউলদের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের পার্থক্য হল এই যে, রবীন্দ্রনাথের গান গান ত বটেই, কবিতাও বটে, বলা যেতে পারে যতটা গান তার চেয়ে বেশী কবিতা। বাউলের কথায় মার্জনা নেই, রবীন্দ্রনাথের গানে মার্জনা আছে, বাউলের গানে বুদ্ধিশাসিত শিল্পের শৃঙ্খলা নেই, রবীন্দ্র-সংগীতে আছে নির্ভুল আঙ্গিকের বিন্যাস, ছন্দের নিখুঁত সমতা।

এবং আব্বাসউদ্দীন আহমদ ঐ রুচির বৈপরীত্যের জন্য একজন আধুনিক গায়ক। যাঁর কণ্ঠ ছিল সোচ্চার, ভাষা ছিল স্পষ্ট, উচ্চারণ ছিল

রুচি-মার্জিত, নাগরিক, এবং সেইজন্যে, আধুনিক। এ-দিক থেকে আব্বাসউদ্দীন একজন স্রষ্টাও বটেন! এবং বর্তমানে শহরে যে-সব ভাটিয়ালী এবং ভাওয়াইয়া গাওয়া হয় তা ঐ গ্রাম্য ভাটিয়ালী এবং ভাওয়াইয়া নয়, একটু কান পেতে শুনলে মনে হবে তার মধ্যে আব্বাস-উদ্দীনের মার্জিত কণ্ঠই গোপনে মিশে গিয়েছে।

আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠ জনপ্রিয় কেন? চড়া সুরে গান গাইতেন তিনি। তাঁর গান নিঃসঙ্গের, নিভৃতের আলাপ নয়, তাঁর গান জনতার, নিদ্রার নয়, জাগরণের; কেঁদেছেন তিনি, আস্তে নয়, চেঁচিয়ে, ঘরে কপাট লাগিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে নয়, হুহু করে, দশের চোখে ধরা দিয়ে। এই দিক দিয়ে নজরুল ইসলামের সংগে তাঁর সাদৃশ্য আছে। এইজন্যে নজরুল ইসলামকে তিনি ভালবেসেছিলেন এবং এইজন্যে নজরুল ইসলামের গান গাইতে তিনি আনন্দ পেতেন। সে গান প্রাণ খুলে গাওয়া যায় উদাত্ত কণ্ঠে, সে গানে প্রাণকে নাচানো যায় তাথৈ তাথৈ নৃত্যে।

এবং একথা বলা অপ্রাসংগিক হবে না, নজরুল ইসলামের গানই আব্বাসউদ্দীনকে নতুন করে জন্ম দিয়েছিল। আত্মার ক্ষুধার সামগ্রীটা তিনি নজরুল ইসলামের ইসলামী গানের মধ্যে পেয়েছিলেন। ঐ আগুনের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল তাঁর প্রাণ-প্রদীপের সলিতা এবং তাই তার স্পর্শে তিনি অমন দপদপ করে জ্বলে উঠেছিলেন।

বাংলাদেশে আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় মুসলমান গায়ক ছিলেন। কে. মল্লিক তিনি। পুরো নাম আবুল কাসেম মল্লিক। শিল্পী হিসেবে আধুনিক শ্রেষ্ঠ গায়কদের সংগে তাঁর দুস্তর ব্যবধান ছিল না। কিন্তু তিনি যে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের অন্তরে ঠাঁই পাননি তার কারণ বোধ হয় এই যে, আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে যে যৌবন-জোয়ার ছিল, যে স্পষ্টতা এবং তীব্রতা ছিল, যে অন্তর এবং আবেগ ছিল, তা তাঁর কণ্ঠে ছিল না।

আব্বাসউদ্দীনের সমসাময়িককালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আরও কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঔজ্জ্বল্যে কেউ ছায়াপাত করতে পারেননি। তার কারণ তাঁর পথটাই ছিল ভিন্ন। একটা স্বতন্ত্র পথ বেছে নিতে পেরেছিলেন বলে তাঁর স্বাতন্ত্র্য জ্বলেছে শুকতারার মত। জীবিতাবস্থায় তাঁর পাশে দাঁড়াবার মত তাঁর স্বাতন্ত্র্যের ঐ আকাশে

আর অন্য কোন আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্র ছিল না। সুতরাং ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া এবং ইসলামী গানে আমরা তাঁর অনুগামীদের দেখেছি, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দেখিনি।

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াও সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে। কেননা ঐ জগতের অমন প্রেমিক বিরলদৃষ্ট।

সত্যিই তিনি প্রেমিক ছিলেন এবং একজন অকপট ধার্মিক। কিন্তু তাঁর এ ধার্মিকতা তিনি মুসলমান বলে নন, তিনি প্রেমিক বলে। এবং সেইজন্য শুধু ইসলামী গানেই তাঁর কণ্ঠ সুধাময় হয়ে উঠত না, তাঁর কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের ছবিও রঙিন হয়ে ফুটত।

বলা বাহুল্য গানকে ঐ প্রেমিক হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন বলে তাঁর কণ্ঠে কোন গানই অভক্তির আঁধারে আকুঞ্চিত থাকত না। শুধু সুর নয়, গানের কথাকে তিনি ভালবাসতেন। এবং কথার মাদকতাকেই তিনি নিঙড়ে ঢেলে দিতেন সুরের মধ্যে, তাই সুর ও কথা একাত্ম হয়ে স্ফুরিত হত তাঁর গলায়।

বারংবার উচ্চারণের ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে যে ছবিটা গড়ে ওঠে সেটাই হল গানের প্রাণ। তিনি সেই প্রাণসত্তার স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত গান পরিবেশন করতেন না।

ফলত তাঁর কন্ঠই প্রথম হিতসাধক গানকে প্রভূতপরিমাণে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। অনেক যুগোপযুগী গান গেয়েছেন তিনি। এবং তিনি যেটা গেয়েছেন সেটা তাঁর চেয়ে ভাল করে আর কেউ গাইতে পারেননি।

গানকে তিনি প্রার্থনার মত পবিত্র মনে করতেন। এবং শুধু সেইজন্যে তাঁর অনুভূতির অকৃত্রিমতা ধরা পড়ত তাঁর সুরে এবং তাঁর ভিতর থেকে যে জ্যোতি ঠিকরে পড়ত তাতে শ্রোতা বিহ্বল না হয়ে পারত না। ঐ ধ্যানটুকু ছিল বলেই উচ্চাংগ সংগীতের শিল্পী না হয়েও তিনি আমাদের কাছে মহৎ শিল্পী হয়ে রইলেন।

নজরুল একাডেমী পত্রিকা
শীত : ১৩৭৭

জীবনানন্দ দাশের কাব্য : একটি সমীক্ষা

নিজের কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন :

> আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে ; কেউ বলছেন, এ কবিতা প্রধানতঃ প্রকৃতির বা প্রধানতঃ ইতিহাস বা সমাজচেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার ; কারও মতে এ কাব্য একান্ত প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়্যালিস্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সব আংশিকভাবে সত্য--কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।

অর্থাৎ তিনি তাঁর কবিতার চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচকদের উক্তিকে কিছুটা মানলেও তাদের সামগ্রিক বিচারকে সমর্থন করতে পারেননি। অবশ্য কোন কবির কাব্যের নির্ভুল বিচার একেবারে অসম্ভব। কারণ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও ব্যক্তির মানসিক পরিমণ্ডল ভ্রমণের কোন অবাধ সুযোগ নেই। এবং কাব্য যেহেতু মানসিক সৃষ্টি তাই তাঁর আভ্যন্তরীণ ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সহজ অধিগম্য নয়। তবু সব কিছু স্বীকার করেও অনায়াসে একথা বলা যায় কাব্যের একটা সামগ্রিক আবেদন আছে, এবং বিষয় ব্যতিরেকে যেহেতু কোন কথারই উৎপত্তি হয় না তাই বিষয়ের বিচারও আছে, যদিও তা গাণিতক সমাধান নয়। সে হিসেবে জীবনানন্দ দাশের কাব্য দুরূহ হলেও দুরধিগম্য নয় এবং তাঁর কাব্যের অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা যেহেতু অনেক বেশী তাই তাঁর সম্পর্কে আলোচনা নানা রকম হতে বাধ্য। আর সে আলোচনা সর্বাংশে সত্য না হলেও আংশিক সত্য। সম্পূর্ণ না বুঝলেও অনুভবে তাকে উপলব্ধি করা কঠিন নয়। আর একথা সত্য—কাব্য শেষ পর্যন্ত অনুভূতিরই ব্যাপার।

জীবনানন্দের কাব্য-শরীর প্রহেলিকাময় বিষাদে আবৃত। আঙ্গিকের কপটতায় তার আভ্যন্তরীণ সত্য প্রচ্ছন্ন। কিন্তু সমস্ত কুয়াশাকে বিদীর্ণ করে সেখানে যন্ত্রণার এক অদৃশ্য সত্তা জলদর্চীর মত প্রদীপ্ত। এই বুদ্ধি-গত চেতনায় উৎকণ্ঠিত আত্মার বেদনাকে অনায়াসে এ যুগের আর্তমানুষের মনচ্ছবি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আর্ভিং ব্যাবিটের শিষ্য এলিয়টের মাধ্যমে উৎসাহজনকভাবে যে গোষ্ঠী রবীন্দ্র-রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বাংলা কাব্য-জগতের ইতিহাসে নবযুগের সূত্রপাত করলেন জীবনানন্দ তাঁদেরই একজন হলেও তাঁর নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ বোধ হয় তাঁর উপলব্ধির অন্তরালে নিহিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি' জন্মাবার আগেই জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' মুদ্রিত হয়েছিল। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে এবং পাঠক হিসেবে পাশ্চিমী আধুনিক কবিদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদেরই কাব্যগত বিষয়ের উপস্থিতি তাঁর লেখায় থাকার অভিজ্ঞতাগত কারণ আছে। এজন্য আমাদের একবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চোখ ফেরানো দরকার।

ইংরেজ শাসনের জিঞ্জিরকে ভাঙার আকুল প্রয়াস ; নিরঙ্কুশ শোষণে নিপীড়িত ভারতবাসীর মনে প্রথম মহাযুদ্ধের হিমশীতল হাওয়ার স্পর্শ ; বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের উদ্বোধনে জাগরিত আত্মার সম্মুখে পশ্চিমের মিথ্যাচারে আশ্রিত সত্যাদর্শের মুখোশ উন্মোচন ; ফ্রয়েড, বার্গসঁ প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকের অবচেতন মনের রহস্য উদ্ঘাটন ও সর্বোপরি ধর্ম এবং নীতিবাদে বিশ্বাস-বিরহিত চেতনাই হল সেই ইতিহাসের পটভূমি। জীবনানন্দ দাশ যেহেতু ইতিহাসের এই পৃষ্ঠার অন্তর্গত যুগের মানুষ তাই সংশয়, নিরাশা, অনাস্থা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় তাঁর কাব্যকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। শ্রীমণ্ডিত—কারণ এ কাব্য শুধু বিলাস নয় তারও চেয়ে অনেক বেশী অর্থ-বোধক। সে অর্থকে জানতে হলে আমাদের জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ফিরে যাওয়াই সুসমীচীন হবে বলে মনে করি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অবসরের গান'-এ জীবনানন্দ দাশ বলেছেন :

> পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই—
> কোনো কৃষকের মত দরকার নাই দূরে মাঠে গিয়ে আর

রোধ অবরোধ ক্লেশ কোলাহল শুনিবার নাহিক সময়।
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোনখানে
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়।
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের
আগুনের রং
দামামা থামায়ে ফেল—পেঁচার পাখার মত
অন্ধকারে ডুবে যাক রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সং !

এ শুধু কাব্য পড় কাব্য করা কি ? সংসারের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাহীনতা কি কোন অনাহত মানুষের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব ? এই কাব্য সেই বোধ-মূল থেকে উৎসারিত, প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতায় বিক্ষুব্ধ যে বোধ নিপীড়িত। জীবনানন্দের কাব্য সৃষ্টি তাই কোন বহিরাশ্রয়ী ঘটনা মাত্র নয়, সনাতন জীবন-জিজ্ঞাসার অন্তর্গত ইতিহাস।

শাক্যরাজ্যের মোহ ত্যাগ করে একদিন সিদ্ধার্থ বেরিয়ে পড়েছিলেন মানুষের মুক্তির সন্ধানে। কেবল সন্ন্যাসী হওয়ার আবেগ নয়, নয় শুধু সংসারের দায় এড়াবার জন্য নির্জন অলসতায় আত্মমৃত্যুতে অবগাহন ; বরং কঠিন কর্তব্য সাধনের দুর্বার প্রয়োজনের তাগিদেই সুখ বিসর্জনই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এই দায়িত্বজ্ঞান জীবনানন্দ দাশেও লক্ষ্য করা যায় ; তাই শুধু পলায়নী মনোবৃত্তির পোষক বলে তাঁকে চিহ্নিত করা অন্যায়। তিনি লিখেছিলেন :

গভীর ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল
হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন ?
[অন্ধকার : বনলতা সেন]

কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ-কথাও লিখেছিলেন :

মাটি পৃথিবীর টানে মানব-জন্মের ঘরে কখন এসেছি
না এলেই ভালো হ'ত অনুভব ক'রে

এসেছে যে গভীরতর লাভ হ'ল সেসব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে।

এর উত্তরে যে স্ববিরোধিতার প্রশ্ন উঠবে সেকথা ঠিক ; কিন্তু গভীর সত্য হল, এ-আপাত বৈষম্যের অন্তরালে দ্বন্দ্বহীন মীমাংসা আছে।

পার্থিব জীবনের দুটো দিক হল আলো আর অন্ধকার। বিবর্তনের চক্রে একজনের আগমনে অপরের অন্তর্ধান স্বাভাবিক। একা আলো অন্ধকারকে গ্রাস করে চিরঞ্জীব হতে পারে না, আকাশের চিরঞ্জীব কৌতুক মৃত অন্ধকারের বুক থেকে রাত্রির বীজ উৎপন্ন করে এবং সেই বীজোৎসৃষ্ট বৃক্ষশাখায় সন্ধ্যার ছায়া ডেকে আনে। বোধিসত্তায় জাগরিত জীবনানন্দকে তাই যখন বলতে শুনি :

সারাদিন মিছে কেটে গেল
সারারাত বড্ড খারাপ
নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে
জীবন দিনরাত দিনগত পাপ
ক্ষয় করবার মত ব্যবহার শুধু—

তখনই ঘুরিয়ে এ-কথাও তাঁকে বলতে শুনি :

ফণিমনসার কাঁটা তবুও ত স্নিগ্ধ শিশিরে মেখে আছে !

বস্তুত এ ধারণা জীবনানন্দ দাশের ছিল যে অন্ধকারই প্রকৃত আলোর জন্মদাত্রী। মানুষের সমস্ত সৃষ্টি-ক্ষমতার উৎস শব্দহীন তামসী। সূর্যের রৌদ্রাঘাতে মানুষের অন্তরচারী মন বাইরের প্রকৃতিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে ; নিবিষ্ট হয়ে বুঝবার, সৃষ্টি করবার উপযুক্ত চিন্তার তাব অবসর থাকে না। তাই বহির্চারী সে মনকে গুটিয়ে আত্মস্থ চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন করতে গেলে রাত্রির প্রয়োজন আছে। সে রাত্রি অনিষ্টের নিয়ামক নয় বরং ইষ্টেরই সাধক। তাই 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবি সময়ের কাছে বলে যান :

নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীত শব্দ
জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন

অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে নাকি মানবকে চিনে ?
তবু প্রতিটি মানুষের ষাট বসন্তের তরে
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র রাত্রি সিন্ধু রীতি মানুষের বিষন্ন হৃদয়
জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ অরুণোদয় জয়।

এই বিশ্বাস, এই আশাও তাঁর জেগেছিল। অথচ জন্ম-আশাবাদী তিনি ছিলেন না। তাই যে বুদ্ধির বিজ্ঞানে তাঁর দূরপ্রসারী দৃষ্টি আলোক উদ্ভাসনার স্বপ্ন দেখেছিল তারই কৃপায় সে বিজ্ঞান রচিত ফাঁসিরজ্জুও তাঁর বোধকে এড়িয়ে যায়নি। এই বোধের কথা একদিন তিনি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে বলেছিলেন :

স্বপ্ন নয়, শান্তি নয় ভালবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়।
আমি তারে পারি না এড়াতে
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয় : পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়।

[বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি]

এই শূন্যতা বোধ তাঁর যুক্তিজাত আশাকে বারংবার সংশয়িত করে তুলেছে, তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন নিজেকে :

তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয় স্বপনের সফলতা, নবীনতা
শুভ্র মানবিকতার ভোর ?

এই দুর্বলতাই তাঁকে সম্পূর্ণ আশাবাদী করে তুলতে পারেনি। মীমাংসায় হয়তো তিনি পেঁছিতে পারতেন কিন্তু তাঁর বিশেষ শিক্ষা সে-পথে বাদ সেধেছিল। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস পরিক্রমায় তিনি দেখেছেন ;

মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোন দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া
কোনো প্রিয় সাধ নেই।

এই বয়স্ক অভিজ্ঞতালব্ধ বোধি আশার বুক কুরে কুরে খায়। কিন্তু আশা ভিন্ন মানুষের বাঁচার উপায়ই বা কি ? এই সাংঘাতিক মরণোন্মুখ চিন্তায় নিমগ্ন মানুষের আত্মহত্যা ছাড়া গতি আছে কি ?

জীবনানন্দ দাশ এ-যুগের মানুষ। ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা শূন্য মাফিক। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর ঈশ্বর নেই—অন্তত যেখানে যেয়ে দু'দণ্ড অশ্রু বিসর্জনে আনন্দ পাওয়া যায়। তাঁর চেতনায় তাই সদা জাগ্রত মৃত্যুই অচপল হয়ে থাকে :

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে।

এই morbidity —যা একদিন রাশিয়ার ঔপন্যাসিক ডস্টয়েভস্কি, ফ্রান্সের কবি বোদলেয়ার এবং জার্মান কবি রিলকেতে আত্মপ্রকাশ করেছিল তারই প্রকাশ দেখি জীবনানন্দে—সেই বিষাদ যা ধূসর-সুন্দর বাস্তবতার প্রতীক।

পূবালী
১৯৬১

রূপসী বাংলার কবি

কোন একজন কবিকে তাঁর কোন একটি গ্রন্থে সামগ্রিকভাবে পাওয়া যায় না কিন্তু কবি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটুকু হয়ত পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'য় সমগ্র জীবনানন্দ দাশ অনুপস্থিত কিন্তু জীবনানন্দের কবি-স্বভাবটি সেখানে উপস্থিত।

অনেকে জীবনানন্দ দাশকে প্রকৃতির কবি বলেন। উক্তিটি সঠিক কি না সে বিচার করার আগে 'রূপসী বাংলা'র কবিকে ঐ আখ্যায় ভূষিত করলে তা একেবারে অযৌক্তিক বলে মনে করা হয়ত অসংগত হবে। বাংলার প্রকৃতিকে এমন নিবিড়-নিবিষ্টভাবে চিত্র-শিল্পীর মত চোখে তাঁর আগে বোধ হয় আর কোনো কবি দেখেননি। এ-কাব্যে আর সব কিছু ছাড়িয়ে নিসর্গই প্রধান হয়ে উঠেছে—উদ্ভিদ আর কীট-পতঙ্গের জগতে কবি যেন নিজের শারীরিক সত্তা হারিয়ে মিশে গেছেন মাঝে মাঝে।

এ-কাব্যের পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার আগে একটি কথা বলা আবশ্যক। জীবনানন্দ দাশের অনুজ অশোকানন্দ দাশ গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন :

> এই কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি সংকলিত হ'ল, তার সবগুলিই কবির জীবিত-কালে অপ্রকাশিত ছিল ; তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাগুলি প্রথমবার যেমন লেখা হয়েছিল ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপি-বদ্ধ-অবস্থায় রক্ষিত ছিল ; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

আর জীবনানন্দ দাশ এর কবিতাগুলি সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন

(অশোকানন্দা দাশের ভূমিকায় উদ্ধৃত) তা হ'ল :

> এরা প্রত্যেকে আলাদ আলাদা স্বতন্ত্র-সত্তার মত নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিকবোধে একশরীরী—গ্রাম বাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশপ্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর।

প্রথমত, আমরা লক্ষ্য করছি কবির জীবদ্দশায় এ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি, দ্বিতীয়ত, এর পাণ্ডুলিপি কবি কর্তৃক পরিমার্জিত নয় এবং তৃতীয়ত, 'একটি বিশেষ ভাবাবগে আক্রান্ত হ'য়ে কবিতাগুলি রচিত হ'য়েছিল'।

এ-কাব্যে কবির নিসর্গ-প্রীতির সংগে যেমন মিশে আছে স্বদেশ-প্রেম তেমনি ইতিহাসচেতনার সংগে মিশে আছে মৃত্যুচেতনা। ঐ মৃত্যু-চেতনা ও স্বদেশ-প্রেমের উপলব্ধির মধ্যে লুকিয়ে আছে কবির 'বিশেষ ভাবাবেগ'—কে বলবে ঐ 'বিশেষ ভাবাবেগে'র মধ্যে লুকিয়ে নেই কবির জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয়তাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসচেতনা। যখন কবি বলেন :

> তখন এ জলসিঁড়ি শুকায়নি, মজেনি আকাশ,
> বল্লাল সেনের ঘোড়া— ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
> শব্দ হ'ত এই পথে—আরো আগে রাজপুত্র কত দিন রাশ
> টেনে টেনে এই পথে—কি যেন খুঁজেছে, আহা হয়েছে উদাস ;
> আজ আর খোঁজাখুঁজি নাই কিছু—নাটাফলে মিটিতেছে আশ—

তখন বোঝা যায় শুধুমাত্র বর্ণনার মধ্যে কবি-আত্মা অন্তরীণ নয় ; শুধু ভেসে আসা 'সুদূর স্মৃতির সুরভি' বিলিয়েই কবি তাঁর কর্তব্য সমাপন করতে চাচ্ছেন না—ওর পিছনে লুকিয়ে আছে কবির সমাজচেতনা 'সুন্দরীর কটাক্ষের নীচে শিরা-উপশিরার মত'।

সমস্ত কাব্যগ্রন্থের পিছনে এই চেতনাই আছে ; তাঁর ইতিহাসচেতনা, মৃত্যুচেতনা এবং নিসর্গপ্রীতির মধ্যে যে আবেগ পুঞ্জীভূত তাতে তেল জুগিয়েছে ঐ চেতনা।

উপরে উদ্ধৃত ঐ কবিতাংশটির—'আরো আগে রাজপুত্র কতদিন রাশ/ টেনে টেনে এই পথে কি যেন খুঁজেছে—' বাক্যটি পাঠকের আবার রূপকথার

জগতেরও আমন্ত্রণ জানায়। একই সংগে এ-কাব্যে কবির ঐতিহ্যচেতনা নিস্পন্দ হয়ে নেই। আমরা যখন পড়ি :

১· আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা ;
যেইখানে সব চেয়ে বেশি রূপ—সব চেয়ে গাঢ় বিষন্নতা ;
যেখানে শুকায় পদ্ম—বহু দিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব ;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর !

২. —চারিদিকে বাঙালীর ভিড়
বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি ;

৩. অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে
মাঠে মাঠে ফিরি একা : মনে হয় বাংলার জীবনে সঙ্কট
শেষ হ'য়ে গেছে আজ ;—চেয়ে দেখি কতশত শতাব্দীর বট
হাজার সবুজ পাতা লাল ফল বুকে লয়ে শাখার ব্যজনে
আকাঙ্ক্ষার গান গায়—অশ্বত্থেরো কি যেনো কামনা জাগে মনে :
সতীর শীতল শব বহু দিন কোলে লয়ে যেন অকপট
উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে,—চন্দ্রশেখরের মত তার জট
উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে ;

মধুকূপী ঘাস ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর
আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
কালীদহে ক্লান্ত গাংশালিকের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,

আসিয়াছে চন্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার
শঙ্খমালা চন্দ্রমালা : মৃত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

তখন বাংলার লোক-সংস্কৃতি, লোক-সাহিত্য, লোক-ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি কবির বাঙলা প্রকৃতি-প্রীতির মতই একটা মমতার স্বাদ পাওয়া যায়। বাঙলার সত্যিকার রূপ যে এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই সেই স্মৃতিভারাক্রান্ত কথা ক্লান্তিহীন সুরে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি এমনও মনে হয়েছে আবেগে আপ্লুত কবি ঐ সব বর্ণনার চোখের কোণায় পর্যন্ত অশ্রুকণা ফুটিয়ে তুলেছেন, মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি ভারসাম্য।

লোকগাথার নায়ক কিংবা নায়িকাকে কিংবা বাংলার কোনো ইতিহাস পুরুষকে জীবনানন্দ প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেননি, কোনো উপমায় ব্যবহার করেননি—স্মৃতিভারাক্রান্ত হৃদয়ে অতীত বাংলার জগতকে রূপ-কথার কাহিনীর মত বর্ণনা করেছেন দীর্ঘশ্বাসের বিষাদ-মাধুরী জড়িয়ে।

স্মৃতি-বর্ণনার এই প্রকাশ ভঙ্গিটি জীবনানন্দের অনন্য। জীবনানন্দের অনন্যতা সেইখানে প্রস্ফুটিত। ঐতিহ্যগত প্রকাশরীতির সাধারণ মাধ্যমকে ভেঙে চুরে বিদ্রোহী জীবনানন্দ নতুন রীতির এক আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন, ছন্দের, অলঙ্কারের, শব্দ ব্যবহার ও বিশেষণ প্রয়োগের সমস্ত প্রাচীন নিয়মকে—ধারাবাহিক নিয়মকে—উল্লঙ্ঘন ক'রে—যা তিনি তাঁর 'ধূসর-পাণ্ডু-লিপি' থেকে শুরু করে শেষ পর্যায়ের সমস্ত কাব্যগ্রন্থে করেছেন—এ কাব্যে তিনি নতুন এক প্রকাশ-রীতির স্বাদ পাঠকের চিত্ত-অধরে শারাব-জামের মত তুলে ধরেছেন। বস্তুরূপ আর ভাবরূপের ভেদাভেদ চূর্ণ করে অনিয়মের দ্বারা তিনি ভাষার অঙ্কের নতুন সূত্র উদ্ভাবন করেছেন এবং এইভাবেই অধরা, অশরীরী, বস্তুবিশ্বের অন্তরালে লুকানো রঙকে, অতিপ্রাকৃতকে তিনি এক আশ্চর্য দেহ-দান করেছেন। এই কারণে বাঙলা কাব্যের সাধারণ ধারার কক্ষচ্যুত গ্রহের মত তিনি নিজস্ব সৌরমণ্ডল সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং সে-জন্যেই তিনি নির্দ্বিধায় অত্যন্ত স্পর্ধাভরে বলতে সাহস করেছেন—'আমার মত নেই কেউ আর'।

'রূপসী বাংলা'য় বাংলার রূপ-প্রকৃতি বর্ণনায়, নিসর্গের চিত্র রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব 'পৃথক সৃষ্টির মহিমায় উজ্জ্বল'। অন্যান্য কবিদের থেকে তাঁর কবি-স্বরূপের পার্থক্য কোথায় তার কারণ নির্ণয়ের জন্যে এখানে একটি

সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক উদাহরণ তুলে ধরলে আমার বক্তব্য ক্লান্তিকর হবে বলে মনে হয় না।

বাংলার প্রাকৃতিক রূপ রবীন্দ্রনাথে :

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী-পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন-নৌকা বাঁধা। শূন্যঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝুট্‌পটি। শ্যামশষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছপক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্রপক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহুদূরে।
থেকে থেকে ডেকে উঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য 'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে ব'সে আছি আমি পরবাসী॥

প্রবাস বিরহদুঃখ মনে নাহি বাজে,
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে।
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে ; ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখি পতঙ্গ সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্ব জন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ ॥

[মধ্যাহ্ন : চৈতালী]

রবীন্দ্র-বর্ণিত এই প্রকৃতি বাংলাদেশের। লক্ষ্য করবার বিষয় এ-কবিতায় উপস্থাপিত 'মাছরাঙা', 'নদীকূলে' 'জনহীন নৌকা বাঁধা', 'রাজহাঁস', 'শুষ্ক তৃণগন্ধ' 'খঞ্জন' 'শালিক', 'চিল'—'রূপসী বাংলা'য় ফিরে ফিরে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু ঐ রাবীন্দ্রিক ছন্দে নয়, ঐ ভঙ্গিতে নয়। জীবনানন্দ দাশ সহসা যেমন আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে তোলেন এখানে তেমনি নিবিড় ভোগের স্বাদ অনুপস্থিত। যদিও 'শুষ্ক তৃণগন্ধে' রবীন্দ্রনাথ কিছুটা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রসদ জুগিয়েছেন এবং 'কভু শান্ত হাম্বাস্বর, শালিকের ডাক, কখনো মর্মর জীর্ণ অশথের, কভুদূর শূন্য-'পরে চিলের সুতীব্র ধ্বনি'র বর্ণনায় আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলেছেন তথাপি সম্পূর্ণ কবিতাটি দর্শনেন্দ্রিয়ের উপভোগ্য শারীরিক রূপ। নিসর্গ বর্ণনায় জীবনানন্দ যেমন একসময় নিজেই নিসর্গে রূপান্তরিত হতে চান রবীন্দ্রনাথও উপরোক্ত কবিতায় তেমনি নিজেকে নিসর্গ বস্তুর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেছেন—মানুষের রূপ বদলে যেন তিনি 'পূর্বজন্মে'র 'পশু-পাখি পতঙ্গে'র রূপ ধারণ করেছেন—যে সমান ভাবনায় জীবনানন্দও 'রূপসী বাংলা'র একস্থানে বলেছেন : 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় / হয়ত মানুষ নয় হয়ত বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।' রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ রূপে স্তব্ধ মুহূর্তে আত্মমগ্ন হয়ে আপ্লুত আবেগে ভাবছেন তিনি তাঁর 'পূর্বজন্মে' যেন ফিরে গিয়েছেন—মানুষরূপে জন্মাবার পূর্বে নিসর্গে

যে-ভাবে তিনি মিশে ছিলেন। আর জীবনানন্দ স্বদেশের নিসর্গরূপে প্রেমাপ্লুত হয়ে 'জন্মানো'র বাসনা করেছেন প্রশান্ত আবেগে আবেশে। লক্ষ্য করবার বিষয় দু'জনের মনেই জন্মান্তরবাদের ধারণা কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে বাংলার প্রকৃতিকে সামনে রেখে বিশ্বপ্রকৃতিতে সাঁতরে চলে গেছেন—চলে গেছেন 'ধরণীর বক্ষতলে'। জীবনানন্দ বাংলার প্রকৃতিতেই আত্মমগ্ন—কেননা তিনি বাংলার নরম রূপ দেখেছেন। বাংলার প্রকৃতি যে পৃথিবীরই প্রকৃতি তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতি কাজ করেছে, সেখানে দৈশিক দ্রাঘিমা রেখার সুস্পষ্ট ভেদচিহ্ন নেই এবং সে-জন্যেই এখানে প্যারোকিয়াল সেন্টিমেন্ট অনুপস্থিত ; জীবনানন্দ দাশের এই প্যারোকিয়াল সেন্টিমেন্টই তার 'বিশেষ ভাবাবেগ'—তাঁর দেশপ্রেম। অবশ্য এই সেন্টিমেন্ট, এই স্পর্শকাতর ভাবাবেগ কেবল জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের জন্যই সত্য তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থের জন্য নয়। কেননা "মহাপৃথিবী"র 'ঘাস' কবিতায় তিনি যে 'ঘাস' হ'য়ে জন্মাবার অভিলাষ করেছেন তা শুধু বাঙলার মানচিত্রের নয়, তা 'পৃথিবীর'—যার 'টানে' তিনি 'মানবজন্মের ঘরে' একসময় এসেছিলেন।

আনমনা মন নিয়ে জীবনানন্দ প্রকৃতিতে দেখেননি কিংবা প্রকৃতিকে দেখতে অন্যমনা হয়ে যাননি, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের জগতে ঢুকে চৌকাঠে পা রেখে শুধু একবার বাইরে থেকে চোখ বুলিয়ে ব্যস্ত মন নিয়ে আবছা ধারণার সন্তুষ্টিতে তাঁর ভ্রমণ নিষ্পন্ন হয়নি, বিজ্ঞানী যেমন ক্ষুদ্রতম জীবাণুটি পর্যন্ত দেখবার জন্য সমস্ত দৃষ্টিকে মাইক্রোসকোপের সরু চোঙের কাঁচের মধ্যে চোখ ও মনকে ঘনসন্নিবিষ্ট করে রাখেন এখানে সেই মনোযোগী দৃষ্টিকে ক্ষেপণ করা হয়েছে। চোখে দেখে যখন তাঁর আনন্দের শেষ হয়নি তখন তিনি তাঁকে স্পর্শ করে আনন্দ পেতে চেয়েছেন, স্পর্শের আনন্দেও তৃপ্তি না পেয়ে তিনি তাকে জিভে নিয়েছেন তার দেহের স্বাদ নিতে, মুঠো করে নাকের কাছে এনেছেন তার ঘ্রাণে আবিষ্ট হতে। সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর অক্টোপাশের ন্যায় প্রকৃতিকে বহু বাহু দিয়ে নারীর দেহের মত নিঙড়ে উপভোগ করতে চেয়েছেন। তিনি শুধু বসনাচ্ছাদিত বধূ প্রকৃতিকে নয়, যে নগ্ননারী শিল্পীর মডেল সেই নারীপ্রকৃতিকে জানালা-দরজা বন্ধ নির্জন প্রকোষ্ঠের বিজলী বাতির আলোতে ফুলের মত হাতের তালুতে নিয়ে দেখেছেন—হাতের আঙুলে তার পাঁপড়ী সরিয়ে সরিয়ে। জীবনানন্দের

প্রকৃতি এই নিঃসঙ্গ শিল্পীর প্রকৃতি, গৃহ-কোলাহলের অত্যাচারে পালিয়ে আসা বনের সন্ন্যাসীর প্রকৃতি—সেখানে শান্ততাই প্রধান রূপ, স্তব্ধতার গান প্রধান সুর, দেহোপভোগের অন্ধকার প্রধান দর্শক, যেখানে উপস্থিত থাকে মাত্র দুটি বিহবল কিন্তু চাপা স্বর—উত্তেজিত কিন্তু অনুচ্চ, আবেগ-স্পন্দিত কিন্তু সংকোচ-সংযত, ভাবোন্মাদ কিন্তু শব্দ-সচেতন, আত্মনিমগ্ন কিন্তু উৎকর্ণ।

জীবনানন্দ তাই পা ফেলেন, কিন্তু ধীরে, মার্জারের মত সাবধানে,—যেন নিজের পায়ের শব্দে নিজের ধ্যানটি না ভাঙে ; জীবনানন্দ তাই কথা বলেন, কিন্তু অবিরল বৃষ্টিধারার মত করে নয়, শিশির পাতের মত, যার একটি ফোঁটা পড়ে একটি ড্যাশচিহ্নের বিশ্রাম করে ; তিনি শব্দ উচ্চারণ করেন, কিন্তু অপেক্ষা করেন তাঁর কানে শব্দের প্রতিধ্বনিটি ফিরে আসা পর্যন্ত,—নিজের কথার ধ্বনির এবং সুরের স্বাদ, কথার অর্থের স্বাদ, তার মর্মের সম্পূর্ণ ছবির স্বাদ পুরোপুরি উইভোগ করে যেন আর একটি কথা বলা, আর একটি শব্দ উচ্চারণ করা।.

'রূপসী বাংলা'র অধিকাংশ কবিতা যদিও চতুর্দশপদী তবুও জীবনানন্দের এই শিল্পীমানসের ভঙ্গিটি সেখানে সক্রিয়। শ্লথগতির জন্যে বিরামের ড্যাশচিহ্ন সেখানেও পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত। এখানে একটি সম্পূর্ণ কবিতা তুলে দেওয়া যাক এবং দেখা যাক কতগুলো ড্যাশচিহ্ন তিনি ব্যবহার করেছেন :

গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
উড়ে যায়—মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে ;
পুকুরের লাল সর ক্ষীণ ঢেউয়ে বারবার চায় যে জড়াতে
করবীর কচি ডাল ; চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটির পায় ;
এক একটি ইঁট ধ্বসে—ডুবজলে ডুব দিয়ে কোথায় হারায় ;
ভাঙা ঘাটলায় এই—আজ আর কেউ এসে চাল-ধোয়া হাতে
বিনুনী খসায় নাকো—শুকনো পাতা সারাদিন থাকে যে গড়াতে ;
কড়ি খেলিবার ঘর মজে গিয়ে গোখুরার ফাটলে হারায় ;

ডাইনীর মতো হাত তুলে ভাঁট আঁশশ্যাড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝিনাকো,—বুঝিনাকো চিল কেন কাঁদে ;

পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি, হায়, এমন বিজন
শাদা পথ—সোঁদা পথ—বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চলে গেছে—শ্মশানের পারে বুঝি ;—সন্ধ্যা আসে সহসা কখন,
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম—নিম—নিম কার্তিকের চাঁদে।

চৌদ্দ লাইনে এগারোটা ড্যাশের চিহ্ন। এমনি হয়ত কখনো তিনি একই পংক্তিতে কয়েকটি ড্যাশের ব্যবহার করে গেলেন। যেমন : 'আকাশের বুকে তারা যেন চোখ—শাদা হাত—যেন স্তন—ঘাস— ।'

এমনিভাবে কখনো কখনো অতিরিক্ত কমা সেমিকোলন ও কোলনের তিনি ব্যবহার করেছেন এবং প্রায় ঐ একই উদ্দেশ্যেই মাঝে মাঝে ' . . . ' এই ধরণের ফোটা চিহ্নের ব্যবহার করেছেন যেন কোন কথার মধ্যে আরও কথা আছে—আছে তাঁর অন্ধকারের সঙ্গিনী--তাব কথা হয়ত স্পষ্ট করে বলবার দরকার নেই। যেমন : 'এই শুধু···বেজির পায়ের শব্দ পাতার উপরে যদি বাজে সারারাত···দরজায় করেনি আঘাত'।

বলার এই ভঙ্গি থেকে জীবনানন্দের দেখার এই ভঙ্গিটি অন্যান্য কবিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। হৃদয়ের নিস্তব্ধ পুরিতে বসে তিনি বাংলার লৌকিক রূপের পরপারের অলৌকিক রূপটিকে দেখে নিয়েছেন। তিনি দেখেছেন সেই রূপ যা আলোর পরিবর্তনে, সময়ের পরিবর্তনে, ঋতুর পরিবর্তনে রঙ বদলায়। রঙের মধ্যে যে আরো এক রঙ আছে, আলোর মধ্যে আরো যে এক আলো আছে, ধ্বনি আছে, স্তব্ধতার মধ্যে আরো যে এক স্তব্ধতা আছে, আসমানের ওপারে যে আরো এক আসমান আছে, জীবনানন্দের চোখ তারই পিছনে ঘোরে। এই দৃষ্টি নিয়েই বাংলার রূপকে তিনি দেখেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল বাংলার রূপ দেখেছেন, দেখেছেন কবি জসীমউদ্দীন। অন্য রকম সে দেখা। তাঁদেরও প্রত্যেকের দেখার মধ্যে স্বাতন্ত্র আছে। যেমন বাংলার প্রকৃতি দ্বিজেন্দ্রলালে :

ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে!
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে;

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে;

বাংলার প্রকৃতি সত্যেন্দ্রনাথে:

কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলে
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!'

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে
মরালী তার পাছে পাছে?
বাবুই কোথায় বাসা বোনে—
চতক বারি যাচে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব—
বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের-রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

বাংলার প্রকৃতি নজরুলে :

আমার শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি-দরী-বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা'কে,
ধূলি রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিণী বীণ্ বাজায় ॥

ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটি,
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা-বারি-ছিটায় ॥

কাজলা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ-ভালুক,
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায় ॥

নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টীপ প'রে সন্ধ্যাতারার,
উষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর বেলায়॥

হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে,
ভাটিয়ালী গায় ভাটির স্রোতে, গায় বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা তীরে শ্মশানঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায় ॥

বাংলার প্রকৃতি জসীমউদ্দীনে :

পথের কেনারে পাতা দোলাইয়া করে সদা সঙ্কেত,
সবুজে হলুদে সোহাগ ঢুলায়ে আমার ধানের ক্ষেত।
ছড়ায় ছড়ায় জড়াজড়ি করি বাতাসে ঢলিয়া পড়ে,
ঝাঁকে আর ঝাঁকে টিয়ে পাখিগুলি শুয়েছে মাঠের পরে।
কৃষাণ কনের বিয়ে হবে তার হলদি কোটার শাড়ি,
হলুদে ছোপায় হেমন্ত রোজ কচি রোদ-রেখা নাড়ি।
কলমী লতার গহনা তাহার গড়ায় প্রতীক্ষায়—
ভিনদেশী বর আসা যাওয়া করে প্রভাত-সাঁঝের নায়।

পথের কেনারে দাঁড়ায়ে রয়েছে আমার ধানের খেত,
আমার বুকের আশা-নিরাশার বেদনার সঙ্কেত।
বকের মেয়েরা গাঁথিয়া যতনে শ্বেত পালকের মালা,
চারিধারে এর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাজায় সোনার ডালা।
তাল বৃক্ষের উঁচু বাসা ছাড়ি বাবুই পাখির দল,
কিসের মায়ায় সারা খেত ভরি ফিরিতেছে চঞ্চল।

মাঝে মাঝে তার জালে জড়াইয়া টেনে নিয়ে যেতে চায়,
সকাল-সাঁঝের আলো-ছায়া ঘেরা সোনালী তটের ছায়!
শিশির তাহারে মতির মালায় সাজায় সারাটি রাতি,
জোনাকিরা তার পাতায় পাতায় দোলায় তারার বাতি।

এবং

গাঁয়ের চাষীরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিজায়,
গল্পে গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায়!
কেউ বসে বসে বাখারী চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রসি,
কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাঁধে কসি কসি।

কেউ তুলিতেছে বাঁশের লাঠিতে সুন্দর করে ফুল
কেউবা গড়িছে সারিন্দা এক কাঠ কেটে নির্ভুল।

তারি সাথে সাথে গল্প চলেছে, আমীর সাধুর নাও—
বহুদেশ ঘুরে আজিকে আবার ফিরিয়াছে নিজ গাঁও।
ডাব্বা হুঁকাও চলিয়াছে ছুটি এর হতে ওর হাতে,
নানান রকম রসি বুনানও হইতেছে তার সাথে।
বাহিরে নাচিছে ঝরঝর জল, গুরুগুরু মেঘ ডাকে,
এ-সবের মাঝে রূপ-কথা যেন আর রূপকথা আঁকে!
যেন ও-বৃদ্ধ, গাঁয়ের চাষীরা, আর ওই রূপ-কথা,
বাদলের সাথে মিশিয়া গড়িছে আরেক কল্পলতা।

বউদের আজ কোনো কাজ নেই, 'বেড়ায়' বাঁধিয়া রসি,
সমুদ্রকলি শিকা বানাইয়া নীরবে দেখছে বসি।
কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সূতার মায়াবী আখর টানি।
বৈদেশী কোন্ বন্ধুর লাগি মন তার কেঁদে ফেরে,
মিঠে-সুরে গান কাঁপিয়া রঙিন ঠোঁটের বাঁধন ছেঁড়ে
আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছল ছল জলধারে,
বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে!

এবং

যে ঘাটেতে ভরবে কলস গাঁয়ের বিভোল পল্লীবালা,
সেই ঘাটের এক ধারেতে আসবো রেখে ফুলের মালা।
চেনেনা কার হাতের মালা হয়ত বা সে পরবে গলে,
আমরা দুজন থাক্‌ব বসে ঢেউ-দোলা সেই দীঘির-কোলে।
চার পাশেতে বনের সারি এলিয়ে শাখার কুন্তল ভার,
দিঘীর জলে ঢেউ গণিবে ফুল শুঁকিয়ে পদ্ম-পাতার।
বনের মাঝে ডাকবে ডাহুক, ফিরবে ঘুঘু আপন বাসে,
দিনের পিদিম ঢুলবে ঘুমে রাত-জাগা কোন ফুলের বাসে।
চার ধারেতে বন জুড়িয়ে রাতের আঁধার বাঁধবে বেড়া,
সেই কুহেলীর কালো কারায় দীঘির জলও পড়বে ঘেরা।

সেই আঁধারে পাখায় থরে চামচিকারা উচ্চে উঠি,
দিকে এবং দিগন্তরে ছড়িয়ে দেবে মুঠি মুঠি।

দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামের যে বিখ্যাত চারটি গান প্রথমে উদ্ধৃত করলাম তার প্রতিটিই বাংলার প্রকৃতি-রূপের বন্দনা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ কেবল বর্ণনার নিয়মেই রূপ বর্ণনা করেছেন—এই রূপ সামান্য দৃষ্টির, সাধারণ দৃষ্টির। এর চিত্রকল্পও অতি সাধারণ—এখানে কবির অন্তর্দৃষ্টির সংযোগ ঘটেনি। তা' বলে এর কাব্য-সৌন্দর্য যে অন্তর্ধান করেছে তা নয়—সাধারণ চোখে দেখা বাংলার বাহ্যিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা সাধারণতই সুন্দর যা সাধারণের আনন্দ দিতে পারে তা এতে আছে—তারই সংগে আছে উভয় গানের ছন্দ-সৌন্দর্য—সুর-সৌন্দর্য—বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের—এ গানটির ভাব ও ভাষার ছন্দ ও সুরের সুনিবিড় মিল চিত্তকে উদ্বেল করে তোলে। এর মধ্যে যে স্বদেশ প্রেমের প্রচ্ছন্ন গভীর আবেগ আছে সেটাই এর মূল সৌন্দর্য। তবু রসবেত্তার চোখে এতে কবিদৃষ্টির অভাব আছে। যে অভাব পূরণ করেছেন নজরুল ইসলাম তাঁর ঐ গানটিতে। নজরুলের গানের প্রত্যেকটি পংক্তি সুন্দর চিত্রকল্প নয় শুধু এর প্রতিটি পংক্তিতে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে মানুষী, গোটা বাংলা একটি সুন্দরী গ্রাম-বাংলার মেয়ে হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় ষড়-ঋতুর রূপৈশ্বর্যময় প্রকৃতির সম্পূর্ণ চরিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নজরুলের গানটিতে। গানটির 'ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি', 'কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা বারি ছিটায়', 'খেলে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ-ভালুক', 'ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে', 'বেদের সাথে সাপ নাচায়', 'ঊষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর বেলায়' ও 'হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে' ইত্যাদি পংক্তিতে বাংলা প্রকৃতি মূর্তিমতী কুমারী মেয়ে ও বধূনারীর রূপ ত পেয়েছেই সেই সংগে তার নম্র ও কঠিন এই দুই চারিত্রিক রূপও ফুটে উঠেছে। সে যেমন পল্লীগ্রামের পালিয়ে বেড়ানো ভীরু মেয়ে তেমনি বাঘ-ভালুক খেলানো ডাকাত মেয়েও বটে, সে যেমন বধূ সেজে ভোর বেলায় ঊষার গাঙে ঘট ভরতে যায়, কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণার বারি ছিটায় তেমনি ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে এবং বেদের সাথে বিষাক্ত সাপ নাচায়। এ ধরনের রূপ

নজরুলের পক্ষে আঁকা স্বাভাবিক হয়েছে কেননা ভাবকে মূর্তিতে ফুটিয়ে তোলায় তিনি অসামান্য শিল্পী।

তাৎপর্যপূর্ণ বাংলার এই সমগ্র স্বভাবটিকে উপলব্ধি করার অন্তদৃষ্টিই প্রকৃত দ্রষ্টার দৃষ্টি—বিশুদ্ধ কবিদৃষ্টি এবং শুদ্ধ কবি-কল্পনা। দ্রষ্টার এই ভূমিকায় আমরা জসীমউদ্দীনকেও কখনও কখনও পেয়েছি। উপরে জসীমউদ্দীনের কবিতার যে আমি অনেকগুলো উদ্ধৃতি দিয়েছি সেখানে কবিদৃষ্টির উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষণীয়।

ফলত 'রূপসী বাংলা' নামে পৃথকভাবে জসীমউদ্দীন কোনো কাব্যগ্রন্থ রচনা না করলেও বাংলার, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার এবং বর্তমান বাংলাদেশের রূপ তাঁর কাব্যের প্রধানতম দিক। এখানে উল্লেখ থাকলে ভাল হয় বলে বলছি জীবনানন্দ ও জসীমউদ্দীন নদীমাতৃক এই বাংলাদেশেরই সন্তান। একজনের জন্মভূমি বরিশাল অন্যজনের ফরিদপুর। সমুদ্র তীরবর্তী বরিশালের শরীরসংলগ্ন জেলা ফরিদপুর। আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় জেলার ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় অভিন্ন। হয়ত নদী-খালের পরিমাণ ফরিদপুরের চেয়ে বরিশালে বেশী এবং বিশেষ ফসলের জন্য উভয় জেলার মাটির মধ্যেও হয়ত ব্যবধান আছে। সমুদ্র ও নদীবেষ্টিত বরিশালের প্রধান ফসল ধান। এখানে নারকেল ও সুপারীও সুপ্রচুরভাবে ফলে। যশোহর ফরিদপুরে ধানের সংগে আছে উল্লেখযোগ্য খেজুর গাছ। শস্য হিসেবে দুজন কবির কাব্যে যেমন ধান একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয় তেমনি বৃক্ষ হিসেবে জীবনানন্দ দাশ যেখানে সুপারী গাছের বেশী ব্যবহার করেছেন জসীমউদ্দীন তেমনি বেশী ব্যবহার করেছেন খেজুর গাছের।

মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে উদ্ভিদ, পাখি এবং কীট-পতঙ্গের জগৎ জীবনানন্দের যতটা স্থান দখল করে আছে জসীমউদ্দীনের কাব্যে ততটা নেই। কেবল 'রূপসী বাংলা'য় জীবনানন্দ যে বৃক্ষ-উদ্ভিদের এবং পাখি-কীট-পতঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন তার একটি তালিকা এখানে সংযোগ করা যেতে পারে :

উদ্ভিদ

আম, আকন্দ, আনারস, আতা, আঁশশ্যাওড়া, কাশবন, কাঁঠাল, কলমী, কদম, কয়মচা, খাগড়া, গোলপাতা, ক্ষিরুই, কামরাঙা, চালতা, জাম, জামরুল, জারুল, তমাল, তাল, নারকেল, ধুন্দুল, নাটা, নোনা, অশথ, ডুমুর, ঝাউ, পাট, তলতা, লিচু, লেবু, বট, বাবলা, বাসকলতা, বেত, বুনো চালতা, মৌরি, মাকাল, মাদার, চিনিচাঁপা, শটিবন, শুপুরি, শসা, শেয়াল-কাঁটা, শিমুল, লালশাক, ঢেঁকিশাক, সজিনা, সর্ষে, ভাঁট, সুন্দরী, হিজল, হেলেঞ্চা, ধান, কুল, ফণীমনসা।

ফুল

ভাঁটফুল, পদ্মফুল, কমল, অপরাজিতা, চাঁপা, কাঁঠালী চাঁপা, ভেরেণ্ডা-ফুল, কবরী, শেফালী, পলশা, দ্রোণফুল, চালতাফুল, কলমী ফুল।

বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তিনি আবার ঘাসের ও ধানের বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ ক'রে নিয়েছেন। যেমন : মুথাঘাস, পরথুমী, মধুকুপী। যেমন : বালামী, শালী, রূপশালী, পশমিনা ধান।

পাখি

লক্ষ্মী পেঁচা, শালিখ, হাঁস, খঞ্জনা, দয়েল, বক, মাছরাঙা, শুক, পেঁচা, গাংশালিক, নিমপাখি, দাঁড়কাক, কাক, শ্যামা, নিমপেঁচা, চিল, বউকথাকও, কোকিল, ঘুঘু, চকোর-চকোরি, সাপমাসী, বাদুড়, ফিঙ্গা, রাজহাঁস, হলুদ-পাখি, সুদর্শন, হীরামন, পায়রা, চড়াই।

কীট-পতঙ্গ

ফড়িং, গঙ্গাফড়িং, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, ভোমরা জোনাকী, গুবরে পোকা, ভীমরুল, পিঁপড়ে, মৌমাছি, মাছি, ঝিঁঝি।

উদ্ভিদ, বৃক্ষ, ফুল পাখি ও কীট-পতঙ্গের এত ব্যবহার এবং পৌনঃ-পুনিক ব্যবহার জসীমউদ্দীনের প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় হয়নি—প্রকৃতির যে একটা বিশেষ জগৎ আছে, স্বতন্ত্র জগৎ সেখানে প্রবেশ করেননি জসীম-উদ্দীন। অমিনভাবে আবার লক্ষ্য করা যায় বাঙলার গৃহপরিবেশের যে

রূপের জগৎ, গৃহস্থ পরিবেশের যে সামাজিক জগৎ এবং তার বিশেষ রূপ তা জীবনানন্দের কাব্যে অনুপস্থিত। এই পার্থক্যের কারণ জীবনানন্দ সমাজকে দেখেছেন প্রকৃতির মধ্যে থেকে, জসীমউদ্দীন প্রকৃতিকে দেখেছেন সমাজের মধ্য থেকে। জীবনানন্দ জনতার ভিড় এড়িয়ে গিয়েছেন, জসীমউদ্দীন জনতার হাটে মিশে গিয়েছেন। জীবনানন্দের চোখ কতকটা নির্মোহ সন্ন্যাসীর, জসীমউদ্দীনের চোখ ভোগী গৃহীর। জীবনানন্দের মানুষ প্রাকৃতিক জগতের, জসীমউদ্দীনের প্রকৃতি মনুষ্য জগতের। জসীমউদ্দীনের এই রূপময় বাংলা :

গড়াই নদীর তীরে,
কুটিরখানিরে লতা-পাতা-ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যা সকালে ফুটি,
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটিকুটি।
মাচানের পরে সীম-লতা আর লাউ কুমড়ার ঝাড়,
আড়া-আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুলফল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটেশাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়ীখানি রোদে দিয়ে গেছে এ-বাড়ির বধূ কেউ।

* * *

মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালিজিরা আর ধনে,
লঙ্কা-মরিচ রোদে শুখাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ, মটরের রঙ আর
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার।

* * *

সামনে তাহার ছোট ঘরখানি ময়ূর পাখির মত,
চালার দু'খানা পাখনা মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত।

সে ঘরের মাঝে, দুটি পা মেলিয়া বসিয়া একটি মেয়ে,
পিছনে তাহার কালো চুলগুলি মাটিতে পড়েছে বেয়ে।

দুটি হাতে ধরি রঙিন শিকায় রচনা করছে ফুল,
বাতাসে সরিয়া মুখে উড়িতেছে কভু দু'একটি চুল।
কুপিত হইয়া চুলের সরাতে ছিঁড়িছে হাতের সুতো।
চোখ ঘুরাইয়া সুতোরে শাসায় করিয়া রাগের ছুতো।
তারপর শেষে আপনার মনে আপনি উঠিছে হাসি,
আরো সরু সরু ফুল ফুটিতেছে শিকার জলেতে আসি।

* * *

বউ মিটি মিটি হাসে আর তার শিকায় যে ফুল তোলে,
মুখপোড়া পাখি এবার তাহার কানে কানে কথা বলে।
"যাও—ছাড়—লাগে", "এবার বুঝিনু বউ তবে কথা কয়,
আমি ভেবেছিনু সব বউ বুঝি পাখির মতন হয়।
হয়ত এমনি পাখির মতন এ-ডাল ও-ডাল করি,
'বউ কথা কও' ডাকিয়া ডাকিয়া জনম যাইবে হরি
হতভাগা পাখি! সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া পাবে না কূল,
মুখপোড়া বউ সারাদিন বসি শিকায় তুলিবে ফুল।"
"ইস্যিরে মোর কথার নাগর! বলি ও কি করা হয়,
এখনি আবার কুঠার নিলে যে, বসিতে মন না লয়"?
"তুমি এইবার ভাত বাড় মোর, একটু খানিক পরে,
চেলা কাঠগুলো ফাড়িয়া এখনি আসিতেছি ঝট করে"।

"কখনো হবে না, আগে তুমি বস," বউটি তখন উঠি,
ডালায় করিয়া হুড়ুমের মোয়া লইয়া আসিল ছুটি।
একপাশে দিল তিলের পাটালী নারিকেল নাড়ু আর,
ফুল-লতা আঁকা ক্ষীরের তক্তি দিল তারে খাইবার।
কাঁসার গেলাসে ভ'রে দিল জল, মাজা-ঘষা ফুরফুরে
ঘরের যা কিছু মুখ দেখে বুঝি তার মাঝে ছায়া পুরে।
হাতেতে লইয়া ময়ূরের পাখা বউটি বসিল পাশে,
বলিল, "এ-সব সাজায়ে রাখিনু কোন দেবতার আশে?"
"তুমিও এসো না!" "হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের সনে
খাইতে বসিয়া জাত খোয়াইব তাই ভাবিয়াছ মনে?"

নিজেরই জাতিটা খোয়াই তাহলে" বড় গম্ভীর হয়ে
টপটপ করি যা ছিল সোজন পুরিল অধরালয়ে।
বউ ততখনে কলিকার পরে ঘন ঘন ফুঁক পাড়ি,
ফুলকি আগুন ছড়াইতেছিল দুটি ঠোঁট গোল করি
দু' এক টুকরো গুড়া ছাই এসে লাগছিল চোখে মুখে
ঘটছিল সেথা রূপান্তর যে বুঝি না দুখে কি সুখে।
ফুঁক দিতে দিতে দুটি গাল তার উঠছিল ফুলে ফুলে,
ছেলেটি সে দিকে চেয়ে চেয়ে তার হাত ধোয়া গেল ভুলে।
মেয়েটি এবার টের পেয়ে গেছে, কলকে মাটিতে রাখি
ফিরিয়া বসিল ছেলেটির পানে ঘুরায়ে দুইটি আঁখি।

তারপর শেষে শিকা হাতে লয়ে বুনাতে বসিল ত্বরা,
মেলি বাম পাশে দুটি পাও তাতে মেহেদীর রঙ ভরা।
নীলাম্বরীর নীল সায়রেতে রক্ত কমল দুটি,
প্রথম ভোরের বাতাস পাইয়া এখনি উঠিছে ফুটি।
ছেলেটি সেদিক অনিমেষ চেয়ে, মেয়েটি পাইয়া টের,
শাড়ীর আঁচলে চরণ দুইটি ঢাকিয়া লইল ফের।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট]

যেমন জীবনানন্দে নেই ; তেমনি জীবনানন্দের এই রূপসী বাংলা—

চলে যাব শুকনো পাতা-ছাওয়া-ঘাসে—জামরুল হিজলের বনে ;
তলতা বাঁশের ছিপ হাতে র'বে—মাছ আমি ধরিব না কিছু ;—
দীঘির জলের গন্ধে রূপালি চিতল তার রূপসীর পিছু
জামের গভীর পাতা-মাখা শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে ;
আনারস-ঝোপে ঐ মাছরাঙা তার মাছরাঙাটির সনে
অস্পষ্ট আলোয় যেন মুছে যায় ;—সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু
ঝ'রে পড়ে পাতা ঘাসে—চেয়ে দেখি কিশোরি করেছে মাথা নীচু—
এসেছে সে দুপুরের অবসরে জামরুল লিচু আহরণে,—
চ'লে যায় ; নীলাম্বরী স'রে যায় কোকিলের পাখনার মতো *

ক্ষীরুয়ের শাখা ছুঁয়ে চালতার ডাল ছেড়ে বাঁশের পিছনে
কোনো দূর আকাঙ্ক্ষার ক্ষেতে মাঠে চ'লে যায় যেন অব্যাহত,
যদি তার পিছে যাও দেখিবে সে আকন্দের করবীর বনে
ভোমরার ভয়ে ভীরু ; বহুক্ষণ পায়চারি ক'রে আনমনে
তারপর চ'লে গেল : উড়ে গেল যেন নীল ভোমরার সনে।

নেই জসীমউদ্দীনে। জীবনানন্দের এই যে নায়িকা 'কোকিলের পাখনার মতো ক্ষীরুয়ের শাখা ছুঁয়ে চালতার ডাল ছেড়ে' যার 'নীলাম্বরী স'রে যায়' এবং 'কোনো দূর আকাঙ্ক্ষার ক্ষেতে মাঠে চ'লে যায়' যার পিছনে যেয়েও যার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা যায় না—'আকন্দের করবীর বনে আনমনে পায়চারি ক'রে' যে নীল ভোমরার সনে উড়ে যায়' সে মেয়ে জসীমউদ্দীনের নারীর মত কলকেতে ফুঁ দেওয়া ঠোঁটের বৃত্তাকার সৌন্দর্য রচনা করে লোভের শিরনী হ'য়ে ওঠে না—যার দিকে চেয়ে যুবক ছেলেটি তার হাত-ধোয়া ভুলে যায় এবং যার 'মেহেদীর রঙ ভরা' পায়ের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে 'অনিমেষ চেয়ে' থাকে।

জীবনানন্দের নায়িকা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের বস্তু নয়। তাকে দেখা যায় কিন্তু ধরা যায় না। সে সম্পূর্ণ মানুষীও নয়, সে নির্ভেজাল প্রকৃতিও নয়, সে মানুষীরূপী প্রকৃতি, সে প্রকৃতিরূপী মানুষী। উপরের কবিতাটিতে লিচু নিতে যে কিশোরী এল সে পরে যেন নীল ভোমরার সঙ্গে ভোমরা হয়ে উড়ে গেল। ঠিক বোঝা গেল না সে কিশোরী না আসলে ভোমরা, সে ভোমরা না আসলে কিশোরী। আসলে সে ভ্রমরী। কোকিলের পাখনার রঙ আর ভ্রমরীর নীলাভ কালো রঙ সমপর্যায়ের, সে ভ্রমরীটি প্রথমে ক্ষীরুইয়ের শাখা, তারপর চালতার ডালে বসে, তারপর সে ডাল ছেড়ে, বাঁশ-গাছের পিছন দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। কবির চোখ তাকে অনুসরণ করে দেখল সে আকন্দ করবীর বনে গিয়ে হাজির হয়েছে এবং কামোন্মত্ত ভ্রমর লেগেছে তার পিছনে। যার ভয়ে ভীরু ভ্রমরী ছোটাছুটি করল, এক সময় যেন মনের মিল হয়ে গেল তাদের এবং তারা প্রেমিক-প্রেমিকা একত্রে উড়ে চলে গেল। কবি সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন 'মাথা নীচু' আর 'নীলাম্বরী' কথা দুটি ব্যবহার করে। ভ্রমরীর মানুষীর মত দীর্ঘকণ্ঠ নেই, সে কেমন ক'রে মাথা নীচু করবে, কিন্তু তার মাথা আছে এবং সে মাথা নীচু ক'রেই

খাদ্যান্বেষণ করছিল। কিন্তু নীলাম্বরী ? পতঙ্গ কি শাড়ী পরে ? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু নীলাম্বরীর মত ভ্রমরীর পাখনার রঙ নীল। তবু ভ্রমরী হলেও সে এক জীবন্ত কিশোরীর ছবি আমাদের চোখে ফুটিয়ে তুলেছে এবং আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে আসলে কিশোরী না ভ্রমরী। কবি এইভাবে পতঙ্গ জগৎ আর মনুষ্য জগতের পার্থক্য রেখা মুছে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য জসীমউদ্দীনের নায়িকা বাস্তবের, জীবনানন্দের নায়িকা স্বপ্নের। জসীমউদ্দীনের নায়িকা বস্তু জগতের, জীবনানন্দের নায়িকা মনোজগতের। জসীমউদ্দীনের নায়িকা শরীরী, জীবনানন্দের নায়িকা অশরীরী। জসীমউদ্দীনের নায়িকা ঘরে নিয়ে আসে, জীবনানন্দের নায়িকা বনে নিয়ে যায়। জসীমউদ্দীনের "রূপসী বাংলা" জীবন-চেতনাময় তাই তিনি আনন্দমগ্ন আর জীবনানন্দের "রূপসী বাংলা" মৃত্যুচেতনাময় তাই তিনি বিষদামগ্ন। জসীমউদ্দীন সংঘাতময় জীবন ভালোবাসেন তাই তাঁর কাব্যে সংঘর্ষের এই ছবি ফুটে ওঠে :

"ও রূপা তুই করিস কিরে ? এখনো তুই রইলি শুয়ে ?
বন গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় গাজনা চরের খামার ভুঁয়ে"।
"কি বলিলা বছির মামু ?" উঠল রূপাই হাঁক ছাড়িয়া,
আগুন ভরা দু'চোখ হতে গোলা-বারুদ যায় উড়িয়া।
পাটার মত বুকখানিতে থাপড় মারে শাবল হাতে,
বুকের হাড়ে লাগল বাড়ি, আগুন বুঝি জ্বলবে তাতে।
লম্ফে রূপা আনলো পেড়ে চাং হতে তার শড়কিখানা,
ঢাল ঝুলায়ে মাজার সাথে থালে থালে মারল হানা।
কোথায় রল রহম চাচা, কলম শেখ আর ছমির মিয়াঁ
সাউদ পাড়ার খাঁ-রা কোথায় ? কাজীর পোরে আন ডাকিয়া !

* * *

ঘুম হ'তে সব গাঁয়ের লোকে শুনল যেন রূপার বাড়ি,
আকাশ হ'তে ভাঙছে ঠাটা, মেঘে মেঘে লাগছে বাড়ি।
ডাক শুনে তার আসল ছুটে রহম চাচা, ছমির মিঞা,
আসল হেঁকে কাজেম খুনী নখে নখে আঁচড় দিয়া।

* * *

গর্জে উঠে গদাই ভূঞা মোহন ভূঞার ভাজন বেটা,
যার লাঠিতে মামুদপুরের নীলকুঠিতে লাগল লেঠা।
সব গাঁর লোক এক হল আজ রূপার ছোট উঠান পরে,
নাগ-নাগিনী আসল যেন সাপ খেলানো বাঁশীর স্বরে।

রূপা তখন বেড়িয়ে তাদের বলল, "শোন ভাই সকলে,
গাজনা চরের ধানের জমি আর আমাদের নাই দখলে।"
বছির মামু বলছে খবর মোল্লারা সব কালকে নাকি,
আধেক জমির ধান কেটেছে আধেক আজও রইছে বাকি।
মোদের খেতে ধান কেটেছে, কালকে যারা কাঁচির খোচায়,
আজকে তাদের নাকের ডগা বাঁধতে হবে লাঠির আগায়"।
থামল রূপাই ঠাটা যেমন মেঘের বুকে বাণ হানিয়া,
নাগ-নাগিনীর ফণায় যেমন তুবড়ী বাঁশীর সুর হাঁকিয়া।
গর্জে উঠে গাঁয়ের লোকে লাটিম হেন ঘোরায় লাঠি,
রোহিত মাছের মতন চলে, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।
রূপাই তাদের বেড়িয়ে বলে, থাল বাজারে থাল বাজারে,
থাল বাজায়ে সড়াক দুরা, হানরে লাঠি এক হাজারে।

[নক্‌সী কাঁথার মাঠ]

জীবনানন্দ সংঘাত এড়িয়ে নির্জনতায় আশ্রয় পেতে চান ; তাই তাঁর কাব্যে নির্বিবাদ প্রশান্তির এই ছবি ফুটে ওঠে :

এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে ;
এখানে সবুজ শাখা আঁকা বাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে ;
জামের আড়ালে সেই বউকথাকওটিরে যদি ফেল দেখে
একবার,—একবার দু'-পহর অপরাহ্নে যদি এই ঘুঘুর গুঞ্জনে
ধরা দাও,—তা হ'লে অনন্তকাল থাকিতে যে হবে এই বনে ;
মৌরির গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিরে রেখে
আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামা পোকাদের কাছে ডেকে
র'ব আমি ;—চকোরির সাথে যেন চকোরের মতন মিলনে ;

উঠানে কে রূপবতী খেলা করে—ছড়ায়ে দিতেছে বুঝি ধান
শালিখেরে ; ঘাস থেকে ঘাসে ঘাসে খুঁটে খুঁটে খেতেছে সে তাই ;
হলুদ নরম পায়ে খয়েরি শালিখগুলো ডলিছে উঠান,
চেয়ে দেখ সুন্দরীরে ; গোরোচনা রূপ নিয়ে এসেছে কি রাই !
নীলনদে—গাঢ় রৌদ্রে—কবে আমি দেখিয়াছি—করেছিল স্নান—

'থাকিতে হবে যে এই বনে' এই বাক্য বলে দেয়—কি রকম অবস্থানে থেকে কবি প্রকৃতিকে অবলোকন করছেন। কবি যে দৃশ্যের আড়াল থেকে স্মৃতিতে মুদ্রিত দৃশ্যকে দেখছেন সেটা বুঝতে পারি 'ছড়ায়ে দিতেছে বুঝি ধান শালিখেরে' এই রকম আর একটি বাক্য পড়ে। জীবনানন্দ এমনি 'হয়ত' 'যদি' 'বুঝি'র মত সন্দেহমূলক যে-সব শব্দ ব্যবহার করেন তার থেকেই বোঝা যায় তাঁর অবস্থান দৃশ্যের নিকটে নয়, দূরে। একটি দূর অতীতের স্মৃতির আর একটি দূর ভবিষ্যতের স্বপ্নের। তিনি কাছ থেকে চোখ দিয়ে দেখছেন না, তিনি দূর থেকে মন দিয়ে দেখছেন—সে মনের চোখ আছে, চোখের আড়ালে যে চোখ থাকে সেই চোখ। বাইরের বস্তুর চতুষ্পার্শ্বিক একটি ফটোগ্রাফী তিনি মনের চোখের কাছে পাঠিয়ে দেন—যে চোখের মনোযোগকে নাড়ায় না বস্তুজগতের চঞ্চলতা, শব্দজগতের ধ্বনি ; সম্পূর্ণভাবে যে জগত নৈশব্দের তথা শব্দহীনভাবে শিল্পের। জীবনানন্দ তাই কবি যত বড়, তার চেয়ে বড় শিল্পী—তাও সে শিল্পজগৎ আবার ভাস্করের নয়, চিত্রকরের। তাই তাঁর উপাদান পাথর ও হাতুড়ী নয়, রঙ ও তুলি। তাই তাঁর কাব্যে হাতুড়ীর শব্দ নেই, আছে তুলির নৈশব্দ। বিশ্রাম-দৃষ্টির এই মন্থর অবলোকনকে রূপ দিতে ছন্দ হিসেবে ক্লান্তগতি পয়ারকে বেছে নিয়েছেন তিনি—যার ধ্বনির সঙ্গে মিল আছে গদ্য ছন্দের, কথার আলাপের মর্মর ধ্বনির। জীবনানন্দের ভাষা তাই অস্পষ্ট জগতের ও সন্ধ্যা গোধূলির—প্রখর সূর্যের কিংবা প্রখর চন্দ্রের নয়, রৌদ্র-কুয়াশার, ছায়া-জ্যোৎস্নার। এই ছন্দ, এই ভাষা জীবনানন্দের সৃষ্টি, জীবনানন্দ এই ছন্দ ও ভাষার স্রষ্টা। জসীমউদ্দীন এমনি কোন নতুন ছন্দ কিংবা ভাষার স্রষ্টা নন। জসীমউদ্দীনের শিল্প-দৃষ্টি তা বলে গুরুত্বহীন নয় মাঝে মাঝে চমকে দেওয়ার মত চিত্রকল্প ও উপমা তাঁরও কবিতায় পাওয়া যায়। তাঁরও কবিতায় লক্ষ্য করা যায় এমন এক কবির চোখ গ্রাম

বাংলার উপেক্ষিত সৌন্দর্যকে যিনি নতুন করে আবিষ্কার করেন। এ জন্যে তাঁকে, বিদেশী সাহিত্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়নি। লোক-সাহিত্য, লোক-সংস্কৃতি, পুঁথি সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর কল্পনা জ্বালিয়ে তোলার আগুন পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর পরিচিত বাঙলার মাঠে-ঘাটে-পথে-প্রান্তরে পেয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কল্পনাকে রূপ দেওয়ার মত অতি পরিচিত উপাদান। যেমন :

১. হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলে জ্যোৎস্নার জাল পাতি,
টেনে টেনে তারে হয়রাণ হয়ে ডুবে যায় রাতারাতি।
[সুখের বাসর : সুচয়নী]

২. মুখখানি তার ডাগর ডোগর ঘষামাজা কলসখানি,
বৈরাগী কয় গলায় বেঁধে মাপতে পারি গাঙের পানি।
সঙ্গে চলে বৈরাগী তার তেল কুচকচ নধর কায়,
গয়লা বাড়ির ময়লা বাছুর রোদ মেখেছে সকল গায়।
[বৈরাগী-আর-বোষ্টমী যায় : সুচয়নী]

প্রথম উদ্ধৃতির চিত্রকল্পটির অন্তর্বর্তী দৃশ্য নদীতে জাল ফেলে মাঝির অর্ধ-বৃত্তে বাঁকা হয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে জাল টেনে তোলা। হেমন্তের চাঁদ জ্যোৎস্নার জাল ফেলে ফেলে মৎস্যশিকারীর মত ক্লান্ত হয়ে এক সময় জাল গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল। বাংলাদেশের নদীখালের নৌকায় ও নদীতীরে জাল-ফেলার এই দৃশ্য আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির প্রথম চিত্রকল্পটি ঘরোয়া পরিবেশের একটি দৃশ্য। কবি বৈরাগিনীর মুখের উপমা দিলেন না চাঁদ কিংবা ফুলের মত বহু ব্যবহৃত কোন বস্তুর সঙ্গে। উপমা দিলেন পিত্তল নির্মিত একটি ধাতুর কলসীর সংগে, খাবার পানি রাখার জন্য গ্রামের লোকেরা যেটি ব্যবহার করে, যেটি সুন্দর ঝকঝকে করে মেজে গ্রামের বধূরা দীঘি-পুষ্করিণী কিংবা গাঙে পানি নিতে যায়। ওই কলসী গলায় বেঁধে গাঙের পানিতে ডোবার চিত্রকল্পটি লোক-গীতির উপমা মনে করিয়ে দিলেও এখানকার ব্যবহারটি সত্যিই অভিনব। এতে রয়েছে সেই উদ্বেল প্রেমিকের রূপের দরিয়ায় ডুবে মরার ইঙ্গিত।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির দ্বিতীয় চিত্রকল্পটি আরও সাবাস পাওয়ার যোগ্য। বাঙালী কবির কাব্যে সাধারণত পুরুষ রূপের বর্ণনা কম। এখানে কবি একজন কৃষ্ণকান্ত বাঙালীর স্বাস্থ্যসুন্দর রূপের তুলনা করছেন গয়লা বাড়ির একটি কালো বাছুরের সঙ্গে—যার তেলতেলা কুচকুচে শরীরে রোদ পড়লে আলোর ঝাড়ের মত ঝলমল করে। কবি যে 'ময়লা' শব্দটি ব্যবহার করলেন সেটি কালো অর্থে। আমরা ছেলেটি 'ময়লা' বলতে কাদামাখা ছেলে মনে করি। এটা বাঙলার পল্লীভাষা। 'গয়লা বাড়ির ময়লা বাছুর' দেখিয়ে কবি পুনরায় বাংলার পল্লী-প্রকৃতির গৃহ-পরিবেশের একটি চিরন্তন রূপ ধরে দিলেন আমাদের চোখে।

জসীমউদ্দীন ভাষায় আধুনিক নন, ছন্দে নতুন নন—তিনি রবীন্দ্র-মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত কাজে লাগিয়েছেন—কিন্তু তিনি নতুন করে বাংলার রূপ আবিষ্কার করেছেন, বাঙলার প্রকৃতি নিঙড়ে প্রকৃতির গ্লাসে করে আমাদের কাব্য-পিপাসা তৃপ্ত করেছেন, চিত্রকল্পের, উপমা-উৎপ্রেক্ষার সবুজ রস পরিবেশন করে। এই নতুন দৃষ্টি সাধারণ চোখের দৃষ্টি মনে করলে কাব্যবিচারে মারাত্মক অন্যায় করা হবে।

"রূপসী বাংলা"য় কি জীবনানন্দ এর চেয়েও কাব্যিক এর চেয়েও অসাধারণ চিত্রকল্প কিংবা উপমার ব্যবহার করতে পেরেছেন? রূপসী বাংলায় জীবনানন্দের কয়েকটি উপমা এমনি :

> ১. থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাত ২. নোনার মতন নম্র শরীর ৩. রাত্রিমাতা পাখিটির মত ছড়ায়ে রয়েছে তার ডানা ৪. রূপসী শঙ্খের কৌটো তুমি যে প্রাণহীন-পানের ৫. সিঁদুরের মত রাঙা লিচু মুখ গুঁজে প'ড়ে রবে ৬. ডাইনীর মতো হাত তুলে তুলে ভাঁট আঁশ শ্যাওড়ার বন বাতাসে কি কথা কয় বুঝি নাকো ৭. নক্সা পেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির রৌদ্রের ভিতর হলুদ পাতার মতো স'রে যায় ৮. প্রান্তরের পার থেকে পরম বাতাস ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ অন্ধকারে ফেলিতেছে শ্বাস ; ৯. যেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মত জাগিছে অরুণ, ১০. সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মত হাওয়ায় চঞ্চল ১১. বার-বার রোদ তার সুচিক্কন চুল কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায়

১২. নীলাম্বরী স'রে যায় কোকিলের পাখনার মতো,
১৩. তখন ঘাসের পাশে কত দিন তুমি হলুদ শাড়িটি বুকে
ফিঙ্গার পাখনার মতো বসেছো আমার কাছে এইখানে
১৪. আনারসী শাড়ির আঁচলে ফিঙার মতন তুমি লঘু চোখে চলে
যাও জীবনের কাজে।

আরও উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। উপমা চিত্রকল্পের নতুনত্বের দিক থেকে জীবনানন্দ "রূপসী বাংলা"য় জসীম-উদ্দীনের চেয়ে এক সিঁড়ি হয়ত উপরে আছেন কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে নয়, মন্ময় অবলোকনের দিক থেকে, গ্রাম্যতা বর্জনের দিক থেকে ; অবশ্য কল্পনা-শক্তির একটি দিকে জীবনানন্দের অভিনবত্ব অবশ্য স্বীকার্য। জীবনানন্দ যখন বলেন : 'অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আতায় রেখেছে নরম হাত তার···ঢালিছে বুকের থেকে দুধ'। তখনই তাঁর কৃতিত্ব পৃথক মর্যাদায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রোদ কোনো ধাতব পদার্থ নয়, প্রাণীর মত রক্তমাংসের শরীর নেই তার, বস্তুর কোনো আকৃতি নেই কিন্তু কবির কল্পনাশক্তিতে সে এক মমতাময়ী জননীর রূপ ধারণ করল—সবুজ আতার উপর বিকেলের ঠাণ্ডা রোদ পড়ল না, সন্তানের মাথার উপর যেন মায়ের মমতা-করুণ হাতের স্নেহ ঝরে পড়ল—আতাকে রোদ ছুঁলো না, যেন মা শিশুকে স্তন্য দান করল।

ব্যক্তিত্বারোপের এই ভঙ্গিটি নতুন নিশ্চয়ই নয়। নজরুল ইসলামও ঐ রকম বৈদেহীকে দেহের আকৃতি দিয়েছেন। আমার যখন পড়ি : 'দেখি শয্যায় স্তূপ হয়ে আছে জ্যোৎস্নার কুঙ্কুম' তখন জ্যোৎস্না নিরাকৃতি থাকে না, আকৃতি লাভ করে। 'স্তুপ' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি জ্যোৎস্নার দেহ দান করলেন। এটাই প্রকৃত কবির রূপ দেখার দৃষ্টি। এমনকি জসীমউদ্দীনের কাব্যে ব্যক্তিত্বারোপের নিদর্শন উল্লেখ-যোগ্য : "শোন শোন দশা আমার, গহন রাতের গলা ধরি/তোমার তরে ও নিদয়া, একা একা কেঁদে মরি"। 'রাতের গলা' বলাতে রাত একটি মানুষ বন্ধুর আকার ধারণ করল।

বস্তুত বাংলার প্রকৃতিবন্দনা করে কবিতা লিখলেই শুধু বাংলার রূপ দর্শন হল না। কাব্যে বাংলার প্রকৃতিকে অলংকার হিসাবে ব্যবহারও বাংলার

রূপ উদঘাটন করা। আর এই রূপ রবীন্দ্রনাথে কম নেই, নজরুলে বেশী আছে।

সুতরাং বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জসীমউদ্দীন বাংলার রূপ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন—কিন্তু জীবনানন্দের মত অত তন্দগত ভাব নিয়ে দেখেননি, অমন চিত্রশিল্পীর চোখ নিয়ে দেখেননি। ইমপ্রেশানিষ্ট চিত্রকরদের মত জীবনানন্দ সময়ের পরিবর্তনে সূর্য রঙের পরিবর্তনের চমৎকার খেলা দেখিয়েছেন । রঙ সম্বন্ধে চিত্রকরদের মত বিশেষ জ্ঞান নিয়েই তিনি রঙের ব্যবহার করেছেন। যদিও তুলির পরিবর্তে তিনি কলম ব্যবহার করেছেন তবু চিত্র অংকনের প্রতিযোগিতায় তিনি হার মেনেছেন বলে মনে হয় না।

ফলত অন্যান্য বাঙালী কবিদের দ্বারা প্রায় উপেক্ষিত দুটি ঋতু হেমন্ত ও শীতকেই জীবনানন্দ তাঁর শিল্প-মানসের উপযুক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলে বর্ষা-শরৎ-বসন্তের এবং কখনো কখনো গ্রীষ্মের রূপটা যতটা রূপ নিয়ে আসন পেতেছে হেমন্ত ও শীত ততটা নয়। বর্ষার যৌবনপুষ্ট বাংলাই জসীমউদ্দীনকেও বেশীর ভাগ উদ্বেলিত করেছে। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর আত্মার সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন হেমন্তে ও শীতে ! হেমন্তে ও শীতেই তিনি জীবনের আঘ্রাণ খুঁজে পেয়েছেন। কেননা তাঁর ধ্যানে বেদনার মধ্যেই জীবন, মৃত্যুর মধ্যেই জীবন।

অস্বীকার করার উপায় নেই নিঃশেষিত রূপের বাংলায় বসে অতীত বাংলার উজ্জ্বল রূপকে তিনি স্মরণ করেছেন : আর সেই সংগে বিবর্ণ বাংলার মুখ থেকে টেনে বের করেছেন এক আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সূর্য। ক্ষয়িষ্ণু সেই বাংলার রূপকে কী অসীম মমতায় বেদনার মাধুর্য মিশিয়ে বিষাদের সৌরভ ছড়িয়ে তিনি এঁকেছেন তার একটি আশ্চর্য নিদর্শন এই চতুর্দশপদীটি :

> ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে
> জারুল গাছের ডালে ব'সে ব'সে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে ;
> পায়রা গিয়েছে উড়ে চবুতরে, খোপে তা ; শসালতাটিকে
> ছেড়ে গেছে মৌমাছি ;—কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে,

মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিঁপড়েরা চলে যায় ;—দুই দন্ড আম গাছে শালিখে শালিখে
ঝুটোপুটি, কোলাহল—বউ কথাকও আর রাঙা বউটিকে
ডাকে নাকো—হলুদ পাখনা তার কোন যেন কাঁঠালে পলাশে

হারায়েছে ; বউও উঠানে নাই—প'ড়ে আছে একখানা ঢেঁকি
ধান কে কুটিবে বল—কতদিন সে তো আর কোটে নাক ধান,
রোদেও শুকাতে সে যে আসে নাকো চুল তার—করে নাকো স্নান
এ-পুকুরে, ভাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো ; আজ এ-দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি ?
হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে নাকি প্রাণ ?

অর্ধমৃত এই রূপসী বাংলাকে বুকে নিয়ে জীবনানন্দ যে 'ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা' তাঁর দীর্ঘশ্বাসের সংগে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে সাধারণ রূপবর্ণনার কৃত্রিমতা নেই, আছে ঐ মুমূর্ষু বাংলাকে বাঁচাবার জন্য আর্তকণ্ঠের সুগভীর আমন্ত্রণ। বাঙালী জাতির কাছে তাই বৈচিত্র্যের অভাব সত্ত্বেও, এক ঘেঁয়ে ছন্দের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও, যেমন এর মূল্য অপরিমেয় তেমনি আলঙ্কারিকের পক্ষে কাব্যবিচারের মাপকাঠিতে এর মুখে অসংখ্য ব্রনের দাগ থাকা সত্ত্বেও এর কুহেলী-জ্যোৎস্নার রূপকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কোনো রসিক কি পারবেন 'রূপসী মাছের কণ্ঠ কামনার স্বর' শুনে বিহ্বলতা থেকে আত্মরক্ষা করতে। জীবনানন্দের সিদ্ধি এইখানেই।

পূর্বাচল
অগ্রহায়ণ : ১৩৭১

সুকান্তের প্রেম : প্রেমের কবিতা

সুকান্ত প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন। সুকান্তের সংগে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরা এমনি একটা আশ্চর্যবোধক প্রশ্ন করতে পারেন হয়ত। হয়ত তাঁরা বলবেন শব্দের হাতুড়ি দিয়ে শোষক-পীড়িত সমাজের পাহাড় ভেঙে যিনি সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করছিলেন তিনি আবার কেমন করে প্রেমের কবিতা লেখেন !

সত্য বটে ! কিন্তু কবি বিপ্লবী হলে তাঁর হৃদয়ে কি মানুষীর পদধ্বনি শোনা যাবে না। শেলী, বায়রন, নজরুলও ত বিদ্রোহী ছিলেন ; অমর প্রেমের কবিতাও ত তাঁরা লিখেছেন। তবে সুকান্তই বা কেন প্রেমের কবিতা লিখবেন না—কবি হলেও ত তিনি এই আমাদের মত রক্ত-মাংসের মানুষ ! যদিও বন্ধু অরুণাচল বসুকে লেখা একটি চিঠিতে সুকান্ত লিখেছিলেন : "প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে ন্যক্কারজনক বলে মনে হয়।" তবু প্রেমের মধুর স্পর্শে যে তাঁর হৃদয়-তন্ত্রী বেজে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। অরুণাচল বসুকে লেখা একটি চিঠিতে সুকান্ত এমনিভাবে হৃদয় উন্মোচন করেন :

> —উপক্রমণিকা ভরিয়ে তুলল আমাকে তার তীব্র শারীরিকতায়—তার বিদ্যুৎময় ক্ষণিক দেহ-ব্যঞ্জনায়, আমি যেন যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম, স্তব্ধতায় স্পন্দিত হতে লাগলাম প্রতিদিন।...কী যে হয়েছিল আমার, এখনও বুঝতে পারছি না ; শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, আমার মনে ফুটে উঠেছিল একটি রৌদ্রময় ফুল।

১৯৪১-এর ডিসেম্বরের দিকে এই চিঠি লেখা ; যখন সুকান্তের বয়স পনর বছর। কিশোর সুকান্ত—কিন্তু মনের দিক থেকে ঠিক কিশোর নন। আত্মজিজ্ঞাসায় তিনি প্রায় প্রৌঢ় মানুষের মত সাবধানী। তাই উদ্বেলিত অন্তরকে উন্মোচিত করেও পরক্ষণেই তিনি পাগলামীকে ঠেলে উঠে পড়েন

বাস্তবের তীরে। বলেন : "তোমরা একে পূর্বরাগ আখ্যা দিতে পারো, কিন্তু আমি বলব এ-আমার দুর্বলতা।"

আমরা দেখছি প্রেমের স্পর্শে স্পন্দিত হলেও আদর্শবাদী সুকান্ত তাকে সহজ বুদ্ধিতে গ্রহণ করতে পারছেন না, এমনকি ও-সব নিছক জৈব ব্যাপার নিয়ে কবিতা লেখাকে তিনি 'ন্যক্কারজনক' বলে ভাবতে কুণ্ঠিত নন। মনস্তাত্ত্বিকের মনে হতে পারে উন্মত্ততার পর্যায়ে পেঁছাতে যে জোয়ারময় যৌবনের প্রয়োজন, যে বয়স-সীমায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন, দেহ ও মনের সে বয়সে সুকান্ত পেঁছাননি।

কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকরা এও বলেন : "যাঁরা খুব উঁচু জাতের বুদ্ধি-সম্পন্ন যাঁদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০-এর উপরে, অথবা যাঁদের মানসিক বয়স ২৪ বৎসর, তাঁদের আমরা বলি প্রতিভাবান।"

সুকান্তের বেলা তাঁর বয়স নয়, তাঁর মানসিক বয়সটাকে ধরতে হবে। সুকান্ত শুধু প্রতিভাবান নন, অসাধারণ প্রতিভাবান। এবং তাই তাঁর মানসিক বয়স যে বয়স্ক মানুষের চেয়ে আদৌ কম নয় তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। সে জন্য পূর্ণ যৌবনে উপনীত না হলেও অনুভূতি তাঁর পূর্ণবয়স্ক মানুষেরই।

যা হোক কবি হিসেবে যে মুহূর্তে তাঁর 'মনের অন্ধকারে' 'রৌদ্রময় ফুল' 'ফুটে উঠেছিল' সে মুহূর্তে তিনি আবেগের হাত ধরে প্রেমের যমুনা-তীরে উঠে আসতে পারতেন কবিতার তাজমহল নির্মাণে। কিন্তু সে আবেগের দাসত্বকে তিনি মানলেন না। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের ডাকে কান পাতলেন...অগ্রসর হলেন বিশ্বানুভূতিতে সাড়া দিতে—স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন :

> আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
> আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।

এ-সময় ফ্রয়েডের নয়, এ-সময় মার্কসের। যে-সময় মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় সন্তানকে পর্যন্ত বিক্রী করতে রাজী, সে-সময়ে প্রেমের বাঁশীতে উৎকর্ণ হওয়া গেলেও তার টানে এগিয়ে যাওয়া যায় না, তার সমস্ত সত্তাকে চঞ্চল করে তোলা যায় না। মানবিকতার তীব্র বোধের কাছে মানুষ-মানুষীর

ব্যক্তিগত প্রেমের মূল্য উনো হয়ে যায়। প্রজার হিতার্থে রাম সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন, বিশ্বমানবের বেদনায় সিদ্ধার্থ সুন্দরী স্ত্রীর আকর্ষণ উপেক্ষা করেছিলেন, আর সুকান্তের 'রানার'এর প্রিয়তমাকেও পরাজয় মানতে হয় সেই মানবপ্রেমের কাছে—তার প্রিয়াকে 'বিনিদ্র রাত' কাটাতে হয়—"অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে।"

সময়ের কাছে সুকান্তের আদর্শবোধ সেইখানে জয়ী হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দোপভোগকে সরিয়ে ক্ষুধিত মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি বললেন :

অসহ্য দিন। স্নায়ু উদ্বেল! শ্লথ পায়ে ঘুরি ইতস্তত:
অনেক দুঃখে রক্ত আমার অসংযত!
মাঝে মাঝে যেন জ্বালা করে এক বিরাট ক্ষত
হৃদয়গত।
ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
দিনরাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুকমারে।

একই রকম মানবিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ জীবনানন্দ দাশকে বলতে শুনি :

মাথার ভিতরে—
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোন এক বোধ কাজ করে।

এ সেই চৈতন্য যার কাছে "ভালবাসা—ধুলো আর কাদা"। কিন্তু মনে রাখা দরকার বিশ্বাস দু'রকম বলে দু'জন কবির কাছে ঐ বোধের অর্থ দু'রকম হয়ে গেছে। একজন কবি যখন মনে করেন শ্রেণীবৈষম্যের অবসান হলে, অর্থবণ্টন সুষম হ'লে বিশ্বমানবের দুঃখমুক্তি ঘটবে। অন্যজন তখন ভাবেন মানুষের সার্বিক মুক্তি শুধু জঠর জ্বালার নিবৃত্তিতেই শেষ হবে না। সুকান্ত বিশ্বাস করেন রক্তাক্ত বিপ্লবের পরেই শান্তি আসবে—কারণ রাশিয়াতে শান্তি এসেছে। জীবনানন্দ বলেন :

এই পৃথিবীর রণ-রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।

কম্যুনিজমে জীবনানন্দের আদৌ বিশ্বাস ছিল না—কেননা রক্তাক্ত-বিপ্লবের

হিংস্রতা, "অগণন মানুষের শব"— "আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুসিয়াসের মতো আমাদেরও প্রাণ মূক করে রাখে"।

রাখে। তবু "ক্লান্ত প্রাণ" জীবনানন্দ দেখেন "চারিদিকে রক্ত ক্লান্ত কাজের আহ্বান"।

রক্তস্রোতে অবগাহন মানবিক হৃদয়ের কাম্য নয়। কিন্তু মানুষের মুক্তি আসবে কি করে? যে পৃথিবীতে মুসা জন্মেছেন, ঈসা জন্মেছেন, বুদ্ধ জন্মেছেন, মুহম্মদ জন্মেছেন সে পৃথিবী থেকে ত দানবের অত্যাচার নিঃশেষ হয় না, শোষণ অব্যাহত থাকে, শ্রেণীভেদ থেকে যায়—কোন না কোন ভাবে ঈর্ষা থাকে শাশ্বতী হয়ে। কই প্রেমের বাণী প্রচার করে ত মানুষকে প্রেমিক করে তোলা সম্ভব হয়নি। যে জন্যে নজরুল ইসলাম বলেছিলেন :

ধর্মকথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব !
'ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এসে বেদান্ত !'
কয় যদি ছাদ, লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত !
থাকতে বাঘের দন্ত-নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সবক !
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দূলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক !

অতএব স্বীকার করতেই হয় সামাজিকভাবে রক্ত-বিপ্লবকেই সার্থক হতে দেখা যায় এবং সন্দেহ থাকলেও জীবনানন্দও বিশ্বাস করেন : "এই পথে আলো জেবলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে" ; যদিও "ততদূর ভালো মানব সমাজ" গড়ে তোলা "অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ"। একই সংগে এই বিশ্বাস ও সন্দেহ ছিল বলে জীবনানন্দ জীবনভর কোন সুস্পষ্ট দার্শনিক প্রজ্ঞায় স্থিতিলাভ করেননি, কোনো বিশ্বাসের আদর্শের সুদৃঢ় পথে এগিয়ে যেতে পারেননি, এমন কি কিশোর সুকান্তের মত বলিষ্ঠ আবেগে বলতে পারেননি :

নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও, তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে।

এ-জন্যেই আবার তাই সুকান্তের মত প্রেমকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না জীবনানন্দের পক্ষে। যদিও তিনি বলেন—"ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়ে-মানুষেরে" কিন্তু তাঁর পক্ষে ত সেই মানুষকে নিয়ে সংগীত সংরচনা করা ঘৃণার ব্যাপার নয়—তিনি ফ্রয়েডের দর্শনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন না। সুকান্তের মত তিনি যে একেবারে সমাজসচেতন নন তা ত বলাই চলে না। উপরন্তু বলা চলে সুকান্তের চেয়ে তিনি বেশী অভিজ্ঞ এবং জীবন-সত্যের দিকে বেশী মনোযোগী। তাই শুধু তিনি নারীর প্রেমে শান্তিলাভের কথা বিশ্বাসই করেন না ; তা নিয়ে কবিতা লিখতেও তিনি আনন্দ পান।

মানসিক পরিণতি সত্ত্বেও সুকান্তকে জীবনানন্দের মত অভিজ্ঞতার বহু স্তরকে স্পর্শ করতে হয়নি। স্বল্প বয়সের দরুণ বিশ্ববেদনা সুকান্তকে জাগালেও সাংসারিক মানুষের জীবনের পরতে পরতে যে-সব অকল্পনীয় আঘাত মানুষের বিশ্বাসের মাথায় কাঁটাভরা জুতোর টক্কর হানে সে বেদনা সুকান্তর জীবনে আসেনি। সে পরীক্ষার আগেই সুকান্ত মারা যাওয়াতে আত্মদ্বন্দ্বে কণ্টকিত হতে হয়নি তাঁকে এবং 'রূপসী সর্বনাশী'র 'বিষ-হাসি' যে কত মারাত্মক এবং তার দাহ যে কত তীব্র সে অভিজ্ঞতাও তাঁকে স্পর্শ করেনি। অতএব শেষ পর্যন্ত ঐ 'ন্যক্কারজনক' শব্দটিকে বুদ্ধিমান কিন্তু অনভিজ্ঞ কিশোরের উক্তি বলে ভাবতে পারি।

কিন্তু প্রেমে পড়ে প্রেমের কবিতা লিখতে ঘৃণা হলেও সুকান্ত যে প্রেমের কবিতা আদৌ লেখেননি তা নয়। আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা"য় সুকান্তের একটি প্রেমের কবিতা সংকলিত হয়েছে। শিরোনাম 'ব্যর্থতা'। এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটি তুলে দিলাম :

আজকে হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদী
পার হতে সাধ জাগে, মনে হয় তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ,
চাষার ছেলের হাতে এসে যেতো হঠাৎ আজ।
তাহলে না হয় আকাশবিহার হত সফল,
টুকরো মেঘেরা যেতে যেতে ছুঁয়ে যেতো কপোল ;

অনারণ্যে কি রাজকন্যের নেই কো ঠাঁই—?
কাস্তেখানাকে বাগিয়ে আজকে ভাবছি তাই।
অসি নাই থাক হাতে ত আমার কাস্তে আছে
চাষার ছেলের অসিকে কি ভালোবাসতে আছে ?
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝলসে উঠবে কাস্তে দৃপ্ত কিরণ।
হে রাজকন্যা, দৈত্যপুরীতে বন্দী থেকে
নিজেকে মুক্ত করতে আমায় নিয়েছ ডেকে,
হেমন্তে পাকা ফসল সামনে, তবু দিলে ডাক ;
তোমাকে মুক্ত করব আজকে ধানকাটা থাক।

রাজপুত্রের মতন যদিও নেই কৃপাণ,
তবু মনে আশা তাই কাস্তেতে দিচ্ছি শান,
হে রাজকুমারী, আমাদের ঘরে আসতে তোমার—
মন চাইবে তো ? হবে কষ্টের সমুদ্র পার !
দৈত্যশালায় পাথরের ঘর, পালঙ্ক-খাট,
আমাদের শুধু পর্ণ কুটির ফাঁকা ক্ষেত-মাঠ ;
সোনার শিকল নেই, আমাদের মুক্ত আকাশ,
রাজারঝিয়ারী ! এখানে নিদ্রাহীন বারো মাস।
এখানে দিন ও রাত্রি পরিশ্রমেই কাটে,
সূর্য এখানে দ্রুত ওঠে, নামে দেরীতে পাটে।
হে রাজকন্যা, চলো যাই, আজ এলাম পাশে,
পক্ষীরাজের অভাবে পা দেবো কোমল ঘাসে।
হে রাজকন্যা ! সাড়া দাও, কেন মৌন পাষাণ ?
আমার সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে তুমি তুলবে না ধান ?
হে রাজকন্যা,ঘুম ভাঙল না ? সোনার কাঠি
কোথা থেকে পাবো, আমরা নিঃস্ব, ক্ষেতেই খাঁটি—
সোনার কাঠির সোনা নেই, আছে ধানের সোনা,
তাতে কি হবে না ? তবে তো বৃথাই অনুশোচনা ॥

যথেষ্ট পাকা হাতের লেখা নয় এটা। 'রানার'-এর কবির ছন্দের গীতি-মাধুর্য এতে ধরা পড়েনি, সংলগ্ন কথায় আবেগের মুক্তি ঘটেনি হৃদয়স্পর্শী হয়ে, বক্তব্যের সঙ্গে ছন্দ ও ভাষার হয়নি হরগৌরি মিলন। এ-যে নিছক কবিতার জন্য কবিতা লেখা এবং কোথাও কোথাও মিলগুলো পর্যন্ত কষ্টকর চেষ্টার ফলশ্রুতি সেটি পর্যন্ত লক্ষ্যকে ফাঁকি দিতে পারে না। "হে রাজকন্যে"র বাক্য অথবা শব্দের পুনরুক্তি দোষেও কবিতাটি প্রায় অপাঠ্য—যা সুকান্তের মত শক্তিশালী কবির কাছে প্রায় অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এর একমাত্র কারণ হয়ত এই যে, যে আবেগের বিস্ফোরণ থেকে কবি সুকান্তের বহ্নি-উৎসারক কবিতাগুলো বেরিয়ে আসে সেই হৃদয় উদ্‌গীরিত বহ্নি এখানে নিষ্প্রাণ—সম্ভবত ঐ আবেগের 'ন যযৌ-ন তস্থৌ' ভাব।

'ব্যর্থতা' কবিতাটির আলোচনা করলাম। এবার 'রৌদ্রের গান' কবিতাটির আলোচনা করব। দু'টি কবিতাই সুকান্তের 'ঘুম নেই' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। 'ব্যর্থতা' অবশ্য 'ঘুম নেই'তে 'মীমাংসা' নামে ছাপা হয়েছে এবং বেশ কিছু পরিবর্তিত হয়ে—এখানে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যক নেই। বলাবাহুল্য এই 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থে সুকান্তর আরও দুটি প্রেমের কবিতা 'প্রিয়তমাসু' ও 'অবৈধ' মুদ্রিত আছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল রচনা হিসেবে আমি 'রৌদ্রের গান'-কেই বেছে নিলাম। এই একটি প্রেমের কবিতা দেখে এমন আশা করা যেতে পারে যে, সুকান্ত বেঁচে থাকলে হয়ত প্রেমের কবিতা লেখাকে ঘৃণা করতেন না। আর এ-কথা ত বলাই বাহুল্য যে, প্রেমে না পড়ে প্রেমের কবিতা লেখা যায় না—যদি সত্যিই অভিজ্ঞতা কবিতার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়। এখন কবিতাটি দেখা যাক :

এখানে সূর্য ছড়ায় অকৃপণ
দু'হাতে তীব্র সোনার মতন মদ,
যে সোনার মদ পান করে ধানক্ষেত
দিকে দিকে তার গড়ে তোলে জনপদ।

ভারতী ! তোমার লাবণ্য দেহ ঢাকে
রৌদ্র তোমায় পরায় সোনার হার,

সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল
প্রেয়সী, তোমার কত না অহংকার !

সারাটা বছর সূর্য এখানে বাঁধা
রোদে ঝলসায় মৌন পাহাড় কোনো,
অবাধ রৌদ্রে তীব্র দহন ভরা—
রৌদ্রে জ্বলুক তোমার আমার মনও।

বিদেশকে আজ ডাকো রৌদ্রের ভোজে
মুঠোমুঠো দাও কোষাগার-ভরা সোনা
প্রান্তর বন ঝলমল করে রোদে
কী মধুর আহা রৌদ্রে প্রহর গোণা।

রৌদ্রে কঠিন ইস্পাত উজ্জ্বল
ঝকমক করে ইশারা যে তার বুকে ;
শূন্য নীরব মাঠে রৌদ্রের প্রজা
স্তব করে জানি সূর্যের সম্মুখে।

পথিক বিরল রাজপথে সূর্যের
প্রতিনিধি হাঁকে আসন্ন কলরব,
মধ্যাহ্নের কঠোর ধ্যানের শেষে
জানি আছে এক নির্ভয় উৎসব।

তাই তো এখানে সূর্য তাড়ায় রাত
প্রেয়সী, তুমি কি মেঘ-ভয়ে আজ ভীত ?
কৌতুকছলে এ মেঘ দেখায় ভয়,—
এ-ক্ষণিক মেঘ কেটে যাবে নিশ্চিত।

সূর্য, তোমায় আজকে এখানে ডাকি—
দুর্বল মন, দুর্বলতর কায়া,
আমি যে পুরনো অচল দীঘির জল
আমার এ-বুকে জাগাও প্রতিচ্ছায়া ॥

এখানে সুকান্তের প্রেম ও বিপ্লব কোনো পৃথক ব্যাপার নয়, এখানে বিপ্লব ও প্রেম মিশ্রিত একক সত্তা। এই নব সত্তার উদ্ভাবনে মার্কসীয় দর্শনকে সুকান্ত যে প্রেমের কবিতায় মেশাতে পেরেছেন এবং 'সূর্য'কে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে বিপ্লবের নতুন অর্থ দান করেছেন তার জন্যে তাঁকে প্রশংসা অবশ্যই করা যায়। এখানে রূপকের আড়ালটি যেমন সুন্দর বিভিন্ন চিত্রকল্পের সমাহারও চমৎকার। আর ছন্দও এখানে হারায়নি তার পেশীর সুশ্রীতা। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন : "বাংলায় যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনি-বৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরই সঠিক নির্ভর করে।" সুকান্ত এখানে যুক্তাক্ষ-রিক সেই ছন্দ ব্যবহার করে প্রকৃত লিরিকের গতি সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

কিন্তু প্রসংগান্তরে যাওয়া যাক। জানতে ইচ্ছা হয় সুকান্তর এই ধ্যানের প্রিয়া—রৌদ্র যার সোনার হার পরায়, সূর্য যার 'সবুজ চুল' শুকায়, এ তাঁর মানসী না এ তাঁর দেশ? এই খটকাটুকু আছে বলেই এটিকেও ঠিক বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা বলা চলে না।

বলাবাহুল্য সুকান্তের প্রেমের কবিতা এমন কিছু নয় যে সে সম্পর্কে আরও বেশী কিছু বলা যেতে পারে। তবু কোন একটি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা সম্পূর্ণ হলে ভাল হয় বলে আমার ধারণা। এ ব্যাপারে সুকান্তের বন্ধুদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের আর এক ধাপ সত্যের কাছে পেঁাছে দেবে।

যে বয়সে সুকান্ত মারা যান সেটা যৌবনাগমের প্রথম পর্যায়। পৃথি-বীতে এমন অনেক কবি আছেন যাঁরা ঐ বয়সে কবিতা লেখায় হয়ত হাতে খড়ি নিয়েছেন কিংবা নেননি। অতএব ঐ বয়সে কেউ প্রেমের কবিতা লিখবে অনেক পাঠক হয়ত তা ভাবতেও অভ্যস্থ নন। বিশেষ করে সুকান্তের মত আদর্শবাদী কবির ব্যাপারে। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে ও নিয়ে মাথা ঘামাতাম না যদি না 'সুকান্ত সমগ্র'-এ সুকান্তর বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিগুলো দেখতাম। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, সুকান্তের প্রেমের কবিতা পড়ে আমি সুকান্তর প্রেম-সম্পর্কে কৌতূহলী হইনি, কৌতূহলী হয়েছি তাঁর চিঠি পড়ে।

এ কথা লিখলে সুকান্ত-ভক্তেরাও নিশ্চয়ই অখুশি হবেন না যে, সুকান্ত প্রেমের কিবতা লিখে বিখ্যাত হননি। সুকান্তের নাম বাগ্মিতা

ধর্মী রাজনৈতিক কবিতা এবং সমাজতান্ত্রিক জাগরণমূলক কবিতা লেখায়। কিন্তু যেভাবেই হোক তাঁর কবিতায় নারীর উপস্থিতি একেবারে শূন্যের পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। কিন্তু সুকান্তর প্রেম-বিষয়ক পত্রপাঠে আমি আশ্চর্য হয়েছি এই ভেবে যে, সুকান্তর স্বল্পায়ু জীবনে প্রেমের অধ্যায়টুকু একেবারে ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না তবু তা কেন সুকান্তকে প্রেমের কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ করল না। এর আগে আমি দেখিয়েছি যে, প্রেমে পড়ে প্রেমের কবিতা লেখাকে সুকান্ত ঘৃণা করতেন। প্রমাণ সুকান্তর চিঠি। কিন্তু প্রেম সম্পর্কিত সুকান্তের প্রতিটি চিঠির বিশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত চরিত্রের সমগ্র রূপটা আমাদের চোখে অস্পষ্ট থাকবে বলে এই বিশদ আলোচনা। সুতরাং শুরুতেই সুকান্তর ঐ চিঠিগুলোর অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করা গেল :

> এখন শোন্, "আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরি করেছে দান", তার পরিচয় :—এই পরিচয়পত্রের প্রারম্ভেই তোর কাছে ক্ষমা চাইছি, তোর কাছে একদিন ছলনার প্রয়োজন হয়েছিল বলে। কিন্তু আর নয়, এ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আর কপটতার আশ্রয় নিলুম না এই জন্যই যে, কথাটা গোপন হলেও ব্যথাটা আর গোপন থাকতে চায় না, তোর কাছে—উলঙ্গ, উন্মুক্ত হয়ে পড়তে চায়। এ-ব্যাপারটা আমার প্রাণের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে তোর কাছেও তা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের বেগে সংযমের কঠিনতা গলে তা পানীয়রূপে প্রস্তুত হল তোর কৌতূহলে। তুই এ-প্রেমে ফেনায়িত কাহিনীসুরা কি পান করবি না? —এই সুরার মূল্য যে শুধু সহানুভূতি ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস! কে তুই চিনিস? —যদি 'না চিনি না' বলিস তবে তাকে চিনিয়ে দিচ্ছি, সে উপক্রমণিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সর্বোপরি সে আমার আবাল্যের সঙ্গিনী, সঙ্গিনী ঠিক নয়, বান্ধবী! যখন আমরা পরস্পরের সম্মুখে উলঙ্গ হতে দ্বিধাবোধ করতুম না, সেই সুদূর শৈশব হতে সে আমার শৈশবের সাথী। সব কিছু মনে পড়ে না, তবু এইটুকু মনে পড়ে যে, আমরা একত্র হলে আনন্দ পেতুম এবং সে আনন্দ ছিল নানারকমের কথা বলায়। একটা কথা বলে রাখা ভাল

যে, আমাদের উভয়ের দেখা হত, কোন কারণে, প্রায়ই। সে আমায় শ্রদ্ধা করত এবং আমার সান্নিধ্যে খুশি হত। একবার আমাদের উভয়কেই × যেতে হয়, সেখানেই আমরা অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ি এবং আমি সেখান থেকেই লাভ করি এর সান্নিধ্যের আকর্ষণ। তখন আমার বয়স ১১, তার ৯। তারপর আমাদের দেখা হতে লাগল দীর্ঘদিন পরে পরে।—সেখানে আমি ঘনঘন যেতে লাগলুম।—ওর আকর্ষণে অবিশ্যি নয়। বাস্তবিক আমাদের সম্পর্ক তখনও অন্য ধরনের ছিল, সম্পূর্ণ অকণ্টক, ভাই-বোনের মতই। তখন ওকে নিয়ে যেতাম পার্কে বেড়াতে, উপক্রমণিকার বাড়ি ওকে পেঁছে দিতাম দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। একত্রে আহার করতাম, পাশাপাশি শুয়ে বই পড়ে শোনাতুম ওকে, রাত্রেও পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতুম। ঘুমের মধ্যে ওর হাতখানি আমার গায়ে এসে পড়ত, কিন্তু শিউরে উঠতাম না, ওর নিঃশ্বাস অনুভব করতাম বুকের কাছে। তখনো ভালবাসা কি জানতাম না, আর ওকে যে ভালবাসা যায় অন্যভাবে, এতো কল্পনাতীত। কোন আবেগ ছিল না, ছিল না অনুভূতির লেশমাত্র।—

এই চিঠিটার তারিখ নেই বলে এখানে তা দেওয়া সম্ভব হল না। দ্বিতীয় চিঠিটা এখানে তুলে দিচ্ছি। এর তারিখ ২৪শে পৌষ, ১৩৪৮ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৪১ সাল :

সেদিন থেকে আর চিঠি লেখবার সুযোগ পাইনি। কারণ উপক্রমণিকা ভরিয়ে তুলল আমাকে তার তীব্র শারীরিকতায়—তার বিদ্যুৎময় ক্ষণিক দেহ-ব্যঞ্জনায়, আমি যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম, স্তব্ধতায় স্পন্দিত হতে লাগলাম প্রতিদিন। দৃষ্টি দিয়ে পেতে চাইলাম তাকে নিবিড় নৈকট্যে। মনে হল আমি যেন সম্পূর্ণ হলাম তার গভীরতায়। তার দেহের প্রতিটি ইঙ্গিত কথা কয়ে উঠতে লাগল আমার প্রতীক্ষমান মনে। একি চঞ্চলতা আমার স্বাভাবিকতার ? ওকে দেখবার তৃষ্ণায় আমি অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম বহু দর্শ-নেও। না দেখার ভান করতাম ওকে দেখবার সময়ে। অর্থাৎ এ-ক'দিন আমার মনের শিশুত্বে দোলা লেগেছিল গভীরভাবে। অবশ্য একবার

দোলা দিলে সে দোলন থামে বেশ একটু দেরী করেই, তাই আমার মনে এখনও চলছে সেই আন্দোলন। তবু কী যে হয়েছিল আমার, এখনও বুঝতে পারছি না ; শুধু এটুকুই বুঝতে পারছি, আমার মনের অন্ধকারে ফুটে উঠেছিল একটি রৌদ্রময় ফুল। তার সৌরভ আজও চঞ্চল করে তুলছে থেকে থেকে। ওর চলে যাবার দিন দেখে-ছিলাম ওর চোখ, সে চোখে যেন লেখা ছিল "হে বন্ধু বিদায়, তোমাকে আমার সান্নিধ্য দিতে পারলাম না, ক্ষমা কর।" সে ক'দিন কেটেছিল যেন এক মূর্ছার মধ্যে দিয়ে, সমস্ত চেতনা হারিয়ে গেল কোনও অপরিচিত সুরলোকে। তোমরা একে পূর্বরাগ আখ্যা দিতে পারো, কিন্তু আমি বলব এ-আমার দুর্বলতা। তবে এ থেকে আমার অনুভূতির কিছু উন্নতি সাধন হল। কিন্তু এ ঘটনার পর আমি কোনও প্রেমের কবিতা লিখিনি, কারণ প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে ন্যক্কারজনক বলে মনে হয়।

তৃতীয় চিঠিটা ঠিক এক বছর পরের লেখা—ইংরেজী ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে একই বন্ধু অরুণাচলকে। দীর্ঘ এই চিঠির সবটাই সুকান্তের প্রেমকাহিনী :

আজকে আমি তোকে জানাব আমার সমস্যার কথা, আমার বিপ্লবী অন্তর্জগতের কথা। এই চিঠির আরম্ভ এবং শেষ X কথাতেই পরি-পূর্ণ থাকবে। একবার যখন আদি অন্ত জানতে কৌতূহল প্রকাশ করেছিস, তখন তোর এচিঠি ধৈর্য ধরে পড়তেই হবে।

আজকে এইমাত্র X-র কথা ভাবছিলুম, ভাবতে ভাবতে ভাবলুম তোকেই ডাকা যাক পরামর্শ ও সমস্যা সমাধানের জন্যে। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করব, আমার এই প্রেমের উপর আস্থা ও সহানুভূতি তোর মনের কোণে বাসা বেঁধেছে কি ? যদি না-বেঁধে থাকে, তবে এই চিঠিপড়া এখানেই বন্ধ করতে পারিস। যদিও তুই একবার আমাকে কৌতূহল জানিয়ে আমার মনের চোরা কুঠুরীর দ্বার ইতিমধ্যেই ভেঙে দিয়েছিস, তবুও তোকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার এই সমস্যার ওপর তোর কিছুমাত্র দরদ জেগেছে কি না। যদি জেগে থাকে তবে শোন :

আমার প্রধান সমস্যা, আমি আজও জানি না ও আমায় ভালবাসে কি না। কতদিন আমি ভেবেছি, ওর কাছে গিয়ে মুখো-মুখি জিজ্ঞাসা করব, এই কথার উত্তর চাইব ; কিন্তু সাহস হয়নি। একদিন এগিয়েও ছিলাম, কিন্তু ওর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কথা বলবার ক্ষমতা হারিয়ে গেল, অসাড়তা লাভ করেছিল চেতনা।

ভাল ও আমাকে বাসে কি না জানি না, তবে সমীহ করে, এটা ভাল রকম জানি।

আমার সন্দেহ হয়, হয়ত ও আমায় ভালবাসে এবং আমি যে ওকে ভালবাসি এটা ও জানে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে অনুভব করি ওর প্রেমহীনতা।

বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা বড় অভিনব। হয়ত আমি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দেখি সেই সিঁড়ি দিয়েই ও নামছে, অবতরণ-কালীন ওর ক্ষণিক দৃষ্টি আমার চোখের উপর পড়ে আমার বুকে স্নিগ্ধমধুর শিহরণ জাগিয়ে যায়। একটু আনন্দ, কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় মুষড়ে পড়ি। একটি ঘরে অনেক লোক, তার মধ্যে আমি যখন কথা বলি, তখন যদি দেখি ও আমার মুখের দিকে চেয়ে আমারই কথা শুনছে, তাহলে আমার কথা বলার চাতুর্য বাড়ে আরও বেশি, আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি, এমনি ওর প্রতি আমার প্রেম। কিন্তু বড় ব্যথা।

বছর খানেক আগে আমার ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ঘটেছিল এবং আমিও সে সুযোগ অপব্যয়িত করিনি। অবিশ্যি ইতিপূর্বেই X-র চেষ্টায় অস্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা আমাদের করতে হয়েছিল। ঘটনাটা তোকে একবার বলেছি, তবু বলছি আর একবার : একটা সভা মতো করা হল, তাতে উপস্থিত থাকল X সেই সভায় আমাদের কথা বলতে হল। প্রথমে সে ত' লজ্জায় কথা বলতেই চায় না, শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল, সিগারেট খাওয়ার অপকারিতা কী? আমি এতক্ষণ উদাস হয়ে (অর্থাৎ ভান করে) ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলুম, এইবার অতিকষ্টে জবাব দিতে থাকলুম। কিন্তু সেদিন আর আলাপ এগোয়নি।

এদিকে আমি উপলব্ধি করলুম ওর সঙ্গে কথা বলার অমৃত-ময়তা। তারপর থেকে ওর সঙ্গের আমার কথা বলার তৃষ্ণা অসীম হয়ে দেখা দিল এবং সে তৃষ্ণা আজও দূরীভূত হয়নি।

এর মাস খানেক পরে এলো আর এক সুযোগ। আমাদের বেলেঘাটায় এলো ও কোন কারণে। সারাদিন ও রইল কিন্তু কোন কথা বললাম না ওর সঙ্গে। কিন্তু সন্ধ্যার পর এমন এক সময় এল যখন আমরা দু'জনেই একটা ঘরে একা পড়ে গেলাম। দুজনেই শুনলাম রেডিও। রেডিওতে গান হচ্ছিল, "প্রিয় আজো নয়, আজো নয়।" কিন্তু গানটাকে আমি লক্ষ্য করিনি এবং লক্ষ্য করার মত মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না। কারণ কাছে, অতি কাছে ও বসেছিল, বোধহয় অন্যদিকে চেয়ে নিবিষ্ট মনে গানই শুনছিল, আর আমি মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম ওকে। অত্যন্ত সুন্দর পোশাক সজ্জিতা ওকে আমার বড় ভাল লাগল। ভেবে দেখলাম এক ঘরে থেকেও দু'জনে কথা না বলা লোকচক্ষে নিতান্ত অশোভন। তাই অনেকক্ষণ ধরে মনে বল সঞ্চয় করে ডাকলুম—" × "! কিন্তু গলা দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ, কম্পিত স্বর বেরুল, ও তা শুনতে পেল না। এবার বেশ জোর দিয়েই ডাকলুম, ও তা শুনতে পেল ; চমকে উঠে আমার দিকে চাইল। এবং আমি ত এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত মুখস্থ করা কথাটা কোন রকমে বলে ফেললাম, "ইচ্ছে হলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পার।"

ও মাথা নিচু করলে, কিছুই বললে না। মনে হল ও যেন রীতিমত ঘামছে। সেদিন আমার জীবনের শুভদিন ছিল, প্রাণভরে সেদিন ওর কথা পান করেছিলাম। তারও মাসখানেক পরে এসেছিল শেষ শুভদিন—সেদিন আমাদের কলকাতার প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। মোটরে করে আমরা উপক্রমণিকার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর ইচ্ছা ছিল, আমার সঙ্গে ও সেদিন উপক্রমণিকার আলাপ করিয়ে দেবে। সৌভাগ্যবশত মোটরটা আমাদের সেখানে নামিয়েই ফিরে যায়। আর আমরাও ফিরতি পথে দু'জনের সঙ্গ অনুভব করলুম। সেদিন নেশা লেগে গিয়েছিল ওর সঙ্গে চলতে, কথা বলতে।

মনে করে দেখ, কলকাতার রাজপথে একজন সুন্দর সুবেশা মেয়ের পাশে-পাশে চলা কি কম সৌভাগ্যের কথা! ওর পাশে চলে, ওর এত কাছে থেকে, যে আনন্দ সেদিন আমি পেয়েছি, তা আমার বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকল। ও এখন বিমান আক্রমণের ভয়ে চলে গেছে সুদূর...তে। আর আমি তাই বিরহ-বিধুর হয়ে তোকে চিঠি লিখছি আর ভাবছি রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন,—

কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া
দূরে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া

আমার দ্বিতীয় সমস্যা আরও ভয়ঙ্কর। যদি আমার আত্মীয়রা জানতে পারে একথা, তবে আমার লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। বিশেষত আমার বিশ্বাসঘাতকতায় × নিশ্চয়ই আমার সংস্পর্শ ত্যাগ করবে। অতএব এখন আমার কি করা কর্তব্য চিঠি পাওয়া মাত্র জানাস।

চতুর্থ চিঠিটা দেখা যাচ্ছে ১৯৪২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর লেখা অর্থাৎ চিঠির ন'মাস পরে।

...এবার 'আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা' মেয়েটির কথা বলছি। তোকে চিঠিতে জানান ঘটনার পর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে দেখেই বিস্ময়ে উচ্ছ্বাসে মর্মরিত হয়ে উঠলেন। আমি আবেগের বন্যায় একটা নমস্কার ঠুকে দিলাম, তিনিও প্রতি নমস্কার করে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি" সঙ্গে এনেছিলাম তাঁকে দেবার জন্যে, সেখানা দিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম এবং অনেকক্ষণ গল্প করার পর বিদায় নিয়েছিলাম। সেদিন তাঁর প্রতি কথায় বুদ্ধিমত্তা, সৌহার্দ্য ও সারল্যের গভীর স্পর্শ পেয়েছিলাম এবং বিদায় নেবার পর পথ চলতে চলতে বারবার মনে হয়েছিল, সেদিন যে কথোপকথন আমাদের মধ্যে হয়েছিল তার মত মূল্যবান কথোপকথনের সুযোগ আমার জীবনে আর আসেনি। মেয়েটি স্নিগ্ধতার একটি অপরূপ বিকাশ, তার মধ্যে শহুরে চটুলতা,

কুটিলতা ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্র আবিলতার কোন আভাস পেলাম না। অথচ তার মধ্যে সুরুচি ও সংস্কৃতির অভাব নেই, সর্বোপরি পরিপূর্ণতার এক গভীর নীরবতা গ্রাম্য আবেষ্টনীর মত সর্বদা বিরাজমান। তবুও সেদিন সুস্থ হয়ে কথা বলতে পারিনি। যেহেতু আমি পুরুষ, তিনি নারী।

এইবার আমার প্রেম-কাহিনীর শেষ অধ্যায় বিবৃত করছি। কিছুদিন আগে কতদিন আগে তা মনে নেই—বোধ হয় দু'মাস হবে, একদিন...কে...দের বাড়ীতে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

পথে নেমে বহুক্ষণ চলতে থাকলুম গুন গুন করতে করতে, যতদূর মনে পড়ে "চাঁদ উঠেছিল গগনে"। প্রায় অর্ধেক রাস্তা সকৌতুকে আমাদের অবস্থা অনুভব করার পর ভাবলুম, আর নয় ব্যাপারটাকে এইখানেই শেষ করে দেওয়া যাক। একটা দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : একটা কথা বলব ? প্রথমবার শুনতে পেল না। দ্বিতীয়বার বলতেই ঔদ্ধত্যভরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বললাম : কিছুদিন আগে আমার একখানা চিঠি দেয়েছিলে ? ভ্রূকুটি হেনে ও বললে : কলকাতায় ? আমি বললাম : না, বেনারসে। ও মাথা নেড়ে প্রাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করল। আবার একটু দম নিয়ে বললাম : অত্যন্ত অসতর্ক অবস্থায়, আবেগের মাথায় পাগলামি করে ফেলেছিলাম। সে জন্যে আমি এখন অনুতপ্ত এবং এইজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। ও তখন অত্যন্ত ধীরভাবে বিজ্ঞের মত বললেন—না, না, এ-জন্যে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই, ঐ রকম মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলবার পর জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা আমার চিঠিখানার জবাব দেওয়া কি খুব অসম্ভব ছিল ? ও অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললে : উত্তর ত আমি দিয়েছিলাম! আমি তখন অত্যন্ত ধীরে ধীরে বললাম : চিঠিখানা তাহলে আমার বৌদির হস্তগত হয়েছে। কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে কাটল। তারপর ও বিষণ্ণ হেসে বললে : তা হলে ত বেশ মজাই হয়েছে। হঠাৎ বললে : আচ্ছা এ রকম দুর্বলতা আসে কেন ? অত্যন্ত বিরক্তিকর প্রশ্ন। বললাম : কাব্য-রোগের লক্ষণ। মানুষের যখন কোন কাজ থাকে না, তখন কোন একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচতে সে উৎসুক হয়,

তাই এই রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। তোমার চিঠি না পেয়ে আমার উপকারই হয়েছিল, আমি অন্য কাজ পেয়েছিলাম। ধর তোমার চিঠিতে যদি সন্তোষজনক কিছু থাকত, তাহলে হয়তো আমার কাব্যের ধারা তোমাকে আশ্রয় করত। ও তাড়াতাড়ি শুধরে নিল, চিঠি কিন্তু সন্তোষজনক ছিল না। আমি বললুম : আমার কাব্যের ধারাও সঠিক পথে চলছে।

এরপর দেখা যাচ্ছে ১৯৪৩ এর ফেব্রুয়ারীতে অরুণকে সুকান্ত লিখছেন :

আমি কিছুদিন আগে একটা বিপুল-বপু চিঠিতে অজস্র বাজে কথা লিখে পাঠিয়েছিলাম—নেহাৎ চিঠি লেখার জন্যই। সে খানা হস্ত-গত হয়েছে শুনে নির্ভয় হলাম। ও চিঠির উত্তর না পাওয়া আমার বিচলিত করেনি, যেহেতু ঐ চিঠিটার উত্তর দেবার মত মূল্য ছিল না।

এরপরে অরুণকে লেখা আর একটি চিঠি দেখতে পাই। ২০শে অক্টোবরের চিঠি। সালের উল্লেখ নেই। বিষয় দেখে মনে হয়—চিঠিটা ১৯৪২-এর ডিসেম্বরের লেখা চিঠিটার অগ্রবর্তী চিঠি এটি। পত্রাংশটি তুলে দিই :

আচ্ছা তোর সেই মেয়েটিকে মনে আছে আমাদের প্রতি সহানু-ভূতিশীল ? সহসা শ্যামবাজারের তাঁর সঙ্গে দেখা, আমার কাছে—রবীন্দ্রনাথের একটি বই ছিল, সেটি দিয়ে লাভ করলুম মোমবাতির আলোর মত তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহার।

এর পরের চিঠি (প্রেম সম্পর্কিত) লেখা ১৯৪৬ সালে। বাংলা ২৮শে ১৩৫৩ জ্যৈষ্ঠ সালে। সেখানে সুকান্তের উক্তি হল :

আমার প্রেম সম্পর্কে সম্প্রতি আমি উদাসীন। অর্থোপার্জন সম্পর্কে কেবল আগ্রহশীল।

বয়স বাড়ার সংগে সংগে সুকান্ত তাঁর কিশোর-প্রেম সম্পর্কে সাবধান হয়ে উঠেছিলেন, শেষোক্ত এই চিঠিটিই তার প্রমাণ।

শেষের দিক্‌কার সুকান্ত সাংসারিক অভিজ্ঞতায় যত পেকে উঠেছিলেন ততই কিশোর জীবনের প্রেম তাঁর কাছে অর্থহীন আবেগের রূপে দেখা দিচ্ছিল।

সুকান্তের গানে ও কবিতায় এই চিঠির আবেগের কোন সম্পর্ক-সূত্র আছে কি না তা দেখবার জন্যে পত্রাংশের গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। এটাও দেখা যেতে পারে যে, প্রেমের ব্যাপারে সুকান্তের নিষ্ঠা কতখানি,-কতখানি তাঁর আবেগের গভীরতা এবং সীমা। তারিখহীন প্রথমোদ্ধৃত পত্রের একটি অংশ এমনি :

> —এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আর কপটতার আশ্রয় নিলুম না। এই জন্যই যে, কথাটা গোপন হলেও ব্যথাটা আর গোপন থাকতে চায় না, তোর কাছে উলঙ্গ, উন্মুক্ত হয়ে পড়তে চায়। এ-ব্যাপারটা আমার প্রাণের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, তোর কাছেও তা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের বেগে সংযমের কঠিনতা গলে তা পানীয়রূপে প্রস্তুত হল তোর কৌতূহলে। তুই এ প্রেমে ফেনায়িত কাহিনীসুরা কি পান করবি না ?

সুকান্ত 'ব্যথা'র কথা বলেছেন। কিসের জন্য এই ব্যথা ? বঞ্চনার কারণে ? মিলনের ব্যর্থতার জন্যে ? সামাজিক বাধার দরুণ ? আসল সত্য কি ? এই ব্যথার সত্যতা, সততা কতটুকু ?

চিঠিখানিতে সুকান্ত যে মেয়েটির সঙ্গে তার প্রেমের কথা বলেছেন তাঁর নাম এখানে ছাপা নেই। প্রেমিকা তাঁর 'শৈশবের সাথী', 'আবাল্যের সঙ্গিনী' --সুকান্তের 'সান্নিধ্যে' যখন সে 'খুশী' হত তখন তার বয়স ৯ এবং সুকান্তের ১১। সুকান্তের চিঠি পড়ে বোঝা যায় প্রাথমিক ঐ সম্পর্ক ছিল ভাললাগার, ভালবাসার নয়। সুকান্তের ভাষায়—"আমাদের সম্পর্ক তখনও অন্য ধরণের ছিল, সম্পূর্ণ অকলঙ্ক, ভাইবোনের মত।"

> সেই ভাললাগা ভালবাসায় রূপান্তরিত হল যখন, সুকান্তের ভাষায় : "দাঁড়িয়েছি যৌবনের সিংহদ্বারে ; ...—পাশাপাশি শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে! হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ভোর হচ্ছে আর সেই ভোরের আলোয় দেখলাম পার্শ্ববর্তিনীর মুখ। সেই নবপ্রভাতের

পাণ্ডুর আলোয় মুখখানি অনির্বচনীয়, অপূর্ব সুন্দর মনে হল। কেঁপে উঠল বুক যৌবনের পদধ্বনিতে। হঠাৎ দেখি ও চাইল আমার দিকে চোখ মেলে, তারপর পাশ ফিরে শুলো। আর আমি যেন চোরের মত অপরাধী হয়ে পড়লাম ওর কাছে। লজ্জায় সেই থেকে আর কথা বলতে পারলাম না—আজ পর্যন্ত।...জিজ্ঞাসা করল, সুকান্ত কথা বলছে না কেন আমার সঙ্গে? ...বহুবার চেষ্টা করল আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে—কিন্তু আমারই বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল ওর ওপর, কেন জানি না। (আমার বয়স তখন ছিল ১৩।১৪)। এই বিতৃষ্ণা ছিল বহুদিন পর্যন্ত। আমিও কথা বলিনি। তারপর গত দু'বছর আস্তে আস্তে যা গড়ে উঠেছে, সে ওর প্রতি আমার প্রেম।

প্রেম সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণাটা নর-নারী উভয়ের উভয়কে হৃদয় দান। আমরা সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি আশা করি না। সুকান্তের প্রেম সম্বন্ধে সেই একই রকম ধারণা হওয়াই উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ৩য় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ঘটছে। উপক্রমণিকা (সুকান্ত-সমগ্র'র সম্পাদক বলেন একটি মেয়ের ছদ্মনাম) নামে আর একটি মেয়েও সুকান্তের প্রেমের আকাশে উদিত হল। তাঁর চিঠির ভাষায়:

বহুদিন থেকেই উপক্রমণিকাকে নিয়ে...রা আমাকে ঠাট্টা করত। আমার কাছে হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করল, উপক্রমণিকাকে তোর সাথে জুড়ে দিতে হবে। আমি আপত্তি করলেও খুব বেশী আপত্তি করলাম না এই জন্যে যে, ভেবে দেখলাম, আমার এই নব যৌবনে ভাল যখন একজনকে বাসতেই হবে তখন...-র চেয়ে বৈধ উপক্রমণিকাকে হৃদয় দান, সুতরাং সম্মত হওয়াই উচিত।

অভিজ্ঞজন বুঝতে পারবেন প্রেম কোনদিন প্রেমের ব্যাপারে বৈধ অবৈধের ধার ধারে না। তবে সুকান্ত কেন 'বৈধ'-এর প্রশ্ন তুলছেন। হিসেব করে কি ভালবাসা যায়? কিন্তু সুকান্ত দেখলেন যেহেতু যৌবনে নরের জন্যে নারীর প্রয়োজন এবং "নব যৌবনে ভাল একজনকে যখন বাসতেই হবে তখন X-এর চেয়ে বৈধ উপক্রমণিকাকে হৃদয় দান", ; অর্থাৎ

প্রথম মেয়েটি, যার সংগে সুকান্তের প্রেম গড়ে উঠেছে, প্রয়োজনের তাগিদে তাকে ছাড়া অন্য মেয়েকেও "হৃদয় দান" করা অসংগত নয়। যা হোক শেষ পর্যন্ত উপক্রমণিকা "রাজী হয়েও রাজী হল না।" সুকান্ত "দু'তিনবার ওর প্রেমে পড়ে মোহমুক্ত" হলেন এবং আবার প্রথম মেয়েটিকে 'সম্পূর্ণ' ভালবাসা দান করলেন। সুকান্তর পত্রবাক্য : "X-কে ভালবাসা যায় তা জানলাম"। এবং শেষ বাক্য "আমি ওকে এখন ভালবাসি পরিপূর্ণ ও গভীরভাবে"। বন্ধুর কাছে অতঃপর সাংসারিক দরকারের দু-এক কথা বলে-পত্র সমাপ্তি ঘটেছে।

ব্যাপার হল এই দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে কিন্তু ব্যথা পাওয়ার কোন কারণ সুকান্ত দেখাননি। বরং আমরা ঐ চিঠি থেকে নারীর ব্যাপারে টাটকা কৌতূহলী কিশোরের চিত্তের স্বাভাবিক অস্থিরতা লক্ষ্য করছি। যে প্রেমের সম্পূর্ণ অর্থ বোঝে না কিন্তু প্রেম সম্পর্কে যার একটা ভাসা-ভাসা ধারণা গড়ে উঠছে। নারী দেহ সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে উঠেছে, নিজের দৈহিক অনুভূতির ব্যাপারেও। কিন্তু প্রেমের মারাত্মক ক্ষুধা—যা একটি বিশেষ দেহ, একটি বিশেষ মনকে পাওয়ার আগ্রাসী কামনায় মত্ত হয়ে ওঠে সেই রকম যন্ত্রণার মুঠোয় সে ধরা পড়েনি।

পনের বছরের সুকান্তের লেখা দ্বিতীয় চিঠিখানায় আবার দেখছি উপক্রমণিকা "তার তীব্র শারীরিকতায়—তার বিদ্যুৎময় ক্ষণিক দেহ-ব্যঞ্জনায়" সুকান্তের মনকে ভরিয়ে তুলছে। তাঁর 'মনের অন্ধকারে' 'রৌদ্রময় ফুল' ফোটাচ্ছে। কিন্তু কবি সুকান্তের হৃদয়-কবি 'তার সৌরভ'-এ 'চঞ্চল' হলেও কবিতা লিখতে পারছে না—কেন না "প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা" তাঁর কাছে ন্যক্কারজনক।

কিন্তু তিনি প্রেমের কবিতা লিখছেন "প্রিয়তমাসু", "অবৈধ", "রৌদ্রের-গান", "ব্যর্থতা" ওরফে "মীমাংসা"। এ-গুলো কি তাঁর প্রেমে পড়ার আগের রচনা? যা হোক ঐ কবিতাগুলোয় সুকান্তের পত্রোধৃত "ব্যথা"র প্রকাশ ঘটেনি। প্রেমের ব্যাপারে সুকান্তের আবেগ ছিল। সে আবেগ এমনই যে তার বেগে সুকান্তের মনের "সংযমের কঠিনতা গলে তা পানীয় রূপে প্রস্তুত হল"। কিন্তু তা বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতেই আবদ্ধ থাকল, তা কাব্যরূপ গ্রহণ করল না। সুকান্তের প্রেম-কাব্য হয়ত বা মনগড়া।

যা হোক সুকান্তের আরও দু'একটি চিঠি দেখে নেওয়া যাক। দেখা যাক তাঁর প্রেম ঘনত্ব লাভ করেছিল কিনা। এর প্রথম চিঠিখানি ১৯৪২ সালে অর্থাৎ সুকান্তর ১৬ বছর বয়সে লেখা। সুকান্ত বন্ধুকে লিখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন এই বলে, "আমার এই প্রেমের উপর আস্থা ও সহানুভূতি তোর মনের কোণে বাসা বেঁধেছে কি? যদি না বেঁধে থাকে, তবে এই চিঠি পড়া এখানেই বন্ধ করতে পারিস।" অর্থাৎ সুকান্ত বলতে চাচ্ছেন যে, তাঁর প্রেম নিছক ছেলেমানুষী নয়, হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কিন্তু চিঠির এক পর্যায়ে এসে সুকান্ত যখন বলেন, "আমার প্রধান সমস্যা, আমি আজও জানি না ও আমায় ভালবাসে কিনা। কতদিন আমি ভেবেছি, ওর কাছে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব, এই কথার উত্তর চাইব ; কিন্তু সাহস হয়নি।" এবং তারপর যখন পড়ি, "আমার সন্দেহ হয় হয়ত ও আমায় ভালবাসে এবং আমি যে ওকে ভালবাসি এটা ও জানে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে অনুভব করি ওর প্রেমহীনতা।" এবং সাথে সাথে বলতে শুনি—"বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা বড় অভিনব।" তখন সত্যিই হাসি চাপা মুস্কিল হয়। এবং কিশোর জীবনের অংকুরিত প্রথম কামনার আকুলতা কৌতুকের শরীর নিয়ে উপস্থিত হয় আমাদের চোখে।

এ চিঠিখানিতেও ব্যথার উল্লেখ আছে। কিন্তু কিসের জন্য? স্পর্শকাতরতার জন্য? আলিঙ্গনে ধরবার ব্যর্থতার জন্য? চোখে চোখে চেয়ে যে "স্নিগ্ধ-মধুর শিহরণ" সুকান্তের মনে খেলে যায়—অঙ্গপরশের অসাফল্যে তার ক্ষুধা মেটে না বলে?

চিঠিখানিতে দেখা যাচ্ছে। সুকান্ত তার স্পর্শহীন সঙ্গলাভে আনন্দিত, "কলকাতার রাজপথে একজন সুন্দর সুবেশা মেয়ের পাশে-পাশে চলা কি কম সৌভাগ্যের কথা! ওর পাশে চলে, ওর এত কাছে থেকে, যে আনন্দ সেদিন আমি পেয়েছি, তা আমার বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকল।" তবে আবার ব্যথা কেন? সুকান্ত অবশ্য চিঠির শেষ পর্যায়ে বলেছেন—"ও এখন বিমান আক্রমণের ভয়ে চলে গেছে সুদূর ×-তে। আর আমি তাই বিরহ-বিধুর হয়ে তোকে চিঠি লিখছি আর ভাবছি রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন :

> "কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া
> দূরে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া।"

সুকান্তের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও বলা যায়—এ-নিতান্ত কিশোরকালীন মন-চাঞ্চল্য।

কিন্তু শেষের অংশটুকু আরও কৌতুকপ্রদ। সুকান্ত বলছেন, "আমার দ্বিতীয় সমস্যা আরও ভয়ঙ্কর। যদি আমার আত্মীয়রা জানতে পারে একথা তবে আমার লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না।"

সুকান্ত প্রেমে পড়েছেন কিন্তু প্রেমিকাকে সে-কথা জানাতে কিংবা তার কাছ থেকে জানতে সাহস পান না—আত্মীয়দের ভয়ে তিনি মহা-ভীত। অতএব এ-প্রেমের তীব্রতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল "সহানুভূতিশীলা" মেয়েটি সুকান্তের ৩নং প্রেমিকা। তাকে সুকান্ত "আবেগের বন্যায় একটা নমস্কার ঠুকে" দিলেন। যাই হোক ঐ মেয়ে সুকান্তকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা এ রকম দুর্বলতা আসে কেন?" সুকান্ত বললেন, "ওটা কাব্যরোগের লক্ষণ! মানুষের যখন কোন কাজ থাকে না, তখন কোন একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচতে সে উৎসুক হয়, তাই এই রকম দুর্বলতা দেখা দেয়।"

এ-জবাবটা কিন্তু কিশোর কিংবা নবযৌবনপ্রাপ্ত সুকান্তর নয়। এ জবাবটা হচ্ছে একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক নব আদর্শবাদের জবাব। সম্ভবত মার্কসবাদে দীক্ষিত বিপ্লবীর জবাব। যাঁদের কেউ কেউ মানুষের প্রেমকে একটি শরীরস্থ রাসায়নিক জৈবিক প্রক্রিয়া মনে করেন। কর্মব্যস্ত মানুষকে, যাঁদের মতে, প্রেম বৃহৎ চুম্বকের মত আটকাতে অসমর্থ। ঐ চিঠির শেষ দিকটা সেই ইঙ্গিতটাকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছে। যেমন—"তোমার চিঠি না পেয়ে আমার উপকারই হয়েছিল, আমি অন্য কাজ পেয়েছিলাম। ধর তোমার চিঠিতে যদি সন্তোষজনক কিছু থাকত, তাহলে হয়তো আমার কাব্যের ধারা তোমাকে আশ্রয় করত। ও তাড়াতাড়ি শুধরে নিল, চিঠিটি কিন্তু সন্তোষজনক ছিল না। আমি বললুম : আমার কাব্যের ধারাও সঠিক পথে চলেছে।"

অর্থাৎ প্রেমিকা সাড়া দিলে তাঁর—"কাব্যের ধারা" প্রেমিকাকে "আশ্রয় করত" কিন্তু সাড়া না দেওয়াতে তাঁর "কাব্যের ধারা" "সঠিক পথে চলেছে"। তার মানে সমাজবাদী আদর্শের কঠিন রেললাইন থেকে তিনি ছিটকে পড়েননি।

সত্যিকারের প্রেমিকের কাছে ওই ঘটনাটা ঠিক উল্টোভাবে ঘটত। প্রেমিকা প্রত্যাখান করলে হয় প্রেমিক তাঁকে জয় করার চেষ্টা করত অথবা ব্যর্থতার পরাজয়ের বেদনার গান গাইত যা পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কবিরা গেয়েছেন। কিন্তু সুকান্তর মন মাঝে মাঝে "ব্যথা" অনুভব করলেও তা থেকে সিন্ধু-মন্থনের তীব্র আবেগ অনুভব করেননি। কারণ নারীর প্রতি আকর্ষণে তিনি ঘেমে উঠলেও আদর্শের কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পেতে নারাজ। তাঁর কাছে মানবীর প্রেম বড় নয়, তাঁর কাছে বড় কমিউনিজমের আদর্শ। তিনি সে-কথা দ্বিধাহীন স্পষ্টতায় বলতে সংকোচ করেননি :

> আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।*

সুকান্ত অবশ্য তাঁর নির্জনতাপ্রিয়তা প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছিলেন। তবু ঐ কথার ভিতর দিয়েই তাঁর নীতি সম্পর্কিত একটি সত্যভাষণ বেরিয়ে এসেছে। আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, তিনি জনতার কবি বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে গর্বিত; আরও গর্বিত তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিয়ে। লক্ষ্য করতে হবে তিনি বলছেন, 'কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট।' সুতরাং একটা বিশেষ সময়ে সুকান্তের ভাবতে বাধেনি যে, তাঁর কবি-সত্তা তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ ব্যাপার নয়, তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ ব্যাপার হল তাঁর কমিউনিস্ট-সত্তা। এই কমিউনিস্ট-সত্তা বলে প্রেমের পক্ষে সততা এবং নিষ্ঠা বজায় রাখা কঠিন নিঃসন্দেহে। বস্তুত, হয়ত এ-জন্যেই তিনি একাধিক নারীকে ভালবাসতে সংকোচ বোধ করেননি কিংবা একই নারীতে পিনের মত এঁটে থাকতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত ভালবাসার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন। ১৩৫৩ সালের পত্রে তিনি বলেছেন : "আমার প্রেম সম্পর্কে সম্প্রতি আমি উদাসীন। অর্থোপার্জন সম্পর্কেই কেবল আগ্রহশীল।" অর্থাৎ জীবনের কঠোর বাস্তবতা তাঁর কাছে মূল্যবান

* ১৩৫১ সালে বসন্তের ১ম দিন অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৪৫ সালে সুকান্তের মেজবৌদির কাছে লেখা চিঠি থেকে।

হয়ে উঠছে, প্রেম হয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে ছিপি-না-লাগানো শিশির কর্পূরের মত।

অনেকে বোধ হয় জানেন যে মার্কসবাদের বিখ্যাত প্রবক্তা এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ চৈনিক নেতা মাও-সে-তুং বলেছেন : "মেয়েদের সাথে আমার সম্পর্ক এক কাপ চা অথবা পানি খাওয়ার মত।"

মাও-সে-তুংয়ের একটির পর একটি পত্নীত্যাগ এবং পত্নীগ্রহণ থেকে হয়ত সে সত্যের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এত বড় মানব-প্রেমিকের কণ্ঠে নারী সম্পর্কে এমন অশ্রদ্ধাশীল উক্তি শুনলে তাঁর হৃদয় সম্পর্কে সন্দেহ জাগবার কারণ আছে।

সুকান্তের কাছে নারী অবশ্য তেমন 'পানী খাওয়া'র মত ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। সুকান্ত বেঁচে থাকলে কি হত বলা মুস্কিল। কিন্তু সুকান্তের বেছে দেওয়া কবিতা সংকলন "ছাড়পত্রে" একটিও প্রেমের কবিতা না থাকাতে এ-কথা বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক যে, সুকান্ত "প্রেমে পড়ে প্রেমের কবিতা লেখাকে" শুধু 'ন্যক্কারজনক' "মনে করেননি", "প্রেমের প্রতি উদাসীন" হয়ে উঠেছিলেন।

'ছাড়পত্রে'র সুকান্তর কাছে নারী অস্পষ্ট হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে, আছে কেবল সামাজিক চৈতন্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে, কাব্যের প্রকাশ-ব্যঞ্জনার নিছক প্রয়োজন হিসেবে। 'ছাড়পত্র'র সুকান্ত পুরোপুরি কমিউনিস্ট। তাঁর কাছে 'প্রিয়া'র চেয়ে জনতা বড়, কাব্যের চেয়ে নীতি বড়। সেই জন্যেই 'ছাড়পত্র'র শেষ কবিতা শেষ হয় কাব্যের প্রতি বিদ্রূপের বাণী উচ্চারণ করে : "প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—/কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি"। সুখের বিষয় কবি-সুকান্তের কবি-সত্তার তখনও মৃত্যু হয়নি তবুও ; অন্তত "পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"র মধ্যে রূঢ় দুঃখ ঝরে পড়লেও তাতে আছে অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষার চমকপ্রদ দ্যুতি।

বাংলা গদ্যের মুক্তিদাতা প্যারিচাঁদ

আজকে যে মহামান্য লেখকের সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করব বাংলা সাহিত্যের মহারথীদের সঙ্গে তাঁর নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয় বলে আমার জানা নেই। হয়ত তিনি সেই সাহিত্য রচনা করতে পারেননি যা বিশ্ব-সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। কিন্তু আজকের বাংলা সাহিত্যের চলতি ভাষা যে মর্যাদার অধিকারী তার ভিত্তি রচনার গৌরব যে একা প্যারিচাঁদ মিত্রের প্রাপ্য তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, অন্নদাশঙ্কর এবং বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের হাতে বাংলা ভাষার চলতি রূপের অসম্ভব উৎকর্ষ সাধিত হলেও সংস্কৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধ বাংলা ভাষার উদ্ধারকর্তা একা প্যারি-চাঁদ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্যে লুপ্ত রত্নোদ্ধারের ভূমিকায় প্যারিচাঁদ মিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

> প্যারিচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারিচাঁদ তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

আজকের দিনে এসে অনুমান করা কঠিন প্যারিচাঁদ মিত্র সেকালে কি অসাধ্য-সাধন করেছিলেন। কেননা এখনকার যে কোন সাধারণ লেখকও ঝরঝরে সুন্দর কথ্য ভাষায় বাঙলা লিখতে সমর্থ। কিন্তু এ খানিকটা শক্ত মাটি চষে ঢেলা ভেঙে ফেলে দেওয়ার পর মই দেওয়ার মত সহজ কাজ। যখন বানরকে 'শাখামৃগ' এবং মোরগকে 'কুক্কুট' না বললে ভদ্রের মর্যাদা পাওয়া যেত না, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কৃতানুসারী ভাষার ছন্দ-মাধুর্যে যখন বাঙালী চিত্ত আবিষ্ট, তখন সেই সূর্যালোকের পথে নিরন্ধ্র প্রাচীরের মত অবস্থিত সংস্কৃতজ শব্দের শাসনকে অগ্রাহ্য করে, প্রবল আঘাতের দ্বারা তাতে ফাটল সৃষ্টি করে, রৌদ্র-কিরণের মত ভাষার যদৃচ্ছা গমনের পথ প্রশস্ত করেন প্যারিচাঁদ। সুতরাং বাংলা

ভাষার বন্ধন-মুক্তির সংগ্রামের প্রথম বিপ্লবী প্যারিচাঁদ, প্রথম মুক্তিদাতা প্যারিচাঁদ।

২

প্যারিচাঁদের গদ্য খাঁটি চলিত ভাষা নয়। তাঁর ভাষায় আজকের দৃষ্টিতে যথেষ্ট গুরু-চণ্ডালী দোষ আছে। তিনি তাঁর লেখায় সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। আবার বাক্যের মধ্যে অসমাপিকা ক্রিয়াকে চলিত ভাষার মত করে ব্যবহার করেছেন। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক :

> ছেলে একবার **বিগড়ে উঠলে** আর সুধরান হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এ মতো উপায় করা কর্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমে ক্রমে পেকে উঠতে পারে। তখন কুকর্মে মন না গিয়া সৎকর্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়, কিন্তু বাল্যকালের কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই **উল্টে** যাইবার সম্ভাবনা।

বিগড়ে, উঠলে, উঠতে, উল্টে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার চলিত রূপ উপরে লক্ষণীয়। অপরদিকে সাধু ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়া 'হইলে', 'পাইলে' প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করছে। বলা আবশ্যক, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যন্ত অনেকে অনেক সময় গুরু-চণ্ডালী দোষযুক্ত সাধু ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। ব্যাকরণের এই কঠিন নিয়ম লংঘনের কারণ বাক্যকে ছন্দময় করে তোলা। উল্লিখিত তিনজন মহান গদ্যশিল্পী বাক্যকে সরস এবং শ্রুতিমধুর করতেই তা করেছিলেন। প্যারিচাঁদই তাঁদের পথপ্রদর্শক। কিন্তু প্যারিচাঁদ উত্তর-সূরীদের মত যথেষ্ট সচেতন না থাকাতে তাঁর ত্রুটি কখনও কখনও সাহিত্যরস সৃষ্টির বাধার কারণ হয়েছে।

পরিবর্তনের সূচনায় এই ধরনের ত্রুটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্যারিচাঁদ রসসৃষ্টির কৌশল সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিলেন না। তাঁর লেখার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্য-রস পাওয়া যাবে। এমন কি গদ্যের মধ্যেও তিনি অলংকার ব্যবহার করেছেন কবির মত। তাই তাঁর ভাষা কখনও কখনও

কবিতার ভাষার মত মনোরম হয়ে উঠেছে। ভাল কবির ভাষার মত তাঁর গদ্যে উপমারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখানে তার দু'চারটি উপমা প্রয়োগ কৌশল দেখানো যেতে পারে :

১. প্রায় একভাবে কিছুই যায় না—যেমন মনেতে রাগ চাপা থাকিলে একবার না একবার অবশ্যই প্রকাশ পায়, তেমনি বড়ো গ্রীষ্মেও বাতাস বন্ধ হইলে প্রায় ঝড় হইয়া থাকে।

২. হনুমান যেমন রাবণের মৃত্যুবাণ পাইয়া আহ্লাদে লংকা হইতে মহাবেগে আসিয়াছিল, বাঞ্ছারামও ঐ সকল কাগজপত্র ইষ্ট কবজের ন্যায় বগলে করিয়া সেইরূপ ত্বরায় সহর্ষে বাটি আসলেন।

৩. অল্প বয়সে সুমতি না হইলে বড়ো প্রমাদ ঘটে—যেমন বনে অগ্নি লাগিলে হু হু করিয়া দিগদাহ করে অথবা প্রবল বায়ু উঠিলে একেবারে বেগে গমন করত বৃক্ষ অট্টালিকাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ শৈশবাবস্থায় দুর্মতি জন্মিলে ক্রমশঃ রক্তের তেজ সতেজ হইলে ভয়ানক হইয়া উঠে।

চাঁদের মত মুখ যার—চন্দ্রমুখী—এমনি ধরনের সমাসধৃত উপমা ঈশ্বরচন্দ্রে ছিল। কিন্তু প্যারিচাঁদ যে উপমা সৃষ্টি করলেন তা বিশুদ্ধ পূর্ণোপমার রূপ। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুলের গদ্যে এই ধরনের বহু উপমার ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং এ ব্যাপারেও প্যারিচাঁদকে পথিকৃতের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা থাকার কথা নয়।

এবার যে দিকটির কথা বলব সেটি হল প্যারিচাঁদের বর্ণনা কুশলতা। এবং বলা বাহুল্য হবে বোধ হয় যে, বর্ণনাকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলার মত শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা প্যারিচাঁদের প্রায় প্রথম শ্রেণীর লেখকের মত। এখানে একটি মাত্র উদ্ধৃতি যথেষ্ট হবে বলে মনে করি :

১. মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়—হাঁচিলে 'জীব' বলে। ওরে বলিলেই "ওরে ওরে" করিয়া চিৎকার করে ও ভাল-মন্দ সকল কথারই উত্তরে—"আজ্ঞা আপনি যা বলেছেন

তাই বটে" এই প্রকার বলে। প্রাতঃকালাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত মতিলালের নিকট লোক গম্ গম্ করতে লাগিল—ক্ষণ নাই—মুহূর্ত—নিমেষ—নাই—সর্বদা নানা প্রকার লোক আসিতেছে—বসিতেছে—যাইতেছে। তাহাদিগের জুতার ফটাং ফটাং শব্দে বৈঠকখানার সিঁড়ি কম্পমান। তামাক মুহুর্মুহু আসিতেছে—ধুঁয়া কলের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে। চাকরেরা আর তামাক সাজিতে পারে না—পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। দিবারাত্রি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাসি-খুশী, বড়ফট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল, ঠাট্টা-বটকেরা, ভাবের গালাগালি, আমোদের ঠেলাঠেলি, চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎ বাবু হইয়া উঠিয়াছেন।

এই ধরনের বর্ণনা-রীতি পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছিল। উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। ভাষার মাধ্যমে সূক্ষ্ম শ্লেষের সূঁচ দিয়ে আঘাত করার কৌশল চোখ এড়ায় না। এ-ছাড়া আছে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার। যেমন : 'ওরে ওরে' 'গম্ গম্', 'ফটাং ফটাং'। ক্রমিকভাবে শব্দের প্রতিশব্দের ব্যবহারে বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন : 'ক্ষণ নাই—মুহূর্ত—নিমেষ—নাই' আছে সাধুরীতির সমাপিকা ক্রিয়ার ক্রমিক ব্যবহারে একটি বিশেষ ভাবাবেগ প্রকাশের অনন্যতা। যেমন : নানাপ্রকার লোক আসিতেছে—বসিতেছে—যাইতেছে।

সুতরাং প্যারিচাঁদের এই ভাষাকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী লেখকের ভাষা বললে তা অত্যুক্তি হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সঙ্গে, ঘর গৃহস্হালীর সঙ্গে, ক্রিয়া কাণ্ডের সঙ্গে এবং সব ধরনের লোকের আচার-আচরণের সঙ্গে প্যারিচাঁদের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তা তাঁর শব্দৈশ্বর্য বলে দেয়। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষার শব্দে তাঁর উপন্যাসকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেন এবং তাঁরই উপন্যাসের ভাষা বলে দেয় যে শব্দ-সাধনা ভিন্ন বক্তব্যের প্রার্থিত প্রকাশ, তথা ভাবের সুষ্ঠু সম্পূর্ণ প্রকাশ, অসম্ভব। প্যারিচাঁদের দৃষ্টি-প্রাখর্যের প্রমাণ স্বরূপ

এখানে একটি উদ্ধৃতি প্রমাণ করবে শিল্পী হিসেবে তাঁর মান যথেষ্ট উচ্চের এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঔপন্যাসিকদের সমকক্ষ :

> মতিলালের শুভাগমনাবধি সোনাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একেবারে ঘোড়ার চিঁ হিঁ, তবলার চাঁটি, লুচি-পুরির খচাখচ, উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইলে লাগিল। আর মণ্ডা-মিঠাই, গোলাপ ফুলের আতর ও চরস, গাঁজা-মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল।

এখানে আবার কবিসুলভ বাক্যের মধ্যে সমান ধ্বনির শব্দ ব্যবহারে মধ্যমিল দেবার চাতুর্য আছে। অর্থাৎ প্যারিচাঁদ অনুপ্রাসিত ভাষা ব্যবহারেও সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর দু'একটি অনুপ্রাসিত বাক্যের নমুনা এখানে দেওয়া গেল :

১. নায়েব অধোবদনে টিকুতে টিকুতে—ভুঁড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে বলিতে চলিলেন—বাঙালীদের জমিদারী রাখা ভার হইল—নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল।

২. যমুনার তরঙ্গ যেন রঙ্গচ্ছলে পুলিনের একাঙ্গ হইতেছে।

এই ভাষা ছন্দবদ্ধ, সে-জন্যে মনোরম এবং সুখপাঠ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষাকে এতটা সমৃদ্ধ করার শক্তি ছিল যাঁর, তিনি যে সামান্য লেখক নন সে-কথা বলা, বোধ করি, বাহুল্য।

পাঠককে প্যারিচাঁদের আর একটি কৌশলের সঙ্গে পরিচয় করানো যেতে পারে। প্রবাদ ও বাগধারা ব্যবহারে প্যারিচাঁদ যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। দু'চারটি উদাহরণ :

১. অন্য কতকগুলো যতো বড়ো মানুষ আছে তাহাদের উপরে চাকন-চিকন ভিতরে খ্যাঁড়। বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচার কীর্তন।

২. কৌশলে কিছু না হয়তো বিলাত পর্যন্ত করিতে হইবে। এ কি ছেলের হাতের পিঠে ?

৩. এক্ষণে টাকার যত মান তত মান বিদ্যারও নাই ধর্মেরও নাই। আর বড়ো মানুষের খোশামোদ করাও বড় দায়। কথাই আছে—"বড়োর পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ"। কিন্তু লোকে বুঝে না—টাকার এমন কুহক যে, লোকে লাথিও খাচ্ছে এবং নিকটে গিয়া যে আজ্ঞাও করছে।

৪. ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইতে পারি না, আর নাচতে বসেছি ঘোমটাই বা কেন ? ঠক্ চাচাও তো অনেকের মাথা খেয়েছেন তবে ওঁর মাথা খেতে দোষ কি ? কিন্তু কাকের মাংস খাইতে গেলে কৌশল চাই।

দেখতে পাচ্ছি রসসৃষ্টির সকল প্রকার কৌশল প্যারিচাঁদের আয়ত্তে ছিল। প্যারিচাঁদ যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমনি ভাষার ব্যবহার করেছেন।

৩

প্যারিচাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ভাষা ব্যবহারে তাঁর অরক্ষণশীল মনোভাব। বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশের সকল সমাজের নিত্য ব্যবহৃত প্রচলিত শব্দ। স্পর্শ বাঁচিয়ে কেবল সংস্কৃত শব্দকে সংরক্ষণ করার মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়। এতে ভাষা শক্তিশালী হয় না, ভাব প্রকাশ তেজোদ্দীপ্ত হয় না, ভাষার গতিশীলতাও নষ্ট হয়। আর সংস্কৃতির বেড়ী পরানো ভাষা সত্যিকারভাবে কখনো বাংলা ভাষা নয়। প্যারিচাঁদ তা বুঝেছিলেন, তাই তিনি পণ্ডিত কর্তৃক অস্পৃশ্য অন্ত্যজ শব্দকে যেমন তেমনি দেশী-বিদেশী সকল প্রকার শব্দকে নিষ্কুণ্ঠভাবে ব্যবহার করেছেন। সমাপিকা এবং কখনো কখনো অসমাপিকা ক্রিয়ার সাধুতা তিনি সাধুভাষীদের মত সংরক্ষণ করলেও ওরই মধ্যে কথ্য ভাষার শব্দ-প্রাণকে সংযুক্ত করে বাংলা ভাষার হৃৎপিণ্ডকে তিনি আয়ুষ্মান করে তুললেন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র প্যারিচাঁদকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন বাঙালী পাঠককে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা উপলব্ধি করতে আমন্ত্রণ জানাই :

একজনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা আবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী প্রণেতা এবং ইংরেজীতে গ্রহসনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে কেহ তাহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয় সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভা-শালী কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময় মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন। কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে-সাহিত্যের পাঁচ-সাতজন মাত্র অধিকারী, সে-সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্যারিচাঁদ ঐ 'পাঁচ-সাত জনের' ভাষা থেকে বাংলা ভাষাকে উদ্ধার করেন এবং সে জন্যই বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী-ফার্সী-হিন্দী-ইংরেজী-পর্তুগীজ-বার্মিজ সব ভাষাই অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যবহার করতে থাকেন। এখানে তাঁর ভাষায় ব্যবহৃত কিছু চলিত শব্দের তালিকা দিলেই বোঝা যাবে প্যারিচাঁদের হাতে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা সামনে এগিয়ে যাওয়ার মত কতটা প্রাণশক্তিতে বলীয়ান হয়েছে :

বাগবাগিচা, তালুক, পেনসন, বানকে, আস্কারা, এয়ারবক্সি, খোরাক, নানা, কেতাব, বেআদব, কট্‌মট্‌, ঠক্‌ঠক, কস্তাকস্তি, ধস্তাধস্তি, ইজারা, বিজর, মাণ্টার, কাচ্চাবাচ্চা, ত্যক্ত, তচনচ, ফচ্‌কে, চেংড়া, ঝালাপালা, কল্লে, পিটপিটে, চিড়চিড়ে, বেদড়া, ক্লাস, কারবার, ফিকির, হলাহলি, হারামজাদী, উদপাজুরে, ছোঁড়া, ফট্‌কি, ন্যুট্‌কি, উড়ুউড়ু, ভড়ুঙ্গে, তদারক, চেপেচুপে, তরজমা, মুনাফা, ছটফটানী,

ডেস্ক, সহসা, হাপ, বাগড়াবাগাড়ি, হিড়াহিড়, ছেকড়া, পটাপট, সওয়াব ঝকমারি, কচকচি, কর্জদার, সরগরম, জমজমাট, চাকনাচিকন, পেড়া-পোঁড়, মাগী, বৌ কাঁটাক, ধাড়িবাজ, দেদার, ববে, চটকে, ফরফর, জারিজুরি, সাফসুতরা, ঘাঁতঘুঁত, ইস্তজৎ, আয়েব, তাকুত, সরেওয়ার, কেরদানী, মেহনত, পুসিদা, তর্সাবির, কেতাব, কসুর, মজবুত, বেলেল্লা, কুদরৎ, তারিকত, মোয়াফেল, তোয়াজ, ফুসফাস, হররোজ।

এখানে ইংরেজী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ ছাড়াও গ্রাম্য দেশী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। বাছাই করে কোনো একটি বাক্যকে মার্জিত ভদ্র করার চেষ্টা করা হয়নি।

এই হাজারো রকমের শব্দের ব্যবহার ভিন্ন সামাজিক চেহারার নিখুঁত রূপটা তুলে ধরা সম্ভব হত না। মার্জিত করতে গেলেই তাকে সংস্কৃত করতে হত। আর সংস্কৃত করলেই সে প্রকৃত বাংলা ভাষার স্বরূপ থেকে দূরে সরে যেত। প্যারিচাঁদ তা করেননি। আর করেননি বলে আজকের দিনে এসে তাঁকে বাংলা ভাষার মুক্তিদাতা হিসাবে শ্রদ্ধা জানাই।

বলা বাহুল্য হবে না আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষায় চালু সমস্ত শব্দ ব্যবহারের পরীক্ষা চলেছে—স্ল্যাং শব্দ পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার করে পাশ কাটিয়ে আধুনিক লেখকেরা আগে বাড়তে গিয়েই লক্ষ্য করেছেন ভাষার স্বাস্থ্যোন্নতি শব্দ বর্জনে হয় না, হয় শব্দ অর্জনে। এই শব্দ অর্জনের মন্ত্রগুরু প্যারিচাঁদ যে, সে-কথা বোধ করি আরও বিশ্লেষণ করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

সাহিত্যের পাঠক

সাহিত্যের পাঠক কে? সব পাঠকই কি সাহিত্যের পাঠক? যাঁরা দর্শনের বই পড়েন কিংবা বিজ্ঞানের বই পড়েন তাঁরা সাহিত্যের বই পড়েন কি?

যাঁরা লিখতে পড়তে জানেন না তাঁরা পাঠক নন; এবং যাঁরা কেবল পড়তে জানেন কিন্তু কোন একটি ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষিত নন তাঁরাও ঠিক পাঠক নন। পাঠক যিনি তাঁকে প্রথমত ভাষা জানতে হবে। এবং সাহিত্যের পাঠককে সাহিত্যের ভাষা জানতে হবে।

সাহিত্যের ভাষা কি? সাহিত্যের ভাষা আর সাহিত্য বাদে অন্য কোন গ্রন্থে মুদ্রিত ভাষা কি এক? বিষয়টি আলোচনা করে দেখা যাক।

আমরা মনে করি সাহিত্যের পরিধি বিজ্ঞান এবং দর্শনের পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপ্ত, অনেক বেশী বিস্তীর্ণ। বিজ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়ে, দর্শন দর্শনকে নিয়ে কিন্তু সাহিত্য সকলকে নিয়ে। হয়ত তাই যে পাঠক বৈজ্ঞানিক অথবা যে পাঠক দার্শনিক, সাহিত্য তার জন্য রুদ্ধ-গৃহ নয়। সাহিত্যের কলা-কৌশল, আঙ্গিক-রূপ বাদ দিয়ে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তাঁদের মনোমত, মনোগত এবং মনোনীত বিষয়টি সম্বন্ধে অন্য বিষয়ানুরাগী মানুষের চিন্তাভাবনা টের পেতে পারেন। এ-কারণে তিনি একজন সাহিত্যের পাঠক হলেন। তাঁর কাছে রহিম-করিমের চরিত্র, বাদশা-বেগমের প্রেম আসল নয়? আসল নয়, লেখক আদর্শের ব্যাপারে কতটা প্রাচীন, কতটা আধুনিক তার পরিমাপ। তাঁর কাছে আসল ব্যাপার, তাঁর ভাবনাগত বিষয়—তিনি দেখবেন সাহিত্যে তাঁর সেই বিষয় কতটা মর্যাদা পেয়েছে এবং তাঁর কার্যকারণের সংগে কতটুকু সাদৃশ্য বজায় রেখেছে। এ-পাঠক কি লেখকের কাছে বরেণ্য?

এক শ্রেণীর পাঠক আছেন যাঁরা ধর্ম ছাড়া কিছু বোঝেন না। ধর্মই তাদের কাছে মুখ্য। সংসারের অন্য যাবতীয় যা কিছু সব গৌণ। মানুষের মন আর মনন নিয়ে, মানুষের যাতনা আর মর্মবেদনা নিয়ে, মানুষের দুঃখ আর দারিদ্র্য নিয়ে সাহিত্যিক কি করলেন না করলেন, ভাষার্থী তিনি

কতটুকু পরিবর্তন আনলেন, কতটা গতি সঞ্চার করলেন, আবেগ বিস্তার করলেন এ-সব তাদের জানবার বিষয় নয়—তাঁরা দেখতে চান ধর্ম, জানতে চান ধর্ম, বুঝতে চান ধর্ম। এ-পাঠককে লেখক কি মনোনীত করবেন?

ধরা যাক কোন একজন ভদ্রলোক রাজনীতি পছন্দ করেন। রাজনীতিই তাঁর ধ্যান, রাজনীতিই তাঁর জ্ঞান। সভায়-সমিতিতে, আড্ডায়-আসরে একটু পরিসর পেলে যিনি স্রোতের মত রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং যে বৈঠকে রাজনীতি নেই, যে সভায় রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় না, যে গৃহবেষ্টনে রাজনীতির পর্যালোচনা নেই এবং যে সাহিত্যে রাজনীতি আসন পায়নি তিনি সে সমস্তকে পছন্দ করেন না। লেখক কি এদেরকে সম-মর্মীর আসন দেবেন?

তা হোক, তবু যে তিনি পাঠক তাতে সন্দেহ নেই। কেন না বলেছি, যে, সাহিত্য বিরাট পরিসরে বিস্তৃত এবং তার পৃথিবী জড়-অজড়, প্রাণ-অপ্রাণ সব কিছুর জন্য নির্বিশেষ। সাহিত্য ব্যক্তির কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির নয়—জাতি, গোষ্ঠী, শ্রেণীর কিন্তু কোন বিশেষ শ্রেণীর নয়—সাহিত্য সকলের। প্রেমিক-অপ্রেমিক, দুঃখী-সুখী, ধনী-দরিদ্র, ভাগ্যহীন-ভাগ্যবান, সৎ-অসৎ, সাধু-অসাধু, অলস-নিরলস, ধার্মিক-অধার্মিক, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সবার জন্যে, সকলের জন্যে সাহিত্য।

সবাই সাহিত্য পড়তে পারেন, পাঠক হতে পারেন কিন্তু প্রশ্ন হল লেখকদের সেই সহৃদয় পাঠক কি হতে পারেন?

আমাদের মনে হয় তা পারেন না। সব পাঠক সহৃদয় পাঠক হতে পারেন না। হয়তো এই জন্যই বিদ্যাপতি লিখেছিলেন :

কত বিদগধজন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখেনা মিলল এক।

সে রসিক লক্ষজনের মধ্যে একজন, যার ধর্ম নেই, জাতি নেই, গোষ্ঠী নেই, সম্প্রদায় নেই, দেশ নেই, কাল নেই ; যার কাছে সত্য কেবল রূপ ; এই রূপের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য এবং আনন্দের জন্য যে পাঠক—লেখকের পাঠক তিনি।

তাই যদি হয়, তাই যদি সত্য হয়, তাহলে কোন লেখকের কাছে রাজনীতি কেন প্রধান বিষয়? কেন ধর্ম একমাত্র আদর্শ কারও কাছে? কেউ জাতির কথা, দেশের কথা, সম্প্রদায়ের কথা কেন লিখবার সময় ভুলতে পারেন না? এঁরা কি চান না যে অন্য ধর্মের, অন্য জাতির, অন্য দেশের, অন্য সম্প্রদায়ের, অন্য মতের অথবা আদর্শের লোক তাঁদের সাহিত্য পড়ুক? মানুষের স্বভাবটা এমনি যে তার উপর পরিবেশের প্রভাব সংক্রমিত হবেই। খাঁটি সাহিত্যিক কি এই দেয়াল টপকাতে পারেন? বোদলেয়ার লিখেছিলেন :

> বল আমাকে রহস্যময় মানুষ কাকে তুমি সবচেয়ে বেশী ভালোবাস?
> তোমার পিতামাতা ভ্রাতা অথবা ভগ্নীকে?
> পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী কিছুই নেই আমার।
> তোমার বন্ধুরা?
> ঐ শব্দের অর্থ কখনো জানিনি।
> তোমার দেশ?
> জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
> সৌন্দর্য?
> পারতাম বটে তাকে ভালবাসতে—দেবী তিনি, অমরা···
> কাঞ্চন?
> ঘৃণা করি কাঞ্চন যেমন তোমরা ঘৃণা কর ভগবানকে।

এ-কবি দেশ কাল পাত্রকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর কাছে সত্য কেবল সৌন্দর্য—আত্মীয়, বন্ধু, দেশ নয়। এ-সমস্তের সংকীর্ণতাকে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন কিন্তু ঐ সবের প্রভাব কি তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হয়নি, তিনি কি তাদের আত্মীয়তা এড়াতে পেরেছিলেন? তাঁর লেখায় কি তাঁর জন্মভূমি প্যারিসের কোন দান নেই, নেই তাঁর চরিত্রগত গুণাগুণ?

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আমি পৃথিবীর শিশু।' কিন্তু অন্যখানে লিখেছিলেন : 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে/এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।' পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রান্তর থেকে গৃহের কোণে তিনি গুটিয়ে এলেন। বলাবাহুল্য প্রথমোক্ত কবির মধ্যে এই স্বাদেশিকতার দুর্বলতা কম। কিন্তু জগতের অনেক বড় বড় সাহিত্যিক এই

দুর্বলতার শিকার হয়েছেন। রাশিয়ার দস্তোয়েভস্কি একদা বলেছিলেন : মানুষের মুক্তির সন্ধান দিতে পারে একমাত্র খৃষ্টান ধর্ম। প্যাস্টারনাককেও বড় অনুরাগী দেখা যায় এই খৃষ্টধর্মের।

প্রকৃতপক্ষে এটা মানুষিক স্বভাব। একেবারে আদর্শহীন, ধর্মহীন মানুষ বলে কিছু নেই। এবং লেখকেরা যেহেতু মানুষ তাই তাঁরাও এর থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না ; উপরন্তু ভাস্করের মূর্তি গড়ার জন্য যেমন পাথরের প্রয়োজন হয়, হাতুড়ি-বাটালীর প্রয়োজন হয় তেমনি রূপ ফোটানোর জন্য লেখকের প্রয়োজন হয় আধারের। সে উপকরণ বিদেহ নয়, দেহ, তা হাওয়া থেকে আহৃত হয় না। লেখককে পৃথিবীর দিকে চাইতে হয় আর পৃথিবী বলতে লেখকের কাছে প্রথমত তাঁর চতুষ্পার্শ্ব, তাঁর পরিবেশ, তাঁর সমাজ, তাঁর ধর্ম, তাঁর কাল এবং তাঁর দেশ। আমাদের কথা হল এই স্থান-কাল-পাত্রে বন্দী লেখকের পাঠক আর বিদ্যাপতি এবং বোদলেয়ারের পাঠক কি ভিন্ন ? যাঁদের কাছে বিষয় কেবল বড় নয়, বড় রূপ, বড় সৌন্দর্য ?

বলেছি বস্তু ব্যতিরেকে রূপ কল্পনা করা যায় না যেমন কল্পনা করা যায় না শরীর ছাড়া আত্মার। কিন্তু একটা কথা, মানুষের মধ্যে সেই উন্নত যে প্রকৃতি অপেক্ষা অপ্রাকৃতিক ক্ষুধার প্রতি বেশী আকৃষ্ট। এই স্বভাবের বিপরীতে পরিচালিত রূপ-পাগল পাঠকই কি সাহিত্যের সত্যিকার পাঠক ?

কিন্তু এতদূর এসেও আমাদের প্রশ্নগুলো অমীমাংসিত থাকে। অর্থাৎ পাঠক আর সাহিত্যের পাঠকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কতটুকু তা আমরা এ পর্যন্ত ভালভাবে দেখাতে পারিনি। এখানে পাঠকের বিশেষণ হিসেবে আমরা 'অলস' এবং 'নিরলস' শব্দ দুটি ব্যবহার করতে চাই। একজন নিষ্ক্রিয় পাঠক অপরজন সক্রিয় পাঠক। সাহিত্যে যে সমস্ত গ্রন্থ সরেস, সহজবোধ্য এবং সহজপাঠ্য নিষ্ক্রিয় পাঠকের পক্ষে সেইগুলোই স্বাদু। ঐ রকম রীতিতে লিখিত বইগুলো পড়ার জন্য শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, শিক্ষিত হতে পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় না। প্রশ্ন হবে, সাহিত্যের পাঠক হতে কি পরিশ্রম করার প্রয়োজন আছে ? অবশ্যই। সাহিত্যের ভাষায় যাকে সাহিত্য বলে তার সম্পূর্ণ রসাস্বাদ অশিক্ষিত থেকে করা যায় না। ধরা যাক 'বিষাদ-সিন্ধু' একটি বই, যেটা সাহিত্যও বটে এবং যেটা শিক্ষিত

অশিক্ষিত সকল পাঠকই পড়েন এবং সবাই পড়ে আনন্দ পান। এ-বইয়ের শিক্ষিত পাঠক কে আর অশিক্ষিত পাঠক কে? আনন্দ তো দু'জনই পান কিন্তু দু'জনের আনন্দ কি একই রকম? অশিক্ষিত পাঠকের কাছে গল্পের বিষয়টি আনন্দের এবং লেখকের বলার ভঙ্গিটি। তিনি কেন যে আনন্দ পাচ্ছেন তা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না কিন্তু শিক্ষিত পাঠক পারেন। সেখানে লেখকের চেতনার সমধারায় তাঁর চৈতন্য প্রবাহিত। অর্থাৎ লেখক কি ভাবে হাসাচ্ছেন, কি ভাবে কাঁদাচ্ছেন অথবা লেখক কি ভাবে হাসছেন, কাঁদছেন তিনি তা বুঝতে পারেন। অর্থাৎ তিনি লেখকের মন মানস প্রাণের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন।

সাধারণ পাঠকের নিজস্ব মতামত থাকবে না। তিনি বলতে পারবেন না কোন চরিত্রটি উজ্জ্বল, কোনটা নিরুজ্জ্বল, কোনটি সপ্রতিভ, কোনটি অপ্রতিভ। চরিত্র হিসেবে কে সম্পূর্ণ, কে অসম্পূর্ণ—এজিদ, হোসেন অথবা হানিফা? এর ভাষাগত সার্থকতা কতটুকু এবং কাহিনীগত সত্যতা কতটা। তার মানে সাধারণ পাঠক আবেগ-নির্ভর, শিক্ষিত পাঠক বুদ্ধি-নির্ভর।

কিন্তু এখানে অলস, নিরলসের প্রশ্নের মীমাংসা হলো না। আমি প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছি 'সাহিত্যের ভাষা'। সাহিত্যের ভাষা কি? হাসান আজিজুল হক তাঁর 'বিমর্ষ রাত্রি' গল্পটি শুরু করেছেন এমনিভাবে :

> বড় বড় ফোঁটায় গায়ে গায়ে ঘন হয়ে বৃষ্টি নামে। যেন উত্তুরে বাতাসে দক্ষিণে হেলে একটি ধূসর রঙের শাড়ী ঝুলছে। আমাদের বাস মদমত্ত করীর মত সেই ধূসর রঙের শাড়ী ছিঁড়ে ফুঁড়ে গায়ে মাথায় জড়িয়ে শুঁড় উঁচিয়ে উত্তরমুখো ছুটলো।

উপরে উদ্ধৃত ঐ বাসের যাত্রী একজন পত্রিকার রিপোর্টার হলে তাঁর ভাষাটা অমনি হতো না। ভাষার মধ্যে এখানে যে রূপটুকু ঐটাই সাহিত্যের ভাষা। পার্থক্যটুকু ঘরের সাদামাটা লোকের সঙ্গে অভিনয় মঞ্চের মেকআপ করা লোকের। একই মানুষ কিন্তু মঞ্চের মানুষটি আমাদের স্বপ্নের, কল্পনার। সাহিত্যের ভাষায় ঐ বৈশিষ্ট্যটাই আসল।

'বিষবৃক্ষে'র প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : "নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে

গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্‌চল্‌ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত-অনন্ত-ক্রীড়াময়।”

নদী-প্রকৃতির বর্ণনা-ভঙ্গি এই ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় হলে কেমন হতো? এ ভাষায় রূপ আছে, রঙ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, আছে কৃত্রিমতা। প্রকৃত সাহিত্যের এই ভাষা কৃত্রিম, যাকে আবিষ্কার করতে হয়। মানুষ অকৃত্রিমেও আনন্দ পায়, কৃত্রিমেও আনন্দ পায়। কিন্তু কৃত্রিমের আনন্দ মানুষের কাছে বেশী। কারণ মানুষ সেটা গড়ে। কারণ মানুষ সেটাকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, অভিজ্ঞতা এবং শক্তি দিয়ে গড়ে। সে যে নিজে স্রষ্টা হতে পেরেছে এইজন্যে তার আনন্দ বেশী।

কৃত্রিম কি? যেটা আছে সেটা নয়, যেটা হলে আরও ভালও হতো সেটা; অর্থাৎ মানুষের মনে কিংবা চোখে যেটা আরও ভালো লাগতো সেটাই কৃত্রিম। সেটাকেই সৃজন করা মানে কৃত্রিমতার আনন্দকে লাভ করা। সাহিত্যের ভাষা এই আনন্দের ভাষা। এ-ভাষা বুঝতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। সে শিক্ষা কোন বিদ্যালয়ের নয়। সে শিক্ষা-বোধের, বুদ্ধির, অনুভূতির। এই বোধ এবং অনুভূতি যাঁর যত প্রখর, যাঁর যত তীক্ষ্ণ, যাঁর যত স্পর্শকাতর সাহিত্যের পাঠক হিসাবে তিনি তত শিক্ষিত, তিনি তত সহৃদয়।

আমাদের কথাগুলোও তবু স্পষ্ট হয়নি। আর একটু বলা প্রয়োজন। সাহিত্যে উপকরণের উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য আছে। বিজ্ঞানে অথবা দর্শনে উপাদানের যে রকমের ব্যবহার সাহিত্যে তার ব্যবহার অন্য রকমের। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন: “হতে পারে কবিতা জীবনের নানা রকম সমস্যার উদ্ঘাটন; কিন্তু উদ্ঘাটন দার্শনিকের মত নয়; যা উদ্ঘাটিত হল তা যে কোন জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে।”

তার মানে সাহিত্যের বিষয়টি সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠা চাই। এবং সাহিত্যের পাঠককে চাই এই সৌন্দর্য অবলোকন করার চোখ।

এই সঙ্গে আমরা আর একটা কথা সংযোগ করতে পারি। ‘সাহিত্যের নেশা’ বলে একটা কথা আছে। এই নেশাখোর পাঠকটির কাছে সাহিত্যই একমাত্র আকর্ষণ। মোটের উপর তিনি সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন

না, ভাবেন না। কিন্তু এ-পাঠক যিনি তিনি লেখকও বটেন। এবং প্রকৃত-পক্ষে শ্রেষ্ঠ পাঠক যিনি তিনি হলেন স্বয়ং লেখক।

আমাদের প্রবন্ধ শেষ হলো। পাঠক, আমরা উচ্চস্তরের যে সমালোচক-পাঠকের কথা বলেছি পাঠক মাত্রই যদি তাই হতেন? অর্থাৎ লেখা দেখলেই ক্ষুধিত শিশুর মত না গিলে তর্জনীর শীর্ষ দিয়ে যদি তিনি নেড়ে, জিভের ডগায় স্বাদ নিয়ে, খাদ্য গ্রহণের মত করে, লেখার গুণাগুণ বিচার করে, লেখা পড়তেন, তা'হলে? লেখক কি এমন শ্রেষ্ঠ পাঠক নিয়ে খুশি হতে পারতেন? মনে হয় না। লেখক যে পাঠক চান তিনি লেখক-পাঠক নন, সমালোচক-পাঠক নন। তবে কি তিনি রসিক পাঠক? কোনটা ভাল লেগেছে জিজ্ঞাসা করলে যিনি উত্তর দেবেন—

তোমারে করিব পান, অনামিকা,
শত কামনায়
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!

মাহে-নও
চৈত্র : ১৩৭২
মার্চ : ১৯৬৬

আধুনিক মানুষ

মানুষ স্বনির্মিত জগৎ সৃষ্টি করতে আনন্দ পায়। বিধাতার সুন্দর সৃষ্টিতে সে মুগ্ধ হলেও তার আত্মার পূর্ণ তৃপ্তি তাতে ঘটে না। সে নিজেই স্রষ্টা হতে চায়, সৃষ্টি করতে চায় তার মনোনীত জগৎ। মানুষের গড়া এই জগৎ শিল্প। বিধাতাকেই অনুসরণ করে মানুষ গড়তে চায় অন্য জগৎ। এ জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা, সম্পূর্ণ নতুন ; পাখীর অনুরূপ অন্য পাখী, প্রকৃতির অনুরূপ অন্য প্রকৃতি ;—কিন্তু তা অনন্য পাখী, অনন্য প্রকৃতি, শিল্পীর প্রকৃতি ;—শিল্প।

প্রশ্ন করি, বিধাতার তৈরী প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে যে প্রাণ স্পন্দিত সে কি মানুষের সৃষ্টিতে জাগে ?

অবশ্যই। নিস্পন্দ পাথর দিয়ে ভাস্কর যে মূর্তি গড়ল অথবা কঠিন পাথরের বুকে সে যে ফুল ফোটাল, শব্দ করে সে পাষাণ মূর্তি হাসল না বটে কিংবা সে ফুলের পাপড়ি বাতাসে দুলল না ঠিক, কিন্তু বিকচ ফুলের রূপ আর স্থির হাসির রূপ সে যথাযথ ফোটাতে পারে। বিষাদমধুর মোনালিসার হাসি কি রক্ত-মাংসের মানুষের হাসিকে ম্লান করতে পারে না ? স্বভাবের তৈরী নয় এই জগৎ, কৃত্রিম জগৎ। শিল্পীর সৃষ্টি মাত্রই তাই কৃত্রিম। বোদলেয়ার এই কৃত্রিমের সাধনা করেছিলেন, শিল্পের সাধনা করেছিলেন। আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিক এই কৃত্রিমের সাধক।

সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের এই কৃত্রিম জগৎ গড়বার উৎসাহ ক্রমেই বাড়ছে। পাখীর মত সে নিজে ডানা মেলতে না পারলেও আকাশে উড়বার আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত নয়। যে বিধাতা তাকে কেবল মাটিতে চলবার ক্ষমতা দিয়েছিল স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়ে সে তা অতিক্রম করল। এই যে ব্যতিক্রম, প্রকৃতির অবিচলিত নিয়ম থেকে এই যে উত্তরণ এ তাকে নতুন পৃথিবী তৈরীর প্রেরণা। এই নতুন পৃথিবী নগর। প্রান্তরভূমির দূর্বা-ঘাসের উপর মসৃণ পাথরের রাস্তা, বনস্পতিহীন ভূমির উপর আকাশচুম্বী প্রাসাদ, জ্যোৎস্না-বিজয়ী বিজলী বাতির সন্ধ্যা এই সেই মনুষ্য আবিষ্কৃত

নগর ; বনবালা নয়, নটরানী, চিত্তহারিণী আধুনিক মানুষের মনবন-বিহারিণী।

ধর্ম যে আশ্বাস দিল স্বর্গ আছে, যা এই দুনিয়ায় নেই, যা আমরা মৃত্যুর পরে অন্য দুনিয়ায় আশা করতে পারি মানুষ সেই অপার্থিবের জন্য অপেক্ষা করেনি। তা করলে, সত্যি বলতে কি, সভ্যতার দান এই আধুনিক মনোহর দুনিয়া মানুষ কোনদিন পেত না হয় ত। মানুষ চাইল এই পৃথিবীতে স্বর্গের রচনা। যতদিন মন আছে তার বাসনা এই পৃথিবীতেই পূর্ণ করে যেতে হবে। তার মানে লোভ নয়, মানুষেরই অন্তরোদ্ভূত সৌন্দর্য-প্রীতি। মানুষের যে স্বপ্ন স্বর্গের কল্পনা করেছে সেই স্বপ্নাহরিত মাধুর্যে দিয়ে নির্মিত সৌন্দর্যই মানুষের গড়া স্বর্গ। বলা বাহুল্য নাগরিক মানুষেরাই এই স্বর্গের দ্রষ্টা। আমাদের একজন আধুনিক কবি যখন বলেন :

> ঊর্ধ্বশ্বাস ট্রাফিকের ব্যস্ততায় বিজ্ঞাপনের মতো
> ঝলমলিয়ে ওঠা হাসি
> শিরায় আনে আশ্চর্য শিহরণ ;
> মনে হয় যেন ঢোক করে গিলে ফেলেছি
> এক ঢোক ঝাঁঝালো মদ। আর প্রহরে প্রহরে
> অজস্র ধাতব শব্দ বাজে আমার রক্তে,
> যেন ভ্রমরের গুঞ্জন।
> কখনো দেখি, রাত্রির ফুটপাথের ধারে এসে জমে
> সারি সারি উজ্জ্বল মসৃণ মোটর,
> যেমন গাঢ়-সবুজ ডালে ভিড় করে
> পাখীর ঝাঁক সহজ অভ্যাসে।

তখন বুঝতে পারি মানুষের পরিকল্পিত বাসনা সে কিছুটা চরিতার্থ করতে পেরেছে। যন্ত্র মানুষ অথবা পাখীর কণ্ঠজাত সুর আমাদের শোনাতে পারে।

মানুষের ঐ একটি স্বভাব ; জীবন্ত পাখীর সৌন্দর্য দেখে এবং তার সুন্দর ডাক শুনে আমরা আনন্দ পাই বটে কিন্তু যে পাখী মানুষের গড়া, যন্ত্র যার পাখা দোলায় আর যন্ত্র যাকে গান করায় কিংবা যে পাখী চিত্র হয়ে

অপরূপ রঙের মধ্যে বসে থেকে কল্পনায় দোল খেতে থাকে তাকে দেখে মানুষ অন্য এক আনন্দ পায়। সভ্য মানুষের এই আনন্দ পাওয়ার নেশা যত বেড়েছে ততই সে শিল্পিত জীবনের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছে। এই নব শিল্পের জগতে বিধাতা নয়, মানুষের শক্তির গৌরব রক্ষিত। বিধাতা যেটা গড়েন সেটা ত স্বাভাবিক, সেটা ত স্বভাব, সেটা ত বিনা প্রয়াসেই সম্ভব ; কিন্তু প্রয়াসের দ্বারা যা সম্ভব যা অপ্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম মানুষের সেই সৃষ্টিই শিল্প, অদৃষ্ট আত্মার আনন্দ।

এখনকার মানুষের আকাঙ্ক্ষা হল একটা শিল্পিত জীবনের। একটা শাসিত, সংস্কৃত, ছন্দিত জীবনের। গুহা জীবনের অথবা তার পরবর্তী বুনো অথবা মেঠো জীবনের অকৃত্রিম উচ্ছৃঙ্খল আচার তাকে স্পর্শ করবে না, আর সে কর্দমাক্ত ধূলিলিপ্ত শরীরে পথে পথে গান গেয়ে আনন্দ পাবে না।

মানুষ নিজেই হবে কবিতা অথবা ঐ ফ্রেমে বাঁধা চিত্র যার সঙ্গে অসুন্দ-রের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ ধূলিলিপ্ত হতে চায় না, ধূলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা তারা হতে চায়—যার পদতলে থাকবে আকাশের ধূলিহীন নীল।

কেন এই আকাঙ্ক্ষা জাগে মানুষের ? কেন এই পৃথিবীতে সৃষ্ট অন্য জীবের মত সে শুধু ক্ষুধা নিবারণ করে তৃপ্ত হতে পারে না ? কেন শুধু দেহকে বাঁচিয়ে রাখার মত সমস্যার সমাধানের পর তার দুঃখ থেকে যায় ? কেন কোন অলৌকিকের জন্যে তার অন্বেষণের পথ অফুরান থাকে ?

উত্তর : মানুষ মানুষ বলে। স্বভাবকে মেনে চললে মানুষ এই মানুষ হতে পারত না, সে থাকত পশু জগতের প্রাণী হয়ে। স্বভাবকে অতিক্রম করার সাধনাই তাকে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ করেছে। এই স্বভাবকে ডিঙোতে পেরেছে সে সুন্দরের প্রতি আসক্ত বলে।

তাই মনুষ্যত্বের সাধনা মানেই সুন্দরের সাধনা, শিল্পের সাধনা।

সৌন্দর্যের সংগে সভ্যতার যোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। রুচির উন্নত প্রকাশই সভ্যতা। রুচিবান কুৎসিতকে ভালবাসেন না, পরিহার করেন। শিল্পী কুৎসিতের মধ্যে সুন্দরকে আবিষ্কার করেন। অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বোদলেয়ারের 'এক শব' কবিতাটিকে নেওয়া যেতে পারে। গ্রীষ্ম দিনে পথপ্রান্তে পতিত যে গলিত জন্তুটিকে নিয়ে কবি কবিতা লিখেছিলেন

কাব্যে সেটি বীভৎস রসের জোগান দিতে পারত। অথচ কবির হাতে সেটি কী অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতিমা হয়েছে :

আর্দ্র নারীর ধরনে শূন্যে পা দুটি তোলা,
তাপে, ঘামে বিষকীর্ণ,
লজ্জাবিহীন, উদাসীনভাবে উদর খোলা,
বিকট বাষ্পে পূর্ণ।

প্রকৃতির দান এ-পূতিপুঞ্জে রাঁধবে বলে
রৌদ্ররশ্মি জ্বলছে,
ফিরে দেবে শত খণ্ডে, যা তিনি মহৎ বলে
মিলিয়েছিলেন গুচ্ছে ;

উত্তম শব আকাশ দেখছে দৃষ্টি মেলে,
ফুটলো ফুলের মতো,
এমন তীব্র গন্ধ, ভেবেছো হঠাৎ টলে
ঘাসে পড়ে যাবে না তো ?

ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি পচে-ওঠা গলা জঠর ছেয়ে ;
আর নামে, অবিরল,
ঘন, কালো স্রোতে সপ্রাণ, ছেঁড়া টুকরো বেয়ে
কৃমির সৈন্যদল।

আর এই সব ওঠে আর পড়ে ঢেউয়ের মতো,
কাঁপে আচমকা স্বননে ;
যেন সে-শরীর, শিথিল বায়ুতে নিশ্বসিত,
জীবিত পুনর্জননে।

সে এক জগৎ, অদ্ভুত সুর ঝরে তা থেকে
যেন জল গতিমন্ত,
কিংবা বাতাস, কিংবা কুলোয় ঘুরিয়ে ঝেঁকে
শস্য বাছার ছন্দ।

[অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু]

রুচিবাগিশের সুন্দরের সংগে শিল্পীর সুন্দরের পার্থক্য এইখানে। যে সুন্দর আছে, যা দৃশমান, উপস্থিত এবং বর্তমান রুচিবান তাকে ভালবাসেন কিন্তু শিল্পী আবিষ্কার করে তাকে ভালবাসেন, ভালবাসেন অনুপস্থিতকে, অদৃষ্টকে। যা নির্মিত তা নয়, যা নির্মাণযোগ্য তাই। নির্মিত যা তাতে ত আবিষ্কারের কিছু নেই, সেখানে ত কল্পনার ডানা মেলার ফাঁক নেই। তাই শিল্পীর জগৎ অপূর্ণকে পূর্ণ করার জগৎ। শিল্পী বলে : যেটা আছে সেটা আমি সৃষ্টি করতে পারি না, যেটা নেই সেটা আমি সৃষ্টি করতে পারি,—আমার কাছে সেটাই সুন্দর। আকাশের ঐ চাঁদ সুন্দর, তবু আমার মন তাকে সুন্দর বলে সুখী হতে পারে না। এই নদী আমার কাছে অসম্পূর্ণ সুন্দর ; এই পল্লবিত তরু, সবুজ ঘাস এই স্ফটিক পানির দীঘি আমার কাছে সুন্দরের একটা প্রতীক মাত্র। কারণ ওতে আমার মনের রঙ নেই।

শিল্পীর মনের এই জগৎ নগর। সেখানে বৃক্ষ তার আপন স্বভাব অনুযায়ী বাড়ে না, তাকে সৌখিন মানুষের মনোমত হয়ে বাড়তে হয়, নদীকে হতে হয় হ্রদ ; পাখীকে খাঁচায় বন্দী হয়ে গান করতে হয় আর মাছকে বিচরণ করতে হয় কাঁচের বাক্স ভরা পানিতে। আমরা বোদলেয়ারের আর একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না :

তরুলতা নয়—স্তম্ভশিলার সারি
নিভৃত সায়রে তন্দ্রায় রাখে শান্ত,
দর্পণে যার, যেন মহাকায় নারী,
আত্মালোকনে দানবীরা বিশ্রান্ত।

মায়াময় ঢেউ, অজানা পাথরে গড়া
স্তব্ধ সে-জলে পুঞ্জহিমের মতো,
যা-কিছু সেখানে ছায়ারূপে দেয় ধরা
তার উদ্ভাসে নিজেই মূর্ছাহত।

পরিস্থানের স্থপতি, আমার সাধ্য
গড়ে মাণিক্যে সুড়ঙ্গ স্বেচ্ছায়
যার তল দিয়ে-আমার আদেশে বাধ্য,

মহাসমুদ্র সম্যক বয়ে যায় ;
সূর্য তারার চিহ্ন দেখা না যায়
যদিও আকাশ দিগন্তে অবনত ;
ঐ মায়ালোক জ্বলে যার প্রতিভায়
সে অনল শুধু আমারই ব্যক্তিগত।

[প্যারিস-স্বপ্ন : অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু]

মানুষের এই ব্যক্তিগত জগৎ, আদেশে বাধ্য এই জগৎ, শৃঙ্খলায় নির্মিত এই জগৎ, নাগরিকের সুন্দর জগৎ।

কিন্তু এটা কি সুখের জগৎ? বন্যজীবন সুখের না নগর জীবন সুখের? নগর ত নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার জগৎ। সেখানে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ডিনারে আসতে হয় এবং পরিবেশের রুচি অনুযায়ী খাবার মুখে দিতে হয় সুশোভনভাবে। এটা কি সুখের জগৎ?

মানুষ কি সুখের জন্য সভ্যতাকে চেয়েছিল? আমাদের আদি পুরুষেরা, অরণ্যে বাস করতেন! তাঁরা সুখে ছিলেন। তাঁরা, প্রথমত, কারো ইচ্ছামতো চলতেন না। সেদিন তাঁরা সুখী ছিলেন, কিন্তু সভ্য ছিলেন না। সভ্যতা তাঁদের রীতির এবং পদ্ধতির শিকল পরালো, নিয়মের জালে আটকালো তাঁদের, নিয়ন্ত্রণের নাগপাশে জীবন থেকে তাঁদের সুখ অপহৃত হল চিরতরে। তাদের উত্তরপুরুষ আজকের সভ্য মানুষ কি নাগরিক?

মানুষ নিজেকে চিত্রের মত করতে গিয়ে বিবেকের ফ্রেমে এবং সৌন্দর্য-প্রীতির ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে। সৌন্দর্যের ফ্রেমে বাঁধানো ঐ সুন্দর প্রতি-কৃতিটি কি আধুনিক নাগরিক মানুষের প্রতিকৃতি?

কিন্তু কি করুণ বন্দী চেহারা তার!

মাহে-নও
মাঘ : ১৩৭৩
জানুয়ারী : ১৯৬৭

আধুনিক কবিতায় বিষাদ

['সন্তের সাহিত্য' নামে প্রবন্ধটি মাসিক পূবালীতে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটির নাম 'আধুনিক কবিতার বিষাদ'। কিন্তু কোন এক পত্রিকার সম্পাদক প্রবন্ধটি ছাপতে নিয়ে অমনোনীত ব'লে আমাকে ফেরৎ দেন এবং সেই পত্রিকায় 'আধুনিক কবিতার বিষাদ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। অগত্যা 'সন্তের সাহিত্য' নাম দিয়ে প্রবন্ধটি 'পূবালী'তে ছাপতে দিই।]

শিল্পীকে আমরা বড় বলব কি কারণে? তাঁর সৃষ্টির জন্য না তাঁর দৃষ্টির জন্য?

সৃষ্টি কোন কিছু করা হয়ত সম্ভব কিন্তু সে সৃষ্টির সংগে আলোক-প্লুত পূর্ণ দৃষ্টির যদি সংযোগ না ঘটে তবে তার কান্তিহীনতা অবিসম্বাদিত।

এই দেখা আত্মভোলা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। চতুর্দিকের ঘটনায় তার মন বিজড়িত নয় বলেই পার্শ্বস্থ আঘাতকে সে অতিক্রম করে যায় এবং তার ফলে তার আবিষ্কারের মধ্যে থেকে যায় অসম্পূর্ণতার অবগুণ্ঠন। অথচ এই পর্বে সৃষ্টি শিল্পগুণ বিয়োজিত।

কিন্তু দৃষ্টিমান শিল্পীর পক্ষে চতুর্দিকের সংস্থানকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর মন এবং চোখ উভয়ই যেহেতু সীমাক্রান্ত তাই চৈতন্যের সহযোগিতায় সে বস্তুকে নিরীক্ষণ করে। সে ততক্ষণ সুস্থ হয় না যতক্ষণ না তাঁর দেখা পূর্ণতার সুরা পান করতে পেরে উল্লসিত হয়। যেহেতু দেখার এই সর্বাধিক রূপ তার সৃষ্টিতে প্রকাশ পায় তাই তার দাক্ষিণ্যে অপর চোখ এবং মন অতৃপ্তির যন্ত্রণা ভোগ করে না। আনন্দিত চিত্তে বলে, "অপূর্ব"!

এই চৈতন্য সংক্রমিত অপরূপ সৃষ্টি শুধু একালের দান নয়। আর সত্যকে স্বীকার করলে হয়ত বলতে হয় সেই অপরূপতা জয় করার ক্ষমতা এ-কালের নেই। ঘটনার আক্রমণে মানুষের মন এমনভাবে অবকাশ হারিয়ে ফেলেছে যে ধৈর্যশীল মানসিক অবস্থায় বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। অথচ সৃষ্টি অবকাশ চায়, বিশেষ করে যা শিল্পকান্তিযুক্ত।

আধুনিক শিল্পীরা এই কান্তিসমন্বিত সৃষ্টির অন্বেষায় আর একবার অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সে আহরণ করতে চায় তার পূর্ব-পুরুষের সেই দৃষ্টিকে যা দিয়ে রচিত হয়েছে মহাকালগ্রাসী শিল্পের সুষমা। কিন্তু সকল আয়াসকে ভক্ষণ করে সময়ের চঞ্চল অবস্থা তাকে ব্যর্থতার গরল দান করে। গতিকে প্রাণপণ চেষ্টায় সে আর প্রতিরোধ করতে পারে না। তার চেতনাশ্রিত মন লক্ষ্য করে সে নিয়তির শিকার, তার শক্তি নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। অতএব প্রথম উচ্চকিত রৌদ্রবিকচ চিদাকাশ আবরিত হয় বিষাদে। এ-কালের সাহিত্যের একটি বিস্তীর্ণ অংশ এই বিষাদে আকীর্ণ।

প্রসঙ্গত এ-কথা অসঙ্গত যে বিষাদ শুধু এ-কালের সাহিত্য অথবা আধুনিক সাহিত্যের অবদান। আপন সজ্ঞানে মানুষ যখন নিজের পরিচয় জেনেছে তখন ক্ষমতার সীমা দেখে তার চোখে নেমেছে পরাজয়ের ম্লানিমা। আত্মপরিচয় তাকে যতখানি আনন্দ দিয়েছে, ততটা দিয়েছে দুঃখ। আনন্দ, কেননা জীবজগতে সে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ সে ; দুঃখ, কারণ জ্ঞান তাকে বলেছে সে স্বাধীন নয় সে দৈবাধীন।

বিজ্ঞানীর মতে মানুষ বানরের বংশধর হোক অথবা বিবর্তনের আইনের বশবর্তী প্রাকৃতিক কারণে জৈব পরিক্রমায় তার জীবনের উৎপত্তি হোক, ধর্মগ্রন্থকে আদি রচনা হিসেবে স্বীকার করলে দেখব দুঃখের অভিশাপ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। তার স্বর্গচ্যুতি তার সুখচ্যুতি। যেইমাত্র সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল গলাধঃকরণ করল অমনি সুখের শিরস্ত্রাণ খসে পড়ল তার মাথা থেকে। সতরাং তার জ্ঞানলাভ মানেই তার দুঃখলাভ। আর এই দুঃখবোধ যখনই তীব্র হয়েছে তখনই তার চোখের সৈকতে নেমেছে বিষাদের সন্ধ্যা।

অতএব বিষাদ শুধু এ-কালের নয়, নয় মধ্যকালের, সে পুরাকালেরও। অর্থাৎ মানুষের হাসি, অশ্রু, আনন্দ ইত্যাদি ভাবানুভাবের সংগে তার সত্তার উদয় প্রাথমিক। তাহলে বিষাদবাদ কেন শুধু ঊনবিংশ অথবা বিংশ শতাব্দীর ? মনে হয় তার অস্তিত্বের উপলব্ধি আবিষ্কৃতির চৈতন্যে এই প্রথম ধরা দিয়েছে।

যদিও দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে অথবা বোদলেয়ারের কবিতায় বিষাদ প্রাণময় চরিত্র অর্জন করেছে কিন্তু শিল্প-স্বীকৃতি পেয়েছে সে তারও পূর্বে।

আমাদের মধুরতম সংগীত আমাদের বিষাদতম চিন্তা—ঐ যুগল সাহিত্যিক-দের পূর্বসূরী কবির কথা। স্কাইলার্ক বোধাক্রান্ত মানুষ নয় তাই তার গান দুঃখহীন আর মানুষ জ্ঞানাক্রান্ত, বোধ তাকে বুঝিয়েছে সে দৈবাধীন, তাই তার গান আনন্দহীন। এই আনন্দহীনতাকে শিল্পী মাধুর্য দিয়ে আবৃত করলেন। দুঃখাধীন বিষয় হয়ে উঠল আনন্দের অভিব্যঞ্জক। বিষয় তার গরল কিন্তু ব্যঞ্জনা তার অমৃত। যেমন পাঁক পঙ্কজের জন্মদাত্রী। বোদ-লেয়ারের 'ল্য ফ্লর দ্যু মাল'ও সেই ক্লেদজ কুসুম, সেই পঙ্কজ, সেই গরলোৎ-শৃত অমৃত। বিষাদ পেল শিল্প-মহিমা।

আজকের যুগের বিষাদ-চৈতন্যের জন্য বোদলেয়ার অথবা দস্তয়েভ-স্কিকে দায়ী করলেও আমরা বলেছি এর উৎসৃতি বহু পূর্বের। যদি বলি মহাভারতের কর্ণ বিষাদময় তবে ভুল করবো কি? তিনি তাঁর মৃত্যুরক্ষক কবচ-কুণ্ডলকে দান করলেন অবহেলে। তাঁর জানা হয়ে গেছে যে মৃত্যু তাঁর জীবনে অমোঘ, নিয়তি তাঁর নিয়ামক। অতএব অর্থ নেই প্রতি-রোধের বাসনার। জন্মদাত্রী কুন্তির আমন্ত্রণ তিনি ফিরিয়ে দিলেন, স্বীকার করে নিলেন নৈরাশ্যকে, নিয়তিকে। 'জয়ী হোক, রাজা হোক, পাণ্ডব সন্তান/আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।' বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই বিষাদ-বন্দী নায়কের আবিষ্কর্তা নন, তার স্রষ্টা বেদব্যাস।

এই প্রসঙ্গে বিষাদের পরিজ্ঞাপক হিসেবে আরও একজন কবির নাম করব। তিনি ওমর খৈয়াম। অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানে তিনি পরিচয় পেয়েছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের। শুধু জ্ঞানী নন, বিজ্ঞানী তিনি, যৌক্তিক ধারণায় প্রাজ্ঞ। অতএব সীমার পরিমাণ তাঁর কাছে স্বাভাবিক। মানুষ যত সুচতুর হোক, জ্ঞানী হোক, শক্তিমান হোক, মৃত্যু কবলিত সে। কিন্তু মৃত্যু-চেতনায় তিনি বিষাদকে প্রশ্রয় দেন না। যদি জানিই যে মৃত্যু অবধারিত তবে আর দুঃখ কেন? তাই 'পান করে নও রাজা, যে কটা দিন এই জগতে জীবন আছে তাজা।' কিন্তু এ-কি সত্যিই বিপদকে অতিক্রম করা হল? আসলে যখনই তিনি নিয়তিকে মেনে নিয়েছেন, দূর-প্রসারিত দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত বিপুল শূন্য বিশ্বকে জিজ্ঞাসার অন্তরালে আশ্রয় দিয়েছেন তখন দুঃখের কৃপাণকে তিনি কি হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করেননি? এ সেই আত্মঘাতির উন্মাদ হাসি, 'বাহিরে যার হাসির ছটা' ভিতরে যার 'চোখের জল'। আক্রমণ মেঘের পাশে সূর্যের হাসি; কিন্তু তা ছায়া সংক্রমিত হাসি, তাই বিষাদের হাসি।

আমরা মৃত্যু অবধারিত জানি বলেই মৃত্যুকে হয়তো ভয় করি না। বলি, 'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়/ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়,' বলি, 'মরণে রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান!' বলি, 'প্রদীপ্ত স্বচ্ছ ও কৃষ্ণ আমাদের দিগন্তের শেষে সে যেন স্বনামধন্য ধর্মশালা।'

কিন্তু এ-সব বলেও জীবনের দিকে আমরা কেন লোভাতুর হাত বাড়াই? কেন তার মোহে পড়ে চিৎকার করি : 'জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ অরুণোদয় জয়।' কাকে তবে বেশী ভালবাসি আমরা? জীবনকে অথবা মৃত্যুকে? পরিত্রাণ নেই বলে মৃত্যুর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি কিন্তু ভালবাসি জীবনকে। এই প্রভেদটুকুকে জানলে আমরা বুঝবো মৃত্যুবোধে আমাদের আনন্দিত স্বীকৃতি বিষাদেরই অভিজ্ঞান। খৈয়াম একালের সেই জ্ঞানের সেই বোধির উদ্গাতা।

অবশ্য ধর্মপথে স্বজ্ঞানে এর উপলব্ধিকে প্রথম আহরণ করেন সিদ্ধার্থ। জীবন আনন্দের নয়, জীবন দুঃখের—এ-কথা বুদ্ধের। কিন্তু বোধি লাভ করার প্রাগপর্বে গৃহত্যাগী গৌতমের মনে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা বিষাদের। সমস্ত মানুষের অন্তর্বেদনা যে অন্তরে আশ্রয় পেয়েছে সুস্থ-চিত্ত হওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক। কামিনী-কাঞ্চন রাজত্ব-সিংহাসন তার কে? বিশ্বমানবের বেদনাকে সে পান করেছে। জীবের দুঃখ মোচনের জন্যে মানবিক দায়িত্বের হলাহল দিয়ে কণ্ঠ ভিজিয়েছে যে আনন্দ তার সংগী নয়। ওমর কিন্তু এই আত্মনিগ্রহের ফাঁসীতে ঝুলতে নারাজ। জীবনকে তিনি আত্মনিগ্রহে নন, উপভোগের মধ্য দিয়ে, কাটিয়ে দিতে বলেছেন। দুঃখের হাত থেকে মানুষের যখন পরিত্রাণ নেই তখন তাকে স্বাভাবিক ভেবে আনন্দ পাব না কেন? কিন্তু মানুষ আনন্দ পেতে চাইলেই কি আনন্দ পায়? এ্যারিস্টটল বলেছেন, সুখের জন্যে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। ঐশ্বর্য, স্বাস্থ্য ও ভাল বন্ধু। এই তিনের সম্মিলিত প্রভাব যদি কোনো মানুষের জীবনে থাকে তবে সেই সুখী হতে পারবে। কিন্তু ঐ তিনের সম্মিলিত সহযোগিতা ক'জনের জীবনে সম্ভব। বিশেষ করে যে ব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিক তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব কিনা।

এই বোধিই এ-কালের শিল্পীরও। তার পিতা, মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী কিছুই নেই, দেশ তার দ্রাঘিমাহীন এবং বন্ধু শব্দের অর্থ তার কাছে

অজ্ঞাত। সেই একই জ্ঞান, একই বোধ, একই চৈতন্য। শুধু একার বেদনা নয়, নয় দৈহিক ক্ষুধাসঞ্জাত দুঃখ বিচ্ছুরিত বেদনা।

সংক্রামক ব্যাধির মত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুঃখ মানুষের বিশ্রামের শয্যাকে অপহরণ করে নিয়েছে। মানুষের অভ্রংলেহী জ্ঞানের সংগে সংগে আত্মোদরপূর্তির বাসনা হয়েছে গগনস্পর্শী। চিরঞ্জীব লোভ-দানব মাথা ঝাঁকিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে প্রেমানুশাসনের বন্ধন। পশু প্রবৃত্তির এই দাপটে জ্ঞানীর পশ্চাদপসারণের ফলশ্রুতি কি এই হতাশা? না। জ্ঞানী জানে স্বভাবের আদি মূলে মানুষ পশুর সমশ্রেণী। নিয়তির অনুগ্রহে তার আশীর্বাদ সে পেতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জনে সে আশীর্বাদ কাজে লাগাতে পারে না সবাই।

বুদ্ধ, যীশু, মুহম্মদ সবাই এসেছেন, আসলে পাপ নয়, উদ্ধার করতে হিংসা থেকে, জিঘাংসা থেকে, উত্তীর্ণ করতে প্রেমে, মানবতায়। কিন্তু মানুষের ইতিহাস থেকে অপসৃত হলো না তবু জৈব তৃষ্ণা, জৈব ঈর্ষা। তাহলে এর বহিষ্কৃতি কি সম্ভব? সুতরাং বুদ্ধের বিষাদের সংগে এক হয়েও এ পার্থক্য আরও তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বিদ্ধ। বুদ্ধ গৃহত্যাগী হয়েছিলেন বোধি লাভের জন্য মানুষের মুক্তি কামনায়। গৃহত্যাগ সম্ভব নয় এ-যুগের লোকের। গৃহবেষ্টিত হয়ে ভাবতে হবে গৃহবন্দী মানুষের দুঃখের কথা। আর তাতো শুধু জ্বরা, ব্যাধি থেকে মুক্তি নয়, সকল প্রকার দুর্ব্যবস্থা থেকে মুক্তি এবং তা শুধু স্বদেশ, স্বভূমির নয়, বিশ্বভূমির, বিশ্বব্যবস্থার।

এ-যুগের মানুষ এই বিশ্ব-বেদনায় বন্দী। এবং সে বাঁধন এমনই দুশ্ছেদ্য যে আগামীর দিকে দৃষ্টি-প্রসারিত করে অব্যাহতি নেই তার ঊর্ণ-তন্তু থেকে। কেননা প্রাগ বৌদ্ধ ধর্মে দুঃখবাদ প্রশ্রয় পেলেও দুঃখমুক্তির উপায়ও সেখানে নির্ধারিত। পরিপূর্ণ দুঃখ যখন জ্ঞানের কিরণে উদ্ভাসিত, চিরন্তনতার দাবী নিয়ে সে যখন উপস্থিত, তখন অনন্ত দুঃখের স্থান কোথায়? মৃত্যুকে জানতে পারায় মৃত্যু যেমন আনন্দে উত্তীর্ণ করলো তেমনি সেখানেও দুঃখ দিল আনন্দের স্বাদ। অতএব দুঃখবোধ থাকলেও দুঃখ হরণের উপায়ও মুক্তির পথ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ-কালের মানুষের পক্ষে এই বোধে সুস্থ থাকা যেন অসম্ভব। যদি জীবনকে স্বীকার করতে হয় তবে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অস্বীকার করা সম্ভব কি? বুদ্ধ যে

শান্তির উপায় নির্ধারণ করলেন সে তো ব্যক্তির শান্তি ; একক অনুভূতির অথবা প্রাতিস্বিক জ্ঞানের ফলশ্রুতি। সে জ্ঞান এবং সে চৈতন্য সকল মানুষের আয়ত্তাধীন নিশ্চয় নয়। কারণ প্রাকৃতিক কারণে হোক কিংবা দৈব নিয়মেই হোক শান্তির অনুগ্রহ পার্থিব মানুষের ললাটে সমপরিমাণে লাভ হয় না। এবং এমন কি মানুষের মধ্যে যে মানুষ সর্বাপেক্ষা শক্তিমান তারও পক্ষে সম্ভব নয় ঐকিক শক্তিতে স্বেচ্ছার প্রার্থনা পূর্ণ করা। সহযোগিতার, সাহায্যের এবং নির্ভরের প্রশ্ন যেখানে সেখানে স্বাধীনতার স্বাধীকার কোথায় ? সুতরাং একমাত্র মৃত্যু ছাড়া মুক্তির অন্য পন্থা নিরর্থক।

উপরোক্ত চিন্তা কি শুধুমাত্র দুস্থ পীড়িত মানুষের ? সাহিত্যে, ব্যাধি, দারিদ্র্য ,শোক এবং সন্তাপ একমাত্র উপচার নয়, সেখানে আনন্দ, হর্ষ, বীরত্ব এবং জয়েরও উপকরণ বর্তমান। হয়তো সাহিত্যিকের স্বাস্থ্য এবং প্রকৃতির উপর এই পরিবেশনা নির্ভরশীল। তাই আর্তরোগীর শয্যার পাশেই আমরা শিশুর অনিরুদ্ধ হাসির নির্ঝর উপভোগ করি। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হয় এই অশোক সাহিত্য স্বাস্থ্যবান ধনী লেখকের সৃষ্টি। জীবনে অর্থের, স্বাস্থ্যের এবং বন্ধুর অভাব ঘটেনি বলেই ব্যর্থতার অথবা নৈরাশ্যের আলিঙ্গনে ধরা পড়েননি তাঁরা। 'এ দ্যুলোক মধুময়' যে তারা বলতে পেরেছেন সে কেবল জীবনের মাধুর্যময় দিকটি তাঁদের ভাগ্যের অনুকূলে ছিল বলেই। কিন্তু এই কি পূর্ণ সত্য ? স্বাস্থ্যবান এবং ঐশ্বর্যে লালিত মানুষ কি দুঃখ বর্জিত ? কথাটির বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আমাদের পূর্ব কথায় ফিরে যেতে হয়।

সিদ্ধার্থ রাজকুমার। অর্থ, ঐশ্বর্য, সম্মান, প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। অথচ তিনি গৃহত্যাগী হলেন। আর তিনি ঈশ্বরানুসন্ধানে গৃহত্যাগ করেননি। কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসীর দুঃখ কৃত্রিম। ঠিক এই জন্যেই আমরা এখানে বলে নিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে বিষাদের আমরা সাক্ষাৎ পাই তা সন্তের বিষাদ নয় সে দেবতার বিষাদ। তাঁর দুঃখবোধ থাকলেও তা অস্থায়ী, পরিসমাপ্তি আছে সে দুঃখের। দুঃখ সেখানে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। ঈশ্বর তাঁর ইহ-পরকালের, জীবন-মরণের, সুখ-দুঃখের নিয়ামক। বরং সুখে নয় দুঃখের দিনে ঈশ্বর তাঁর সান্নিধ্য দান করেন। আর দুঃখের আগমনে যদি ঈশ্বরেরই আবির্ভাব হল তবে তো সে দুঃখ

সুখের অধিক। এই পার্থক্যটুকু বুঝতে পারলে আমরা প্রকৃত বিষাদ-বাদী সাহিত্যের চরিত্র অনুধাবন করতে সক্ষম হব।

প্রসঙ্গত দুঃখ এবং বিষাদ কি সমার্থক? দুঃখ থেকে বিষাদের উৎপত্তি স্বাভাবিক; কিন্তু দুঃখী মাত্রই কি বিষাদময়? অজ্ঞ, স্থূলানুভূতি-সম্পন্ন মানুষের দুঃখ, প্রাজ্ঞ সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন মানুষের দুঃখের সমানুপাতিক নিশ্চয় নয়। উপলব্ধির তীব্রতা এবং জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে দুঃখবোধের পরিমাণ সম্পৃক্ত। দুঃখকে বুঝে অবশ্য দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। যদি আমরা জানি জরা, ব্যাধি, বার্ধক্য জীবপ্রকৃতিতে স্বাভাবিক-ভাবেই বর্তমান এবং জন্ম-মৃত্যু, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, জিঘাংসা-জুগুপ্সা প্রাণীজগতে অবিচ্ছেদ্য; আমাদের ইতিহাস, আমাদের পুরাণ, আমাদের ধর্মকাহিনী তার অক্লান্ত প্রমাণ, তবে দুঃখকে অপরিবর্তিত প্রাকৃতিক কারণ হিসাবে উপেক্ষা করলে ক্ষতি কি। কিন্তু এ একেবারে ঊর্ধ্ব চেতনার কথা। মানুষের জৈবতাকে বিনাশ করতে পারলেই এ সম্ভব। যদি কোন-ক্রমে আমাদের স্পৃহার ধ্বংস সাধন করতে পারি তবেই দুঃখের সঙ্গে আমাদের চির কালীন বিচ্ছেদ রচনা করতে পারব। কিন্তু এ-কথাও একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে জীবধর্মের স্বাভাবিকতাকে নিরস্ত করার অর্থ জীবনের বিলোপ যাণ্ডা করা। লোভ আমাদের দুঃখের কারণ সত্য কিন্তু সৃষ্টিকাহিনীর রহস্যও তারই সঙ্গে বিজড়িত। যা আমার পাপ তাই আমার জীবন। আমি কামের আজ্ঞাবহ, বিপরীত প্রকৃতির প্রতি সেই আমাকে আকর্ষিত করছে, সেই আমাকে দায়িত্বশীল করছে আর সেই আমাকে দুঃখ দিচ্ছে। আমি তাকে প্রতিরোধ করতে পারলে আমি হয়ত দুঃখকে প্রতিরোধ করব, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আমার লোভকে প্রতিহত করতে পারব, পাপের বন্য ঔদ্ধত্যকে নিবারণ করতে সক্ষম হব, কিন্তু সেই সঙ্গে কি আমি বিশ্বধর্মের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হব না? নিহত করব না বিশ্বপ্রকৃতির মৌন আকাঙ্ক্ষাকে? প্রাণীসত্তার বিরুদ্ধে জীবনের বিরুদ্ধে আমার এই শক্তি ত মৃত্যুরই আমন্ত্রণ সাধন। এ আমার পাপ নয়! তবে কি? মানুষ আমি, লোভকে দমন করাই আমার মনুষ্যত্ব। অথচ লোভ আমার জীবনের উদ-গাতা। এই দ্বন্দ্ব চৈতন্যে সংক্রামিত হলে দুঃখ শুধু সাধারণ অর্থের মধ্যে আবদ্ধ রইল না; তা এমন এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হল যেখানে প্রশ্ন আছে কিন্তু উত্তর নেই। এই নিরুত্তর অবাক অবস্থাই কি বিষাদ?

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক কবি বলেছেন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ত মনুষ্যত্ব। যা কিছু স্বাভাবিক তার বিপরীতেই মানুষের যাত্রা। কেননা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণই মানবিকতা। কিন্তু এ-চিন্তা কি বাস্তবিকই ঊনবিংশ শতাব্দীর? যাঁরা সংসারকে মায়া বলেছেন, ক্ষুধাকে জয় করে যাঁরা দেহকে উপবাসসহিষ্ণু করেছেন, কামকে দমন করতে যাঁরা ব্রহ্মচর্যের শাসন মেনেছেন তাঁরাও কি এই প্রকৃতিরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি? কিন্তু একি মনুষ্যত্বের জন্য সংগ্রাম না দৈবত্ব অথবা ঈশ্বরত্বের জন্য? আসলে মানুষ এমন এক পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হতে চায় যেটা তার চাওয়ার শেষ-সীমা। জানি না মানুষ স্বর্গকেই এ-জীবনে পেতে চায় কিনা। হয়ত তাই। এবং এই জাগ্রত বাসনা মানুষের মনে এত প্রবল যে কঠোর ধার্মিক হিসেবে নিজেকে যে প্রতিপন্ন করতে চায় তারও পক্ষে পাপ থেকে আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে, হয়ত সম্ভবও হয় না। তবু অগাধ ধর্মবিশ্বাসী যাঁরা, পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁরা সুনিশ্চিত, তাঁরা ঈশ্বরের ক্ষমায় আস্থা রাখেন বলে তাঁর পক্ষে অপরাধ স্বীকৃতির পর বিধাতার করুণা লাভের আশা আছে, সান্ত্বনা আছে। কিন্তু দুর্দশাকে যাঁরা ঈশ্বরের করুণা বলে ভাবতে পারেন না অথবা নিয়তির কাছ থেকে যাঁরা পেয়েছেন কঠোর অকরুণা, অথচ আবার যারা ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ না হলেও অন্ধ এক শক্তি মনে করে তার প্রতি উদাসীন, তাঁদের সান্ত্বনা কোথায়?

প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরজাত স্বপ্নের মধ্যে আছে অমরতার এষণা। অথচ মৃত্যু অমোঘ। আমরা যারা কেউ কেউ মরণবন্ধুর আলিঙ্গনের স্বপ্ন দেখি তারা সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করে মরণ-মিলনের সময়কে ত্বরান্বিত করি না। বরং প্রতিটি মুহূর্তে কোন-না-কোন উপায়ে বেঁচে থাকার অনুকূল অবস্থাকে জয় করতে চেষ্টা করি। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত পশ্বাচারে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাঁকে বাঁচতে হবে কিন্তু স্বভাবের প্রতিদিগন্তে। আরও বলি, ঐ যে মানুষের ইচ্ছা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়া, তা তো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। মানুষের এই রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার মধ্যে প্রকৃতির অব্যাহত অধিকার ধ্বংসহীন। বোধ হয় পৃথিবীর জীবনরক্ষায় সে এমন এক নিয়মের অধীন যা দিয়ে সৃষ্টির অনুকূল ক্রিয়াকে সে জীবের মধ্যে সম্পাদন করবে। আর সে সমস্ত হল জৈবিক ক্ষুধা অথবা তৃষ্ণা। যার থেকে লোভ কিম্বা লালসার উৎপত্তি। জ্ঞানীর জিজ্ঞাস্য, এ কি পাপ?

১৫—

২

আমার উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও হয়তো পুনরুক্তির ত্রুটি লক্ষ্য করা যাবে কিন্তু বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা পুনরুচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য এ পুনরুচ্চার সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে সংযোজিত।

আমরা এখন দেখতে পারি যে প্রবন্ধের মূল বিষয় থেকে আমরা কতদূর সরে এসেছি। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এ-কালের সাহিত্যে বিষাদ আর তার দ্রাঘিমা। এ কি কেবল ব্যক্তির বেদনাজাত অথবা নৈর্ব্যক্তিক দুঃখ-জাত? সুখের মধ্যে সংস্থাপিত ব্যক্তির বিষাদ অথবা দুঃখীর বিষাদ এ? কিম্বা সুখ-দুঃখের বৃত্তাতীত মানুষের স্বভাবজাত বিষাদ? কি? একি মানুষের ইতিহাসের দান অথবা সভ্যতা কিম্বা ক্রমপরিশীলিত জ্ঞান এবং ক্রমপরিণত অভিজ্ঞতার দান? কোনটি? যে মানুষ অনেক কিছুই করতে চেয়েছিল কিন্তু আয়ু-পরিক্রমের পথে একটি আশাও যার সাফল্যের মুখ দেখেনি সেই কি বিষাদগ্রস্ত?

অনেক অতি-আশাবাদী মানুষের মুখে বিষণ্নতার আলো নেমে আসে। একটা কিছু বড় দায়িত্ব, একটা কিছু কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একমন, এক-প্রাণ মানুষ হয়তো হাসতে ভুলে যায়। নেপোলিয়নের জীবনীকার বলেছেন, 'এ বালককে হাসতে দেখেছি এমন কথা আমাদের কেউ বলতে পারবে না।' কোন এক দুরাশ্রিত মনের সঙ্গে কি তাঁর হাসির অন্তর্ধান ঘটেছিল?

আমরা, আমাদের এ-যুগের লোকরা বিষাদবন্দী, কি শুধু তেমনি স্বপ্ন-দুষ্টে? না আমরা স্বপ্নপরাভূত সব।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম দিকে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে বিষাদ শুধু এ যুগ, এ শতাব্দী অথবা এ-কালের নয় এ সর্বকালের আশাহত মানুষের কিম্বা দুঃখী মানুষের। তবু এবার বলব যে একালে এসে এর রূপটি যেমন তীব্রভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে এমন আর কোন কালে হয়নি। মানুষের আকাঙ্ক্ষারই যেন বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এ-শতাব্দীতে। লোভ-লালসা, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই সীমা অতিক্রম করেছে। পর পর দুটি মহাযুদ্ধের অকরুণ ফলশ্রুতি মানুষের সুস্থতার উৎসকে নিয়েছে শোষণ করে। সহজভাবে সাধারণভাবে ভাববার মত মানসিক স্থৈর্য লুপ্ত হয়েছে সবার। ফাঁকি, কপটতা আর স্বার্থপরতার মাঝখানে সত্যপ্রকৃতির মানুষের মধ্যেও জন্ম নিয়েছে সন্দেহ। মানুষ ভাল-

বাসতে গিয়ে প্রবঞ্চনা করছে, রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হত্যা করছে, জৈব আনন্দে আত্মপ্রসাদ পেতে চেয়ে নির্মাণ করছে নরকের নিরানন্দ অথচ আপনাকে নিরস্ত করবার, ফিরবার কিম্বা অন্যকে ফেরাবার কোন সুষ্ঠু পথ তার সম্মুখে নেই। হয়ত এই উপলব্ধিতে জীবনানন্দ লিখেছিলেন :

ভালবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাইবোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে।

এই যে বাঁচাতে গিয়ে হত্যা করা এর কারণ কি 'এ-যুগে কোথাও কোন আলো—কোন কান্তিময় আলো/চোখের সমুখে নেই যাত্রিকের।' বলে ? মনে হয় মানুষের সন্তুষ্টির পূর্বরূপটি পট-পরিবর্তন করেছে। মানুষ বর্তমানে নগরাভিমুখী। সমস্ত দেশের ঐশ্বর্যকে শোষণ করার ফলে নগরগুলোর যে রক্তোজ্জ্বল রূপটি মানুষের চোখে উদ্ভাসিত তার আকর্ষণ এড়িয়ে চলার ক্ষমতাই নেই মানুষের। ফলে সামান্যে সন্তুষ্ট হওয়া মানুষের পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এদিকে বংশবৃদ্ধি, ভূমির অনুর্বরতা এবং স্বল্পতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, চালকের নৃশংসতা ও পালকের উদাসীনতা এদেরই সৌহার্দ্যে যে গোপন রোগ বীজাকারে ছড়িয়ে পড়েছিল তার উদর বিদীর্ণ হয়ে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে।

আবার বলি এ যুগের প্রাণস্পন্দিত হৃৎপিণ্ডটি নগর। অথচ এই নগরের মানুষের মধ্যে আত্মরক্ষার উপায় হরণের যে দারুণ পিপাসা বর্তমান তা নিয়ে কল্যাণকর রাখীবন্ধনে উত্তীর্ণ হওয়া যেন প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু কোন কোন মানুষ এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় ; নিঃশ্বাস নিতে চায় এমন এক বাতাসের যার মধ্যে পেট্রোল আর কেরোসিন, এঞ্জিনোদ্গীরিত ধোঁয়া আর যক্ষ্মাকাশ-পরিপ্লুত ধুলোর বৈনাশিক ক্ষমতা নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ পানের রসে কুশ্রী দাঁতের অট্টহাসিতে নগরকে যারা আলিঙ্গন করছে, রাত্রি বারোটার অন্ধকার যাদের গাড়ীর হর্ণের আওয়াজে কেঁপে কেঁপে সরে যায়, এদেরই মণ্ড এড়িয়ে কয়েকজন মানুষ শব্দহীন কোমল অন্ধকার অথবা তীব্র বৈদ্যুতিক আলোর তৃষ্ণার পারে একটি মেঘহীন জ্যোৎস্নার আলো সন্ধান করে। এঁদেরই রচিত সাহিত্য বিষাদ। এবং

কারো কারো কাছে এঁরা পলাতক এই জন্যে যে, যে-বর্তমান সভ্যতাকে জীবন দিয়েছে বিজ্ঞান এঁরা তাকে অস্বীকার করতে চান। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মানুষের মঙ্গলের নিয়ামক বিজ্ঞানকেই এঁদের দলেরই মানুষেরা একদিন আবিষ্কার করেছিলেন। অথচ নিয়তি বিবর্তনের ইতিহাসকে কেমন করে পরিবর্তন করে !

আমরা এতক্ষণ যা বলেছি তার পরিশেষে আরও কয়েকটি কথা সংযোজন করে এ প্রবন্ধের উপসংহারে আসতে পারি। আধুনিক জগতে ক্রন্দনটা কার ? ব্যক্তির না বিশ্বব্যক্তির ? আমরা পূর্বে বলেছি সন্তের এই সাহিত্যে ক্রন্দন বিশ্বচেতনাময় ব্যক্তির। কিন্তু দেবতার সাহিত্যে কি এই ক্রন্দন ছিল না ? ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন :

> ওগো তোমার জগৎবাসী
> তোমাদের আছে বরষ বরষ
> দরশ পরশবাসি
> আমার কেবল একটি নিমেষ
> তারি তরে ধেয়ে আসি।

কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> দুঃখেরে দেখেছি নিত্য পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
> অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে।

তাঁর চেতনা ব্যক্তির ঊর্ধ্বে কি সংস্থাপিত নয় ? যদি প্রশ্ন থাকে দুঃস্থের চেতনা এবং সুস্থের চেতনা সমার্থক নয়। যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অসুস্থ রোগনির্ভর ; অতএব তাদের কথা মানেই সমস্তের কথা ; তা'হলে আবারও প্রশ্ন হবে, সুস্থ বলতে আমরা কি বুঝি ? প্রকৃত সুস্থতা কি ? যে ব্যক্তির 'বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিল ; প্রেম ছিলো, আশা ছিলো' সেও 'জ্যোৎস্না'য় ভূত দেখল। কেন ? কিসের জন্যে তার এই শান্তির মধ্যে অশান্তি ? কিসের ভয় এ ? একি তার অমরতার স্বপ্ননাশের ?

দর্পণে বিম্বিত মানুষের আত্মপ্রতিকৃতির মত মানুষের ভাগ্যাবশেষও একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষের নিজের চোখে। মৃত্যুর অন্তরে গতি

তার। দেবতা সাহিত্যিক বলেন 'স্বর্গ কি হবেনা কেনা/বিশ্বের ভাণ্ডারী সুধিবে না/এত ঋণ! নিদারুণ দুঃখরাতে/মৃত্যুঘাতে/মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা/তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?'

কিন্তু সন্তের অন্তরে এই বিশ্বাস যেন কিছুতেই ঠাঁই নিতে পারে না। দৃষ্টিটা কি তাঁর অত্যন্ত বাস্তব বলে?

পূবালী
১৯৬৩

সাহিত্যে উপচিকীর্ষা

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? সে কি উপচিকীর্ষা অথবা শিল্প-সৃষ্টি? লেখক কিসের তাগিদে লেখেন? মানুষিক তাগিদে না মানসিক তাগিদে? তিনি কি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখেন অথবা তাঁর অন্তরে যে অব্যক্ত অপ্রকাশ্য কথা তার তাগিদে লেখেন? লেখকের মন তাঁকে লিখতে বাধ্য করায়? না তাঁর সমাজ, তার পরিবেশ? সমাজে লেখকের ভূমিকা সেবকের, না রূপস্রষ্টার?

রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি নিয়ে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হই। কবিতাটিতে একটি অপার্থিব নগ্ন নারী-মূর্তির বর্ণনা করা হয়েছে—'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' যার পদে 'তপস্যার ফল' উপঢৌকন দেয় এবং যার অবলোকনে 'ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল' হয়ে ওঠে। আমাদের পার্থিব রমণীর সঙ্গে এ রমণীর সাদৃশ্য আছে কি? নিশ্চয় আছে। রবীন্দ্রনাথ অদৃশ্যকে আকার দিয়েছেন। কি ভাবে আকারে এনেছেন তাকে? সে কি গোচরীভূত সৌন্দর্যের অবয়ব দেখে নয়? অর্থাৎ সে রমণী অপার্থিব নয়, সে রমণী পার্থিব। কিন্তু বলা যেতে পারে, সে সাধারণ নয়, সে অনিন্দ্য, অসাধারণ। এই মানুষীর রূপ দেখেই ত আমরা দেবীর রূপ কল্পনা করি। যৌবন কি চঞ্চল হত যদি তার গোচরে এই পৃথিবীর মেয়ে না থাকত?

কিন্তু এ আলোচনায় আমাদের বক্তব্যের কি সুফল হল? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যের বন্দনা করেছেন, তাতে পার্থিব কোন লাভটা হল? অর্থাৎ সেটা আমাদের সংসারের কোন কাজে লাগল? শিল্পী কি সংসারের কাজে লাগার জন্য সৃষ্টি করেন? তাঁর সৃষ্টি কার উদ্দেশে? মানুষের কি? মানুষ কি চায়? মানুষ কি সুন্দরকে চায় না?

অর্থাৎ ক্ষুধা নিবারণের বাইরে মানুষের অন্য একটি উদ্দেশ্য আছে। সেই মানবিক উদ্দেশ্যটা সৌন্দর্যের সাধনা। মানুষ সভ্য হয়েছে ত কেবল সৌন্দর্যের সাধনা করে। প্রকৃতি যে অবস্থায় তাকে সৃষ্টি করেছিল, সে যদি সে অবস্থায় থেকে খুশি হয়ে যেত, তাহলে তার মানবিক গুণের প্রকাশ

ঘটত কি করে? যেদিন সে সৌন্দর্য্যকে ভালবাসল, সেদিন থেকেই তার আদিম অবস্থার খোলস বদলাতে শুরু হল। তার আশ-পাশের অন্যান্য জীব-জানোয়ার থেকে তার চেহারার পরিবর্তন ঘটল, সে নিজেকে চিহ্নিত করল মানুষ বলে? সৌন্দর্য্যের সাধনা এই মনুষ্যত্বের সাধনা।

কিন্তু এতে আমাদের মূল বক্তব্যে পেঁছান গেল কি? এই কথা-গুলো আসলে আমরা কি কারণে বলছি?

আমাদের দেশে বর্তমানে দু'-শ্রেণীর পাঠক আছেন। এক ধরনের পাঠক বলেন, আমরা ফল চাই ; অন্য শ্রেণীর পাঠক বলেন, আমরা ফুল চাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আবার দু'টি দল আছেন। একদল বলেন, শুধু ফুল চাই, সুন্দর হলেই হল, গন্ধ থাক বা না থাক। অন্যদল বলেন, রূপও চাই, গন্ধও চাই।

আমার মনে হয়, বড় লেখকদের সেইটাই গুণ। যারা ফুলের জন্যে আসে তাদেরও যেমন তাঁরা সন্তুষ্ট করতে পারেন, যারা ফলের জন্যে আসে তাদেরও তেমনি তাঁরা সন্তুষ্ট করতে পারেন।

মোটের উপর, উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন শিল্প নেই, কোন সাহিত্য নেই। শিল্পের জন্যে যে শিল্প সেও কি উদ্দেশ্যবিরহিত? রবীন্দ্রনাথের ঐ 'উর্বশী' কবিতার কথা ধরা যাক। ওটা শিল্পের জন্যেই শিল্প। ময়ূরপুচ্ছের মত ওটা সংসারের অথবা বিষয়-বিত্তভোগীর কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু ওটা কি মানুষের আদৌ কাজে লাগবে না?

এবার আমরা একটু পিছনে ফিরে আসি। অর্থাৎ যেখানে আমরা বলছিলাম যে, দেহের ক্ষুৎপিপাসার বাইরে মানুষের অন্য এক পিপাসা আছে। আত্মা অথবা মনের সেই পিপাসায় মানুষ যাকে ভোগ করতে চায়, তা হল আনন্দ। আনন্দের সে উপাদান কি? অবয়ব অথবা নিরবয়ব?

নিরবয়ব ত বটেই, কেননা আনন্দের তো কোন বাস্তবিক রূপ নেই। এমনকি মনের মধ্যেও আমরা তাকে কোন শরীর হিসেবে দেখতে পাই না। এই যাথার্থ্যহীনতা ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর নির্ভরশীল।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পাঠক সাহিত্য পড়েন আনন্দের জন্যে। কিন্তু হঠাৎ তারা কেন তার মধ্যে ব্যক্তিমতের আদর্শ খোঁজেন, নীতি খোঁজেন ; কেউ সমাজ, কেউ রাজনীতি, কেউ দর্শন খোঁজেন? সাহিত্য

কি পরোপকারের জন্যে? কল্যাণের জন্যে, হিতের জন্যে, মঙ্গলের জন্যে? উপকার কাকে বলে? হিত কি? মঙ্গল কি? আমাদের দেশে অথবা আমাদের সমাজে যে দারিদ্র্য আছে, যে নির্বিচার আছে, যে অসুখ আছে, সে সবকে নিঃশেষ করাই কি সাহিত্যের দায়িত্ব? দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে তো রাজনীতি আছে অথবা রাজনীতিবিদরা আছেন, নির্বিচারের জন্যে আদালত আছে; অসুখের জন্য ত আছে ডাক্তার। তবে সাহিত্যিককে তাড়া কেন?

একটা কথা, আদিকাল থেকে মানুষ মানুষের দুঃখ মোচনের জন্যে অন্তহীন চেষ্টা করেছে। শাক্যসিংহ, যীশু, মুহম্মদ প্রাণ উৎসর্গ করেছেন মানুষের দুঃখ লাঘবের জন্যে: করেছেন মার্কস, লেনিন এঁরা। কিন্তু সত্যিই কি সে দুঃখ মানুষের আত্মা থেকে নির্বাসিত হয়েছে?

আত্মা থেকে সে নির্বাসিত হয়নি, তবু মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। সে জানে দুঃখ অপহারক কোন অস্ত্র, কোন আয়ুধ সে আবিষ্কার করতে পারবে না। কিন্তু সে যে আছে, তারই প্রমাণ হিসেবে তার চেষ্টা অনিবার হবে। কিন্তু এর জন্যে কি লেখকদের দায়টা বেশী? এবং লেখক কোন অস্ত্রের সাহায্য নেন সে দুঃখ নিবারণের জন্যে? সে কি আনন্দ প্রদানের? আনন্দ কাকে ভালবেসে রূপ পায়? সে কি সৌন্দর্য্য নয়?

অসত্য নয়, প্রতিটি লেখক এই পৃথিবীর সন্তান। তার খাদ্যে, তার আবহাওয়ায় সে পুষ্ট; যেহেতু সে মানুষের সন্তান, সুতরাং মানুষের কর্তব্য এবং অকর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ। একজন কবিকে যখন আমরা লিখতে দেখি:

যাদের কথায় জগৎ আলো
বোবা আজকে তারা
মুখে তুবড়ি ছোটে তাদের
আকাট মূর্খ যারা।

[মেষতন্ত্র: শামসুর রাহমান]

তখন বুঝতে বাকী থাকে না যে, আমাদের সমাজের পাঁচজন চিন্তাশীল লোকের মন এই লেখকের মাথায় ক্রিয়ারত। অর্থাৎ ঐ পাঁচজন লোক মনে মনে যে লাভকে আশা করেন, কবিও তাই করেন। জিজ্ঞাসা করি, পরোপকারের মনোবাঞ্ছা নিয়ে কি কবি এ কাজ করেছেন? আর—

যখন প্রেমিক প্রেমিকার উন্মোচিত স্তনে মুখ রেখে ভোলে শোক,
ঠোঁটের উত্তপ্ত তটে থরথর জীবনের দিক
ঝরে পড়া সারেঙ্গের মতো খোঁজে গণিকার চোখ
যখন কাজল দীপ্ত ক্লান্তির আড়ালে নগরের
অন্টতম নাগরের আলিঙ্গনে, জেগে থেকে জন্বলি
স্বর্গবাসী স্বপ্নের চিন্তায় দ্বন্দ্ব ক্ষুব্ধ টেবিলের
নিষ্কম্প আলোর দিকে দৃষ্টি মেলে। নিজেকে কেবলি
ছেড়ে দিই শুভ্রতম জীবনের বিস্তীর্ণ অতলে।
নিখাদ বিশ্বাস নিয়ে নিবীজ মাটির রুক্ষতাকে
সাজাই সরেস ফুলে, আমার ঝর্ণার স্নিগ্ধ জলে
মরুভূমি আর্দ্র হয়, শুকনো মৃত কাঠ হয় বীণা
এবং কর্দমে জেগে ওঠে এমন প্রতিমা
যাকে ত্রিলোকে দ্যাখেনি কেউ।

[মূল্যের উপমা : শামসুর রাহমান]

তখন এই কবিতাটির ভিতরে কি উপচিকীর্ষু কোন ব্যক্তির মন আছে বলে ভাবতে পারি? কবিতাটি বড় ব্যক্তিক, কিন্তু সে শুধু সাধারণ মানুষটির কাছে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের কাছে তিনি তো কেবল একজন ব্যক্তি নন। অর্থাৎ নিবীজ মাটির রুক্ষতাকে যিনি 'সরেস ফুলে' সাজান, তিনি কি সমাজের অধিবাসীদের প্রতি উদাসীন?

কবির যে মনটি মানুষকে সুন্দরের নেশায় মাতিয়ে তোলে সে মনটির হিতকর কাজ ঐ প্রথম ছড়াটির মত অতিব্যক্ত, অতিস্পষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে যে, যে-মানস থেকে উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি জন্ম নিয়েছে, তারও অন্তরালে সমাজ আছে, আছে সামাজিক পরিবেশ। আসলে কবির কথাগুলোর জন্যে একটা নির্ভর চাই। যেমন ভাস্করের নির্ভর মাটি অথবা পাথর, তেমনি কবির নির্ভর সময়, পরিবেশ, অবস্থা, দেশ কিংবা সমাজ।

ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক। বোদলেয়ারের 'লিথি' নামক কবিতার শেষ লাইন ক'টি এমনি :

এ কঠিন তিক্ততারে ডুবাতে করব শোষণ
ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটায়

ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়।
কোনদিন অন্তরে যার হৃদয়ের হয়নি পোষণ।

এর মধ্যে কি মানুষের জৈবিক চেহারাটা স্পষ্ট? এ কবিতার অন্য কয়েকটি লাইন এমনি :

নিয়তির চাকায় বাঁধা নিরুপায় বাধ্য আমি,
নিয়তির শাপেই গাঁথি ইদানীং ফুলমালা!
বাসনা বাড়ায় যত যাতনায় তীব্র জ্বালা
সবিনয় হায়রে শহীদ নির্মল নিরয়গামী।

বুঝলাম, এ কবিতার মধ্যে সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। এটা নিছক ব্যক্তি-সম্পর্কিত। এর মধ্যে আছে কোন এক ব্যক্তির রুচি, কোন এক ব্যক্তির দুঃখ এবং কোন এক মর্ষকামীর আনন্দ। কিন্তু এর ভিতরে ঐ নিয়তি শব্দ এল কেন? ঐ নিয়তি কথাটা তাকে শেখালো কে? ব্যক্তিভাগ্যের জন্যে বোদলেয়ার নিজেকে দায়ী মনে করতেন। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই?

আমরা কি মানবো যে, আমাদের আশে-পাশে আমাদের চতুর্দিকে যে-সব লাঞ্ছিতেরা, যে-সব নিপীড়িতেরা শীতরাত্রিতে নিরাবরণ থেকে কোঁকাচ্ছে তাদের জন্যে একমাত্র দায়ী তাদের নসীব, তাদের অদৃষ্ট?

ব্যাপার হল শিল্পের মধ্যে গোপনীয়তার একটা সৌন্দর্য্য আছে এবং আর একটু ব্যাখ্যা করে বললে বোধ হয় বোঝায় যে শিল্প হচ্ছে নির্বাসিত মানুষের আশ্রয়।

মানুষও জীব এবং মনে রাখতে হবে, মানুষ হিংসাহীন জীব নয়। আর মানুষ সেই জীব—যে ভিতরে ভিতরে কোনদিন পরাজয়কে মেনে নিতে পারে না। বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা যে মানুষকে হেরে যেতে দেখলাম, সে মানুষের মন কিন্তু হারেনি। ভিতরে ভিতরে সে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে; এবং শিল্প সেই সংগ্রামের ফসল।

শামসুর রাহমানের 'মূল্যের উপমা' কবিতাটির শিরোনামার নীচে এই কথাটি লেখা আছে : 'তাকে আমাকে যে কবি বলে উপহাস করতো।' এই উপহাসের জন্যে কবির মন অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহ করেছে এবং স্থূলতার সঙ্গে বাহ্যিক সংগ্রামে লাভ হবে না বলেই তাঁর অন্তর-সত্তা-

বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে এবং তখন তার সংগ্রাম আর এককে উপলক্ষ করে নয়, বহুকে উপলক্ষ করে বহুর চেতনাকে, স্থূল চেতনাকে উপলক্ষ করে। এবং কবির জয় সেখানেই যে, বাস্তবের বিদ্রূপ এড়িয়ে নিজের মনোরাজ্যে তিনি বীর সাজতে পারেন, সম্রাট সাজতে পারেন। সেখানে তিনি এমন স্বকৃত পৃথিবী আবিষ্কার করেন যাকে কেউ 'ত্রিলোকে দ্যাখেনি'।

ঐ সূত্র ধরে বলি, 'ত্রিলোকে দ্যাখেনি' এমন কোন নির্মিত বস্তু সাধারণ মানুষের মনে জন্মায় কিনা। এটা তো বিশ্বাসযোগ্য যে, শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষই স্বপ্ন দেখে। এবং কোন মানুষকে আমরা স্বপ্ন ছাড়া পৃথক করে ভাবতে পারি না। এই যে স্বপ্নচারী অথবা স্বপ্ন-বন্দী মানুষ, এ মানুষ কি কোন সৌন্দর্য্যকে স্পর্শ করে এই পৃথিবীর উত্তাপ ভুলতে চায়?

ফুটপাতে শুয়ে সিংহমুখো কুষ্ঠরোগী আকাশে চোখ রাখে,
স্বপ্ন দ্যাখে, দ্যাখে রঙিন পাখির কতো নরম
শরীর ভেসে যায়,
বাতাসে ছড়ায় রঙ।

[দুপুরে মাউথ অর্গান : শামসুর রাহমান]

উপরোক্ত লাইন কটিতে অংকিত চিত্রের কুষ্ঠরোগী তার অসুখের কথা ভুলে যায় মুহূর্তে : তার স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গিয়ে ভুলে যায় তার দূরবস্থার কথা। কোন চিকিৎসক এসে তার এ অসুখ সারায় না, তার অসুখ সারে স্বপ্নে। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে এই স্বপ্নের জগতে টেনে এনে পরোক্ষভাবে কবি কি সমাজের কোন উপকার করেন?

মোট কথা সাহিত্য যদি মানুষকে মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত করে, তা'হলেই তার উদ্দেশ্য সফল হল। সে উদ্বোধন মানুষের সৌন্দর্যানুভূতির মধ্য দিয়ে জন্ম নিলে ক্ষতি কি?

ইত্তেফাক
১৯৬৪

নির্ঘণ্ট

শেষ